

প্রকাশক ঃ পার্থ বন্দোপাধ্যায়, প্রযত্নে ঃ প্রীতি মুখার্জী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ ; মুদ্রক ঃ মনোরঞ্জন পান, নিউ জয়কালী প্রেস, ৮/এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০০০৬। প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ১৯৬০

ঠাকুরের কুয়ো

জলের লোটাটা ঠোঁটে ঠেকানোমাত্রই একটা বিশ্রী গন্ধ টের পেল জোখু। গংগীকে ডাকল—'কি জল এনেছিস ? কি গন্ধ ! খাওয়াই যাচ্ছে না। কখন থেকে গলা শুকিয়ে কাঠ আর তুই এই নোংরা জল আমাকে খাওয়াচ্ছিস !'

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় জল ভরে নিয়ে আসে গংগী। কুয়োটা দূরে বলে বার-বার ওখানে যাওয়াও মুশকিল। গতকালের জলে তো কোনরকম গন্ধ ছিল না। তবে আজ এই বাজে গন্ধটা এল কিভাবে। লোটাটা নাকের কাছে এনে ও শুঁকলো। হ্যাঁ, সত্যিই বিশ্রী গন্ধ। নিশ্চয়ই কোন জীবজন্তু কুয়োতে পড়ে মরে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ভাল জলটাই বা আসবে কোত্থেকে।

ঠাকুরের কুয়োয় ওকে কে উঠতে দেবে ? দূর থেকেই তো ওরা তাড়া করবে। সাহুর কুয়োটাও গাঁয়ের উল্টোদিকের শেষ মাথায়। আর ওখানেই বা ওকে জল ভরতে দেবে কে ? এই গাঁয়ে তো কোন কুয়ো নেই।

জোখু কিছুদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। তেষ্টা ভুলে কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার চেষ্টা করল। শেষে না পেরে বৌকে ডাকল, 'আর পারছি না। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নে, যা জল আছে তাই আন। নাক চেপে ওরই একটুখানি গিলি।'

গংগী জল দিল না। খারাপ জল খেলে জোখুর শরীর যে আরও খারাপ হবে এই অব্দি ও জানে। কিন্তু ফুটিয়ে নিলে খারাপটা দূর হবে সেটা ওর জানার বাইরে। ও বলল—'ঐ খারাপ জল খাবে কিগো। কে জানে কি মরেছে ওখানে ? কুয়ো থেকে এখুনি ভাল জল নিয়ে আসছি।'

জোখু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল—'কোত্থেকে তুই পরিষ্কার জল আনবি !'

'কেন। দুটো কুয়ো আছে, একটা ঠাকুরের অন্যটা সাহুর। ওরা কি এক লোটা জল আনতে দেবে না।'

'হাত পায়ে পট্টি জড়িয়ে ঘরে ফিরবি, আর কি হবে ? যা চুপচাপ বসে থাক। ব্রাহ্মণ দেবতা তোকে অভিশাপ দেবে ; ঠাকুর লাঠি দিয়ে পেটাবে আর সাহু সুদ বাড়াবে পাঁচগুণ। গরীবের দুঃখ কে বোঝে ! আমরা মরছি জেনেও একবারের জন্যও কেউ দরজায় উঁকি দিয়ে খোঁজখবর নেয় না, আর মরলে কাঁধ দেওয়া তো দূরের ব্যাপার। এইসব লোক তোকে কুয়ো থেকে জল আনতে দেবে ?'

জোখুর এসব কথা সত্য। এসবের কি জবাব দেবে গংগী। ওর মুখে কোন কথা যোগাল না। তবু জোখুকে ওই নোংরা জল খেতে দিল না গংগী।

॥ দুই ॥

রাত নটা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত শ্রমিকেরা শুয়ে পড়েছে। পাঁচ দশজন অলস বেকার ঠাকুরের দরজায় ইতস্তত বসে। গায়ের জোর দেখানোর দিন আর নেই, না আছে সুযোগ। আদালতে কে কত বাহাদুরী দেখিয়েছে তারই গল্প করছে ওরা। একটা খাস মামলায় ঠাকুর কি সতর্কতায় দারোগাকে ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেয়েছে; একটা কেসের দরকারী দলিলের নকল কপি হাতিয়েছে কি বুদ্ধির সঙ্গে; বেলিফ আর কোর্টবাবুরা বলেছিল আর সব হতে পারে কিন্তু নকলটা মিলবে না। কেউ পঞ্চাশ চেয়েছিল, কেউ একশ। ঠাকুর বিনে পয়সায় কাজটা সেরেছে। কাজ সারবারও মোক্ষম কায়দাটা জানতে হয়।

ঠিক সেই সময় গংগী কুয়ো থেকে জল তুলতে এল।

কুপীর আলো আবছাভাবে কুয়োর গায়ে পড়ছে। সেজন্য সুবিধেমত একটা সুযোগের অপেক্ষায় গংগী কুয়োর আড়ালে একটা পৈঠার ওপর গিয়ে বসল। সারা গাঁয়ের লোক এই কুয়ো থেকে জল নেয়। কারোর বেলায় কোন বাধা নেই, শুরু এই হতভাগীর বেলাতেই যত আপত্তি।

ওর বিদ্রোহী মন এইসব সামাজিক বিধিনিষেধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইলো —ওরা উঁচু জাতের আর আমরা নীচু কেন। গলায় শুধু একটা পৈতে পরে বলে? শয়তানি আর চালাকিতে তো একজন আর-একজনের ওপর দিয়ে যায়। ওরা চুরি করে, ঠকায়, অন্যের নামে মিথ্যে মামলা ঠোকে। এই তো সেদিন আমাদের এই ঠাকুরই গরীব মেষপালের একটা ভেড়া চুরি করলো। পরে কেটেকুটে ওটার মাংস খেয়েছে। ঐ পণ্ডিত সারাবছর ধরে ওর বাড়ীটাতে জুয়ার এক আড্ডা বসায়। আর আমাদের সাহুজী ভেজাল দেওয়া ঘি বিক্রী করে। ওরা আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, তারপর আমরা মজুরী চাইলেই ওদের বিরক্তি শুরু হয়। তাহলে কোনদিক দিয়ে ওরা আমাদের চেয়ে উঁচু? কারণ বোধহয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে আমরা চেঁচাই না আমরা উঁচু জাতের, উঁচু জাতের বলে। কোন কারণে যদি গাঁয়ে ঢুকে পড়ি, ড্যাবডেবিয়ে আমার সর্বাঙ্গ মাপতে থাকে। প্রত্যেকের বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে সাপ। তাও নাকি ওরা উঁচু!

কুয়োর দিকে এগিয়ে আসা কারোর পায়ের শব্দ শোনা গেল। গংগীর বুকের ধুকপুকুনি আরও বাড়ল তাতে। কেউ দেখলেই হোল, একটা লাথিও ফসকাবে না। ঘড়া আর দড়িটা তুলে নিয়ে একটা গাছের পেছনে অন্ধকার ছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে নিল গংগী। এই লোকগুলো কবে কাকে দয়া দেখিয়েছে! মহঁগুকে ওরা এমন পিটিয়েছিল যে সেই গরীব বেচারা রক্তবমি করেছে একমাস—ওর একমাত্র অপরাধ ও বেগার খাটতে চায়নি। আর এভাবেই তো ওরা উঁচু হয়।

দুজন মেয়েলোক কুয়ো থেকে জল নিতে এসেছে। ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

'খেতে বসব ঠিক তক্ষুনি হুকুম, যাও পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল তুলে আনো। অথচ একটা ঘড়া কেনার পয়সাও ঘরে নেই।'

'আমরা একদণ্ড কোথাও বসলেই মরদগুলোর গায়ে জ্বালা ধরে।'

'হ্যাঁ, সে আর বলতে। নিজের হাতে গড়িয়ে এক গ্লাস জলও খাবে না। হুকুম চালালেই হোলো—পরিষ্কার জল আনো, অমুক করো, তমুক করো। যেন আমি ওর দাসী।'

'দাসী নয়তো আর কি! তোমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে না? আর এদিক ওদিক করে পাঁচ দশ টাকা দিব্যি তো সরাচ্ছো বাবা। দাসী আর কিভাবে হয়।'

'আর জ্বালিওনা, দিদি। সারাদিনে এক মুহূর্তের জন্যও একটু পা ছড়িয়ে বসার জো নেই। এত কাজ যদি অন্য কারো বাড়ীতে করতাম, অনেক আরামে থাকতাম। কাজের প্রশংসাও করতো। আর এখানে কাজ করতে করতে হাড়মাস কালি হয়ে গেল তবু কেউ ভালভাবে কথাটা পর্যন্ত বলে না।'

ঘড়া ভরে দুজনেই চলে গেল। গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে এল গংগী। বেকার মাতব্বরদের দলটা চলে গেছে। ঠাকুরও সদর দরজা বন্ধ করে অন্দরমহলে যাচ্ছে শোওয়ার জন্যে। গংগী স্বস্তির শ্বাস ফেলল। সামনে আর কোনো বাধা নেই। রাজকুমাররাও জীবনের পরশমণি চুরি করতে গিয়ে বোধ হয় এত সতর্ক থাকতো না, খুব সাবধানে গংগী কুয়োর দিকে এগোলো। ওর সারা শরীরে বয়ে গেল আনন্দের শিরশিরানি। এ ধরনের জয়ের আনন্দ ওর জীবনে এই প্রথম।

ঘড়ার গলার চারপাশে দড়ির ফাঁসটা আটকাল। একজন সৈন্য অন্ধকারে শত্রু-দুর্গে সুড়ঙ্গ খুঁড়বার সময় চারধারটা যেমন তীক্ষ্ণভাবে দেখে নেয়, তেমনি ঈগলচোখে গংগীও তাকাল ডাইনে বাঁয়ে। আর এসময় হাতেনাতে ধরা পড়লে দয়া বা ক্ষমা—না, সেসব কোন দুরাশা গংগীর নেই। ভগবানকে ডেকে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করলো গংগী। তারপর ঘড়াটাকে কুয়োতে নামিয়ে দিল আস্তে আস্তে।

প্রায় কোন শব্দ না করেই ঘড়াটা জলে ফেললো। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ওটাকে কুয়োর মুখ অব্দি টেনে তুলল গংগী। কোন পেশাদার পালোয়ানের পক্ষেও বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি তোলা সম্ভব ছিল না।

ঝুঁকে পড়ে ঘড়াটা কাছে টানতে যাবে ঠিক সেই সময়েই ঠাকুরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। আব ঐ খোলা দরজা সিংহের হাঁ-মুখের চেয়ে ভয়ংকর। গংগীর হাত থেকে দড়িটা খসে পড়ল। ঘড়া জলে পড়বার ভীষণ শব্দের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

'কে, কে ওখানে?' চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঠাকুর দৌড়ে আসতে লাগল কুয়োর দিকে। এক লাফে কুয়োর পাড় থেকে নেমে গংগীও শুরু করলো দৌড়।

ঘরে পৌঁছে গংগী দেখে জোখু লোটা থেকে সেই নোংরা জলটাই খাচ্ছে।

ভাষান্তর: **প্রদীপ গোস্বামী**

বিধ্বংস

বেনারস জেলার বিড়া গ্রামে এক নিঃসন্তান বিধবা বুড়ি বাস করতো। তার নাম ছিল ভুংগী। জাতে গোঁড়। না ছিল তার এক ছটাক জমি, না একটা কুঁড়ে। রোজগারের রাস্তা বলতে বুড়ির সম্বল ছিল চাল-গম-ভুট্টা ভাজার একটা বড় উনুন। সাধারণত গাঁয়ের লোকেরা একবেলা সেই পোড়ানো বা ভাজা খাবার খায়। কাজেই ভুংগীর উনুনের পাশে লোকজনদের ভিড় লেগেই থাকতো। উনুনটা যেটুকু ছাউনি দিয়ে ঘেরা, তারই একপাশে ঘুমোতো সে। ভোর হবার সাথে সাথেই উঠে পড়ত ভুংগী ; তারপর উনুন জ্বালাবার জন্য পাতা কুড়োতে বেরোতো। উনুনের ঠিক পাশে পাতাগুলো সে গুছিয়ে রাখতো, আর বারোটার পর আঁচ দিত। নিয়মমাফিক একাদশী-পূর্ণিমায়, কিংবা যেদিন গাঁয়ের পণ্ডিত উদয়ভানুর ফসল ভেজে দিতে হবে, সে দিনটা উপোস দিত ভুংগী। পণ্ডিত উদয়ভানুর চিড়েমুড়ি ভেজে দেওয়াই শুধু নয়, ওর বাড়িতে তাকে নিয়মিত জলও তুলে দিতে হত।

পণ্ডিতের গাঁয়ে থাকে, সুতরাং ইচ্ছে করলে লোকটা তাকে দিয়ে যা খুশী তাই করিয়ে নিতে পারে। এটাকে ঠিক অন্যায় বলা চলে না। যদি খাটুনির বদলে ওকে খাবারই দেওয়া হবে, তা'লে তো আর কাজটা মাগনায় হল না। ইচ্ছে হলে, সারাদিন মাঠে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে আসার পরও চাষা বলদগুলোকে খুঁটিতে বেঁধে রাখতে পারে, কার কি বলার আছে। আর সে যদি তা না করে, তাহলে যে খুব দয়া দেখালো তা নয়, আসলে তা অন্য কোন লাভের ধান্দায়। এসব নিয়ে পণ্ডিতজীর মাথাব্যথা ছিল না। আর যাই হোক, ক'দিন না খেয়ে থাকলে ভুংগী মারা যাবে না। আর ও যদি নেহাত মারাই যায়, তাহলে আর একটা গোঁড় নিয়ে আসা যাবে। তাতে আর ভাবনা কি। মোট কথা, গাঁয়ে থাকতে দিয়ে ওর প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহারই করছেন তিনি।

চৈতসংক্রান্তির দিন ; আজ নতুন ফসল ভাজা হবে, খাওয়া হবে, দেয়াথোয়া হবে। ঘরে ঘরে আঁচ পড়বে না। ভুংগীর উনুনে আজ কাজের কামাই নেই, তার চারপাশে ছোটোখাটো একটা বলবার মত ভিড় জমেছে। বেচারির দম ফেলার উপায় নেই এতটুকু। অধৈর্য হয়ে খদ্দেররা ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় পণ্ডিত উদয়ভানুর হুকুমনামা নিয়ে দু'জন চাকর এলো, তারা দুটো ইয়া ইয়া ঝাঁকা বয়ে এনেছে। এখুনি ভেজে দিতে হবে। ঝাঁকা দুটো দেখে ভুংগী চমকে

উঠল। বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, সন্ধের আগে এত দানা সে কিছুতেই ভেজে উঠতে পারবে না। আর ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা দুই সময় হাতে পেলে এক হপ্তার মতো খাবার সে ঘরে তুলতে পারতো। কিন্তু ভগবান বিরূপ। তার বদলে দুটো যমদূতকে পাঠিয়েছে। এখন বিনি পয়সায় তাকে সন্ধেতক উনুনের সামনে বসে ভেজে যেতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ঝাঁকা দুটোর দিকে হাত বাড়ায়।

যাবার সময় ঠোঁটকাটাদের একটা বলল, 'সময় নষ্ট করিসনি, তাহলে ভুগতে হবে।'

ও বলল, 'তবে বোস্ থাকো। ভাজা হলে সব নিয়ে যাবে। আর আমি যদি অন্য কারো জিনিস ছুঁই, আমার হাতটা কেটে নিও।'

'ওফ, এখানে বোস্ থাকার মত হাতে যেন ঢের সময় আছে। সন্ধের মধ্যে ভেজে রাখিস।'

॥ দুই ॥

হুকুমখানা ঝেড়েই চাকরেরা চলে গেল। আর ভুংগী বসে বসে ভাজতে লাগল। এক মন দানা ভাজা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। উনুনের আঁচ ঠিক রাখতে মাঝে মাঝে ভাজার কাজটা তাকে বন্ধ রাখতে হচ্ছিল। সূর্য ডোবার সময়তক আদ্দেকও হয়ে উঠল না। ওর ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি পণ্ডিতজীর লোকদুটো এসে পড়ে। আর এসেই তো তারা ওকে পিটবে, অপমান করবে। পাগলের মত হাত চালাতে লাগলো ভুংগী। রাস্তার দিকে চোখ রেখে পুরো ঠাণ্ডা হবার আগেই কড়াই থেকে সে বালিটা একপাশে ঝেড়ে ফেলছিল। এদিকে যা ভাজা হ'ল, তা প্রায় আধভাজা। কি যে করবে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না—ঠিকমত ভাজাও হচ্ছে না, আবার থামতেও পারছে না, আজ যে কি হবে! পণ্ডিতজীর কাছে কাজের জন্য আজ যে কি রকম খানা জুটবে! উনি তো আর তোমার চোখের জলে ভুলছেন না।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে নিজের খাবারটা ও কোনমতে জুটিয়ে নিতে পারতো কিন্তু পণ্ডিতজীর সাথে দেখা হলেই তিনি ওকে শাসাতেন। শাসাতেন, কারণ পণ্ডিতজীর ক'আঙুল জমি ও দখল করে রেখেছে। এতটুকু জমির জন্য এত চড়া দাম! গাঁয়ের কত জমিতো পতিত হয়ে পড়ে আছে, কত ঘর পরিত্যক্ত। ওসব জমিতে এমন কি হলুদ বুনো ফুলও গজায় না। আর লোকটা চব্বিশ ঘণ্টাই তার পেছনে লেগে আছে। কিছু একটা হলেই লোকটা ওর উনুন ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। ঘরে যদি একটা পুরুষ মানুষ থাকতো তাহলে তাকে এমনটা ভোগ করতে হ'ত না।

বিমর্ষ হয়ে সে যখন এসব ভাবছে, এমন সময় চাকর দুটো ফিরে এলো। এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'সবটা ভেজেছিস তো।'

ঝাঁঝের সঙ্গে ভুংগী বলে, 'দেখতে পাচ্ছো না। এখনো তো ভেজেই চলেছি।'

'সারা দিনে এর বেশী ভেজে উঠতে পারিস নি। তুই ভাজছিলি, না ফসলের বারোটা বাজাচ্ছিলি? এ তো একেবারে আধপোড়া, মুখে দেওয়া যাবে না। ব্যস্, আমাদের হয়ে গেল। দেখিস এর জন্য পণ্ডিতজী তোকে আজ কি করে।'

পরিণতিতে সে রাতেই তার উনুন গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। আর সম্বলহীনা ভুংগীর বেঁচে থাকার কোন উপায়ই রইল না।

॥ তিন ॥

নিজের পেট চালাবার আর কোনই উপায় রইল না ভুংগীর। উনুনটা গুঁড়িয়ে দেওয়ায় গাঁয়ের লোকদেরও বিস্তর ভুগতে হচ্ছিল। অনেক ঘরেই দুপুর-বেলাতেও চিড়েমুড়ি জুটছিলো না। গাঁয়ের লোকেরা পণ্ডিতজীকে গিয়ে বুড়িকে যাতে আবার উনুন বানাবার সুযোগ করে দেওয়া হয়, তার জন্য বলল। কিন্তু পণ্ডিতজী কোন কথায় কান দিলেন না। তিনি তো আর মানসম্ভ্রম খোয়াতে পারেন না। হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলল বুড়ীকে। কিন্তু বুড়ীর মনটা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছে না। শত দুঃখকষ্টের মধ্যে এ গাঁয়ে তার পঞ্চাশটা বছর কেটে গেছে। এ গাঁয়ের প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতাকে ও ভালবাসে। এখানেই ও জীবনের সুখ দুঃখ অনুভব করেছে। এই শেষ জীবনে কিছুতেই গাঁ ছেড়ে ও যেতে পারবে না। চলে যাবার কথা ভাবলেই বুকটা তার ছাঁৎ করে ওঠে। এখানে তার যত দুঃখ-কষ্টেই দিন কাটুক, অন্য কোথাও গিয়ে সুখে থাকার কথাটা ও ভাবতেই পাচ্ছিল না।

একমাস পার হয়ে গেছে। একদিন খুব সকাল সকাল পণ্ডিতজী তাঁর চাকর-বাকরদের নিয়ে খাজনা আদায়ে বেরিয়েছেন—আর এ ব্যাপারে তিনি নায়েব-গোমস্তাদের বিশ্বাস করেন না। অন্য কেউ এসে তার বাকী বকেয়া, কিংবা পুজো আচ্চার দক্ষিণা-জরিমানায় ভাগ বসাক, তা তিনি চান না। বুড়ি আবার উনুন পেতেছে দেখে রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগলো। একতাল মাটি নিয়ে ভুংগী তখন উনুন লেপছে। বোধ হয় রাত থাকতেই সে কাজ শুরু করেছে; আর বেলা বাড়ার আগেই কাজটা শেষ করতে চাচ্ছিল। স্বপ্নেও ও ভাবতে পারেনি, কাজটা পণ্ডিতজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে। মানুষ যে মনে এ্যাদ্দিন রাগ পুষে রাখতে পারে, এমন কোন ধারণাই ওর ছিল না। এ অবস্থায় পণ্ডিতজীর মত মানুষের যে বুড়ির ওপর এমন বিদ্বেষ থাকতে পারে, এটা সে আগে বোঝে নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ও ভেবেছিল, আর যাই হোক, মানুষ এত নীচে নামতে পারে না। হায়রে, বুড়ীর শুধু বয়েসই বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়ে নি!

হঠাৎ পণ্ডিতজী চিৎকার করে উঠলেন, 'বলি, কার হুকুমে?'

হতচকিত ভুংগী দেখলো পণ্ডিতজী ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে।

তিনি আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কার হুকুমে উনুন পাতছিস শুনি?'

ভয়ে ভয়ে ও বলল, 'গাঁয়ের সবাই বললো, তাই পাতছি।'

'এটা আমি আবার ভাঙবো'—এই বলে উনুনটায় লাথি মারলেন তিনি। নরম মাটির তাল দলা পাকিয়ে গেল। আর একটা লাথি চালালেন তিনি; ততক্ষণে ভুংগী এসে আগলে দাঁড়িয়েছে, আর লাথিটা পড়ল একেবারে ওর বুকে। পাঁজরটা ঘসতে ঘসতে ও বললো, 'মহারাজ, কাউকে আপনি পরোয়া করেন না; কিন্তু ভগবানের ভয় তো আছে। এভাবে আমার সব্বোনাশ করে কি ভাল করলেন? এ জায়গাটায় কি সোনাদানা গজাবে? আপনার ভালোর জন্যই বলছি; গরীবকে এভাবে পিষবেন না। আমায় মেরে ফেলবেন না।'

'এখানে তুই উনুন পাততে পারবি না।'

'উনুন না পাতলে আমি খাবো কি?'

'তোর পেটের দায় তো আর আমার না।'

'শুধু আপনার কাজটুকু করলে কি পেট চলবে আমার?'

'এ গাঁয়ে থাকতে হলে আমার কাজ তোকে করতেই হবে।'

'উনুন পাতা হয়ে গেলে আপনার কাজ নিশ্চয় করে দেবো। গাঁয়ে থাকতে হলে যে শুধু আপনার কাজই কত্তে হবে তেমন কোন কথা নেই।'

'তাহলে কিরস না, এখুনি গাঁ ছেড়ে চলে যা।'

'কেন যাবো? বারো বছর এক জমিতে চাষ করলে ভাগচাষীরও জমিতে হক জন্মায়। আর আমি এই কুঁড়েঘরে বুড়ি হয়ে গেলাম। আমার শ্বশুর আর তার চারপুরুষ এ কুঁড়েতেই থেকেছে। যম ছাড়া, আর কেউ আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'খাসা, তুই আবার আইন কপচাচ্ছিস। খেটেখুটে থাকলে তোকে না হয় গাঁয়ে থাকতে দিতুম। কিন্তু এর পর তোকে না তাড়ানো পর্যন্ত আমার আর কোন বিশ্রাম নেই।' চাকর-বাকরদের বললেন, 'যা, পাতাটাতা নিয়ে এসে এ জায়গাটায় আগুন জেবলে দে। কি করে উনুন পাততে হয়, সেটা ওকে একটু বুঝিয়ে দেয়া দরকার।'

মুহূর্তে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যায়। দাউ দাউ করে জবলে ওঠে আগুন, তার লকলকে শিখা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোকজন সেই দাউদাউ আগুনের চারপাশে ছুটে এল। অসহায়ভাবে উনুনটার কাছে দাঁড়িয়ে ভুংগী সেই আগুনের শিখা দেখতে লাগলো। হঠাৎ, এক দৌড়ে, আগুনের শিখার ভেতর ছুটে গেল ভুংগী। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার ভাঙ্গাচোরা শরীর গ্রাস করল আগুন।

এমন সময় দমকা বাতাস উঠল। স্বাধীন সেই অগ্নিশিখা ধেয়ে চলল পুবের দিকে। উনুনের আশপাশে চাষাদের যেসব ঘরবাড়ি ছিল, পুড়ল। চাষাদের ঘরবাড়ি নিঃশেষ করে সেই আগুনের শিখা আরো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারপর সেটা গিয়ে আছড়ে পড়ল পণ্ডিতজীর খামারবাড়িতে। ততক্ষণে সারা

গাঁয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন নেভাবার জন্য চারদিকে শোরগোল পড়ে যায় ; কিন্তু ছিটে-ফোঁটা জল যেন আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল। আগুনের শিখা দাউদাউ করে আরো উঁচুতে উঠতে লাগলো। পণ্ডিতজীর চমৎকার দালানটা গিলে ফেললো। তিনি দেখলেন, আগুনের সমুদ্রে অশান্ত ঢেউয়ের ভেতর জাহাজের মত তলিয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রাসাদ। আর সেই ভস্মরাশির ভেতর থেকে যে হাহাকার উঠল, তা যেন ভুংগীর বুকফাটা কান্নার চেয়েও ঢের করুণ।

সমস্যা

আমার দপ্তরে চারজন চাপরাশী। তাদের মধ্যে একজনের নাম গরীব। সাদাসিধে লোক, যে যা বলে তাই করে দেয়। নিজের কাজে ফাঁকি দেয় না। কথা বলে কম, ধমক-ধামক খেলেও চুপ করে থাকে। যেমন নাম, তেমন মানুষ। এ দপ্তরে বছর খানেক হয়ে গেল, কিন্তু লোকটাকে আমি একদিনও কামাই করতে দেখি নি। ঠিক নটায় ওকে নিজের জায়গায় বসে থাকতে দেখে দেখে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছলাম লোকটাকে এ বাড়ির অংশ বলেই মনে হ'ত। এত সরল, কারো কথা ফেলতে পারে না। একজন চাপরাশী মুসলমান; কী জানি কেন লোকটাকে অফিসের সবাই ভয় করে। আমার তো মনে হয় এর কারণ লোকটার লম্বাচওড়া কথাবার্তা। ওর কথামতো, ওর এক খুড়তুতো ভাই রায়পুরের কাজী আর পিসে টংকের কোতোয়াল। সর্বসম্মতিক্রমে ওকেও 'কাজীসাহেব' উপাধি দেয়া হয়েছে। আর আছেন ঠাকুরমশাই—জাতিতে ব্রাহ্মণ। কাজের চেয়েও ওনার আশীর্বাদের মূল্য ঢের বেশী। তিনজনেই ফাঁকিবাজ। ছোট বড় ভেদাভেদ নেই, সবাই একেবারে কুঁড়ের বাদশা। মুখখানা এমন ব্যাজার করে রাখবে—সহজে ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় কার সাধ্যি! যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। বড়বাবুকে যা একটু ভয়টয় করে; তাও যতক্ষণ উনি থাকেন সে সময়টুকুও ছলছুতো করে কাটিয়ে দেয়। ওদের এতসব বদগুণ থাকা সত্ত্বেও বেচারা গরীবের মত হাল অফিসে আর কারও ছিল না। মাইনে বাড়াবার সময় ওরা তিনজনে একসঙ্গে লড়ে যায়, কিন্তু গরীবকে তেমন কেউ পোঁছে না। আর সবাই যখন দশ টাকা করে পায়; ওর সেই ছ'টাকাই রয়ে গেছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ওর পা দুটো এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম পায় না আর তিন চাপরাশী একটার পর একটা হুকুম চালিয়ে যায়। এদিকে ওপরের আমদানীতেও বেচারার কোন হিস্যাই ছিল না। তবুও, অফিসের দপ্তরী থেকে বড়বাবু ওর পেছনে লেগেই থাকতো। কতবার গালমন্দ খেতে হয়েছে, কতবার জরিমানা দিয়েছে আর চোখ রাঙানো তো লেগেই আছে। এ রহস্যের আমি কোন মাথামুণ্ডু বুঝতাম না। ওর জন্য মায়া হ'ত। আমার ব্যবহারে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম, অন্য চাপরাশীদের থেকে ওর কদর আমার কাছে কিছু কম না। ওর পক্ষ নিয়ে কতবার আমি চাপরাশীদের সঙ্গে লড়েও গেছি।

॥ দুই ॥

বড়বাবু একদিন ওকে নিজের টেবিলটা সাফ করতে বললো। বলার সাথে সাথে ও কাজে লেগে যায়। হঠাৎ ঝাড়নটা লেগে দোয়াতটা উল্টে গিয়ে বাতিটা মেঝের ওপর পড়ল। মুহূর্তে বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। ওর কান দুটো ধরে বেদম পেটালেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার বাছাই করা খিস্তি খেউড় ঝাড়তে লাগলেন। গরীব বেচারার চোখে জল এসে যায়। ও চুপচাপ সব শুনতে থাকে, যেন খুনের আসামী। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে বড়বাবুর ভয়ংকর রাগারাগিটা আমার মনে হ'ল খুব অন্যায়। অন্য কোন চাপরাশী এর চেয়ে বড় ধরনের অপরাধ করলেও তার ওপর এমন মারধোর হ'ত না। আমি ইংরিজীতে বললাম—'বাবুসাহেব, এ আপনি অন্যায় করছেন। ও তো আর ইচ্ছে করে বাতিটা ফেলে নি। ওর ওপর এতটা কড়া সাজা খুবই অনুচিত।'

বাবুজী ভদ্রভাবে বললেন, 'আপনি ওকে চেনেন না, ভারি বদমাশ।'

'আমি তো ওর কোন বদমাইশি দেখি নি।'

'ওকে জানেন না, অত্যন্ত পাজী। ঘরে জমিজমা আছে, হাজার টাকা লেনদেন করে, কয়েকটা মোষও আছে। তা নিয়েই না ওর এত গুমোর।'

'ঘরের এমনি হাল তো, আপনার এখানে চাপরাশীর কাজ করছে কেন?'

'বিশ্বাস করুন, বয়েস তো কম হ'ল না অথচ লোকটা যা হাড় কঞ্জুস।'

'হতে পারে, কিন্তু সে তো কোনো অপরাধ না।'

'মশাই, আপনি এখনো টের পাননি। আর কিছুদিন এখানে থাকুন, বুঝবেন লোকটা কতবড় শয়তান।'

আর একজন মহাশয় বলে উঠলেন—'ভাইসাব, ওর ঘরে এক মন দুধ-দই হয়। কমসেকম মন খানেক ক'রে মটর, ভুট্টা আর ছোলা হয়। একদিন হাতে করে অফিসের লোকদের একটু দিতে পর্যন্ত পারলো না। এখানে এসব জিনিস সহজে মেলে না। রাগ হবে না কেন, বলুন? আর সব তো এই চাকরির দৌলতেই। আগে তো ওর ঘরে কিস্যু ছিল না।'

বড়বাবু সসংকোচে বললেন—'ওসব কোনো কথা নয়। ওর জিনিস, ইচ্ছে হলে কাউকে দেবে, নইলে দেবে না। কিন্তু লোকটা একেবারে জানোয়ার।' কিছু কিছু বুঝলাম আমি। বললাম—'হ্যাঁ, এত যদি ছোটই মন হয় লোকটার, জানোয়ার তো বটেই। এসব অবশ্য আমি জানতাম না।'

সংকোচ কাটিয়ে এবার বড়বাবুও মুখখুললেন। বললেন—'ওর দেয়া উপহারে তো আর কেউ বর্তে যাবে না, কিন্তু যে দেয় তারই বড় মনের পরিচয় মেলে। আর যে যোগ্য, তার কাছেই না আশা করে লোকে? যার সামর্থ্য নেই, তার কাছে তো কোন প্রত্যাশাই থাকে না। কথায় বলে, ন্যাংটার আর নিবিটা কি!'

রহস্য খুলে গেল। বড়বাবু সরল ভাবে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

কারো সমৃদ্ধি দেখলেই ছোট-বড় সবাই তার শত্রু। গরীব বন্ধুর বাড়িতে এক খিলি পান পেলেই সন্তুষ্ট কিন্তু বড়লোক বন্ধু যদি না খাওয়ায়, কে না মনে মনে তাকে গাল দেয়—সারাজীবন নিন্দে করে। কৃষ্ণের ঘর থেকে সুদামা যদি নিরাশ হয়ে ফিরতো, তালে হয়তো সে জরাসন্ধ কিংবা শিশুপালের চেয়েও বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াতো। মানুষের স্বভাবই এমনি।

॥ তিন ॥

কদিন বাদে আমি গরীবকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি হে, তোমার নাকি খেতে অনেক ফসল-টসল হয় ?'

গরীব নম্রভাবে বললো—'তা হয়, হুজুর। আপনাদের দুই গোলাম আছে, ওরাই করে।'

'গরু-মোষও আছে নাকি ?'

'আজ্ঞে, আছে হুজুর। মোষ আছে। বকনা বাছুরটা এখনো গাভীন হয় নি। হুজুরের আশীর্বাদে পেট চলে যায়।'

'অফিসের বাবুদের এক-আধদিন না হয় একটু খাতিরই করলে ?'

গরীব খুব বিনীত ভাবে বললো—'হুজুর, অফিসের বাবুদের আমি আর কি খাতির করতে পারি! খেতের ছোলা, মকাই-ভুট্টা ছাড়া ঘরে আর আছেটা কি! আপনারা রাজালোক, ওসব মোটা দানার জিনিস কোন মুখে দিই বলুন। আমি তুচ্ছ লোক। ভয় হয়, কে না আবার আস্পদ্দা ভেবে বসে। ঠিক ভরসা হয় না হুজুর। দুধ-দইও তো এমন কিছু অঢেল নয়, বড় মুখ করে কি দি-ই বলুন।'

'একদিন অফিসের লোকজনকে দিয়েই দেখ না, কি বলে? শহরে তো আর এসব জিনিস চট করে মেলে না। তাছাড়া, মাঝে মাঝে মোটা দানার জিনিসও তো খেতে-টেতে ইচ্ছে করে ওদের।'

'হুজুর, কেউ যদি এ নিয়ে কিছু বলে ? সাহেবের কাছে যদি নালিশ-টালিশ করে দেয় ? তবে তো সব্বোনাশ।'

'সে আমি দেখবোখন। তোমায় কেউ কিছু বলবে না। আর, কেউ যদি কিছু বলে, আমি বুঝিয়ে বলবো।'

'আজ্ঞে হুজুর, ক্ষেতে এখন মটর ফলেছে। ছোলার শাক আর কলাইও আছে। এ ছাড়া আর তো কিছু মিলবে না।'

'ঠিক আছে, তাই নিয়ে এসো তুমি।'

'কোন ঝামেলা-ঝনঝাট হলে দেখবেন হুজুর।'

পরের দিন গরীব যখন এল, তার সাথে তিনটে যোয়ান ছেলে। দু'জনের মাথায় ঝুড়িভর্তি মোটরের দানা। এক জনের মাথায় মটকা, তাতে আখের রস। তিন জনেই এক আঁটি করে আখ নিয়ে এসেছে। গরীব এসে চুপচাপ বারান্দার সামনে গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে রইল। অফিসে ঢোকার সাহসই হচ্ছিল না ওর।

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওর যখন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, ততক্ষণে অফিসের চাপরাশী আর কর্মচারীরা ওকে ঘিরে ফেলেছে। কেউ আখ চুষছে, কেউ ঝুড়িটার ওপর হামলে পড়েছে, যেন লুট লেগে গেছে। ইতিমধ্যে বড়বাবু এসে হাজির। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে চেঁচিয়ে বললেন—'এখানে এত ভিড় কিসের, যার যার নিজের কাজে যাও।'

আমি ওনার কানে কানে বললাম—'গরীব ঘর থেকে ভেট নিয়ে এসেছে। আপনি কিছু নিন, আর বাকিটা ওদের বাঁটোয়ারা করে দিন।'

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বড়বাবু বললেন—'কি হে গরীব, এখানে এসব এনেছো কেন? এখুনি নিয়ে যাও, নইলে সাহেবকে আমি রিপোর্ট করবো। আমরা কি সব পেটুক দামু নাকি!'

খুব ঘাবড়ে যায় গরীব। থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। অপরাধীর মত চোখ করে আমার দিকে তাকায়।

আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইলাম। অনেক বলা-কওয়ার পর সাহেব রাজী হলেন। সব জিনিসের অর্ধেক নিজের ঘরে পাঠিয়ে, বাকিটা সবাইকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিলেন। এমনি করে ওই অভিনয়ের পালা শেষ হ'ল।

॥ চার ॥

ইদানীং অফিসে গরীবের খুব নামডাক। ওকে আর হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না, রাতদিন দৌড়তেও হয় না। কর্মচারীরা বা সহযোগীদের কাছ থেকে এখন আর গালমন্দও শুনতে হয় না ওকে। চাপরাশীরা নিজের থেকেই ওর কাজটাজ করে দেয়। নামটাও সামান্য বদলে গেল ওর। গরীব থেকে হল গরীব দাস। স্বভাবেও পরিবর্তন ঘটলো। দীন ভাবটা কেটে গিয়ে অহংকার হয়েছে। তৎপরতার বদলে এসেছে আলসেমি। এক-একদিন দেরীতে অফিসে আসে গরীব; কখনো কখনো অসুখ-বিসুখের দোহাই পেড়ে ঘরে থেকে যায়। এখন ওর সাতখুন মাফ। আত্ম-প্রতিষ্ঠার রাস্তা পেয়ে গেছে ও। পাঁচ-দশ দিন বাদ বাদ বড়বাবুকে ভেট দিয়ে আসে। দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার কায়দাকানুন শিখে গেছে গরীব। সাদা মাটা মানুষটা ধূর্ত হয়েছে।

একদিন বড়বাবু ওকে স্টেশন থেকে অফিসের কয়েকটা বড় বড় পার্শেল ছাড়াতে পাঠালেন। অনেকগুলো পুলিন্দা বেশ বড়সড়। ঠেলায় করে সে সব এল। ঠেলাওয়ালার সাথে গরীবের দর-দস্তুর হয়েছে বারো আনা। কাগজপত্র অফিসে তুলে দিয়ে ঠেলাওয়ালাকে দেবার জন্য ও বড়বাবুর কাছ থেকে বারো আনা উসুল করল। আর অফিস থেকে একটু দূরে গিয়েই ওর চেহারা বদলে গেল। নিজের জন্য ঘুস চাইলো গরীব। ঠেলাওয়ালা রাজী হয় না। ও তখন রেগেমেগে সব পয়সা পকেটে ঢুকিয়ে বলে—'একটা ফুটো পয়সাও দেব না, যা। যেখানে খুশি গিয়ে ফরিয়াদ কর। দেখি, কি করতে পারিস।'

ঠেলাওয়ালা যখন বুঝল ঘুস না দলে পুরো ভাড়াটাই মার যাবে, তখন কান্নাকাটি করে শেষ পর্যন্ত চার আনা ছেড়ে দিল। ওকে একটা আধুলি দিল গরীব, তারপর বারো আনার রসিদ লিখিয়ে, টিপছাপ মেরে, দপ্তরে জমা করল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি থ। এই সেই গরীব! মাস খানেক আগেও যে লোকটা ছিল দীনতা আর সরলতার প্রতিমূর্তি, চাপরাশীদের কাছ থেকে যে কোনদিন নিজের ভাগ চাইতেও সাহস করে নি; যে কোন লোককে খেলাতেই জানতো না—ঘুস খাওয়া তো দূরের কথা। ওর স্বভাব বদলে গেছে দেখে খুব খারাপ লাগলো আমার। এর জন্য দায়ী কে? হ্যাঁ, আমিই ওকে শয়তানি আর ধূর্ততার প্রথম পাঠ দিয়েছি। এসব দেখেশুনে নিজের মধ্যে একটা প্রশ্ন এল—যে লোকটা অন্যের গলা টিপে ধরে, যে লোকটা অপরের অন্যায়ও মুখ বুজে সয়ে যায়,—সে লোকটা আসলে ভালোমানুষ না বদমাশ ছিল? সেটাই ছিল অশুভ মুহূর্ত—যেদিন ওকে আমি আত্মপ্রতিষ্ঠার রাস্তা দেখিয়েছিলাম, আসলে ওটাই ছিল ওর পতনের ভয়ংকর পথ। বাইরের প্রতিষ্ঠার যূপকাষ্ঠে আমিই ওর আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বলি দিয়েছি।

ভাষান্তর: **পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়**

লেখক

বিশবারের ফোটানো চা-পাতা আর একবার ফুটিয়ে প্রবীণবাবু সকালের চা বানালেন। চায়ে চিনি নেই, দুধও নেই। তবু খেতে কোন অসুবিধে হোল না। আর এই ওঁর সকালের জলখাবার। মাসখানেক ধরেই দুধ চিনি ছাড়া চা খেতে হচ্ছে। এসব ওঁর জীবনে খুব একটা দরকারীও নয়। ঘরে অবশ্য ঢুকেছিলেন স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে পয়সা চাইবেন বলে। কিন্তু স্ত্রীকে মড়ার মত ঘুমোতে দেখে ডাকতে আর ইচ্ছে হয়নি। হয়তো সর্দিকাশির জন্য বেচারীর সারারাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে ঘুমটা এসেছে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক হবে না। চুপ-চাপ বেরিয়ে এসেছিলেন।

চা শেষ করে দোয়াত কলম নিয়ে বসলেন। আর ওই বইটার স্বপ্ন ওঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যে বই ওঁর বিচারে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখা হিসেবে স্বীকৃত হবে। যার প্রকাশ আজকের এই পাথরচাপা অবস্থা থেকে ওঁকে পেঁছে দেবে খ্যাতি আর সমৃদ্ধির স্বর্গে।

আধ ঘণ্টা বাদে চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করলো—'কি, তুমি চা খেয়েছ?'

হাসতে হাসতে প্রবীণবাবু বললেন—'হ্যা, খেয়ে নিলাম। খাসা চা বানিয়ে-ছিলাম।

'কিন্তু দুধ কোথায় পেলে?'

'দুধ চিনি তো অনেকদিন ধরেই পাচ্ছি না। আমার এখন সাদা চা খেতেই বেশী ভাল লাগছে। দুধ আর চিনি মেশালে আসল স্বাদটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে যায়। ডাক্তাররাও আজকাল সাদা চা খেতেই বলছে। ইউরোপে তো দুধ মেশানোর চলই নেই। এগুলো এখানকার মিষ্টিখেকো বড়লোকদের বাড়াবাড়ি।'

'এই তেতো চা যে কি করে তোমার ভাল লাগে কে জানে! আমায় ডেকে তুললে না কেন? পয়সা তো রেখেই দিয়েছিলাম।'

প্রবীণবাবু আবার লিখতে শুরু করলেন। লেখার বাতিক ওঁর ছোটবেলা থেকেই। আর বিশ বছর ধরে এই রোগটাকে তিনি পুষে যাচ্ছেন। এই রোগে ওর শরীর ভেঙ্গেছে, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে আর চল্লিশেই কেমন বুড়িয়ে গেছেন। এ রোগ সারানোও আর সম্ভব নয়। ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত সাহিত্যের ভেতর তিনি ডুবে থাকেন। সংসার থেকে মুখ ঘুরিয়ে হৃদয়ের ফুল নিবেদন করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্যে।

ভারতবর্ষে সরস্বতীর উপাসকরা লক্ষ্মীর বিরাগভাজন হয়। মন তো একটাই। এক মনে দুজনকে একসাথে কি আর প্রসন্ন করা যায় ? দুজনের বরই বা একসাথে মিলবে কি করে ? আর লক্ষ্মী যে শুধু ভাতেই মারছে তা নয়। ও'র সবচেয়ে নির্দয় খেলা হল, পত্রিকাসম্পাদক আর পুস্তকপ্রকাশকদের উদারতা আর সহৃদয়-তার ছোঁয়া থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা। সারা দুনিয়াটা যেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। নিরন্তর অভাবে তাঁর আত্মবিশ্বাসও কেমন কমে আসছে। এখন মাঝে মাঝেই মনে হয় তাঁর লেখায় আর সেরকম ধার নেই, প্রতিভারও ঘাটতি আছে। এই হৃদয়বিদারক ভাবনা ও'কে কেমন বিষণ্ণ করে তোলে। দুনিয়া ও'কে সম্মান না জানালেও সাহিত্যে ও'র অবদান এতো তুচ্ছ নয় আগেকার এই ভাবনাও এখন তাঁকে খুব নাড়া দিতে পারছে না। জীবনের নানা টানাপোড়েনে সহ্যের সীমাও পেরিয়ে এসেছেন। সান্ত্বনা একটাই, এ দশাতেও সুমিত্রা খুশী। রবারের বলের বাইরেটা যেমন ভেতরকার বাতাসকে ধরে রাখে, প্রবীণবাবুকেও দুনিয়ার ঠোকর থেকে আগলে রেখেছে সুমিত্রা। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কান্নাকাটি করা দূরে থাক, ওই দেবী যেন সে সব ঘুণাক্ষরে টের পেতেও দেয় না।

চায়ের পেয়ালা সরাতে সরাতে সুমিত্রা বললো—'যাও না। এক আধ ঘন্টা আশপাশ থেকে ঘুরে এসো না। যখন বুঝবে এভাবে নিজেকে শেষ করার কোন মানে হয় না, তখন কপাল চাপড়ে মরবে।'

প্রবীণ লিখতে লিখতে মাথা না তুলেই বলে—'লিখলে কমসে কম একটা সান্ত্বনা থাকে কিছু একটা তো করছি। বেড়াতে গেলে মনে হয় অযথা সময় নষ্ট করছি।'

'এতসব লেখা-পড়া জানা লোক দু'বেলা বেড়াতে বেরোচ্ছে, তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না ?'

'কিন্তু ওদের মধ্যে অধিকাংশই তেমনি লোক যারা ঘুরলে ফিরলে আর্থিক কোন ক্ষতি হয় না। বেশীর ভাগই তো সরকারী চাকুরে। মাসের শেষে মাইনে পায়। ওদের পেশার জন্য লোকে বেশ শ্রদ্ধা করে, খাতির করে। আর আমি তো মিলের মজুর। তুমি কোন মজুরকে কখনো হাওয়া খেতে দেখেছো ? যে খেতে পায় না তার আবার হাওয়া খাওয়ার কি দরকার ! রুটীর জন্যে যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে হাওয়া খেতে বেরোবে কখন ? স্বাস্থ্য আর আয়ু বাড়ানোর প্রয়োজন তাদেরই, যাদের জীবনে আনন্দ ফূর্তি আছে। আমার কাছে জীবন তো একটা বোঝা। এ বোঝা দীর্ঘদিন মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবো এমন ইচ্ছে আমার নেই।'

এমনি হতাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা শুনতে শুনতে সুমিত্রার চোখে জল এসে গেলো। তা লুকোতে ভেতরে চলে গেল সুমিত্রা। ওর মন বলছে এই তপস্বীর কীর্তি বিফলে যাবে না। একদিন না একদিন ফল ফলবেই। লক্ষ্মীর কৃপা নাই বা থাকুক। কিন্তু প্রবীণবাবু নৈরাশ্যের এমন এক সীমায় পেঁছেছেন যেখান থেকে আশার কোন আলো দেখা যায় না।

॥ দুই ॥

একজন রইস ভদ্রলোকের বাড়ীতে উৎসব। প্রবীণবাবুকেও তিনি নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আজ ওঁর মনটা খুশির জোয়ারে উপচে পড়চে। রাজাসাহেব কেমন করে ওঁকে স্বাগত জানাবেন আর উনিই বা কি ধরনের শব্দ সাজিয়ে রাজাসাহেবকে ধন্যবাদ জানাবেন, কি কি বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলবে, ওখানে কোন কোন নামী দামী লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে—সারাদিন ধরে এসব ভাবতে ভাবতে উনি আনন্দে মেতে ওঠেন। এ উপলক্ষে একটা কবিতাও লিখে ফেললেন উনি। যেখানে জীবনকে একটা বাগানের সঙ্গে তুলনা করলেন। পুরোনো সমস্ত ধারণাকে আজ পরিবর্তন করেছেন উনি, বড়লোকদের মনে ওর প্যানপেনে দুঃখের কাহিনী হয়তো দাগ কাটবে না।

দু'পহর বেলা থেকেই প্রস্তুতি শুরু হোলো। দাড়ি কাটলেন, সাবান দিয়ে স্নান করলেন, মাথায় তেল মাখলেন। মুস্কিল হোলো জামাকাপড় নিয়ে। কি পরে উনি যাবেন। বহুদিন আগে একটা আচকান বানিয়েছিলেন। এখন আচকানের দশা তো ওঁর মতই জীর্ণ। ওটাই ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখলেন।

সুমিত্রা বলল—'এ নেমন্তন্নো নেওয়া তোমার উচিত হয়নি। লিখে দিতে, তোমার শরীর খারাপ। এভাবে যাওয়া আরও খারাপ।'

এক দার্শনিক গম্ভীরতায় প্রবীণ জবাব দিল—'ভগবান যাদের হৃদয় আর চিন্তাশক্তি দিয়েছে তারা লোকের পোশাক দেখে বেড়ায় না। ওরা গুণ আর চরিত্রই দেখে। আমার ভেতর কিছু আছে বলেই তো রাজাসাহেব আমাকে নেমন্তন্নো করেছেন। আমি না কোন আহীরদার, না জমিদার, না ঠিকাদার, না জাগীরদার, স্রেফ একজন লেখক। লেখকের মূল্যবিচার তার রচনাতেই। আর এ ব্যাপারে কোন লেখকের কাছ থেকে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ তো আমার নেই।'

ওর সরলতা দেখে সুমিত্রা সহৃদয়তার সাথে বলল, 'তুমি কল্পনার জগতে থাকতে থাকতে বাস্তব সংসার থেকে অনেক দূরে সরে গেছো। আমি জানি, রাজাসাহেবের ওখানে লোকদের বিচার হবে পোশাকের দাম দিয়েই। সরলতা ভাল জিনিস, কিন্তু এর মানে এ নয় যে এতে মানুষের সমস্ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবে।'

এই কথাগুলোর যুক্তি প্রবীণ অস্বীকার করতে পারে না। শিক্ষিত লোকেদের নিজের ভুল স্বীকার করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। বললো—'বুঝতে তো পারছি। তাহলে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে যাব।'

'কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন যাবে।'

'আমি তোমাকে কি করে বোঝাব সব মানুষের মধ্যেই খাতির আর সম্মানের জন্য কি ভীষণ ক্ষিদে থাকে। তুমি হয়তো বলবে, এই ক্ষিদে আবার কি জিনিস? এটা আমার বিকাশের একটা সোপান। এটা মহান সত্তার পূর্ণতা যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। এটা অংশ থেকে পূর্ণতায় তরে ওঠার তাগিদ। এইজন্য কীর্তি

আর সম্মান, আত্মোন্নতি আর জ্ঞানের লিপ্সা খুব স্বাভাবিক। আমি এ লালসাকে খারাপ বলে মনে করি না।'

সুমিত্রা এ কথায় ইতি টেনে বলল—'আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, যাও। তোমার সাথে তর্ক করছি না কিন্তু কালকের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করে এসো। আমার কাছে আর মোটে এক আনা আছে। কারো কাছে ধার নিতে তো বাকী রাখিনি। শোধ দেবো কোত্থেকে? আর অন্য কোন উপায়ই তো আমার মাথায় আসছে না।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রবীণ বললেন—'দু-একটা পত্রিকা থেকে লেখার টাকাটা এসে যাবে মনে হচ্ছে। হয়তো কালকের মধ্যেই পেতে পারি। আর একটা দিন উপোস করতে হলেই বা চিন্তা কি? কাজ করাই তো মানুষের ধর্ম। আমি কাজ করছি, মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করছি। এবং এর পরেও যদি উপোসে থাকতে হয় তাতে আমার কি দোষ বলো? কি হবে? বড়জোর মরে যাবো, বই তো নয়। আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ লোক রোজ মরছে; জগৎ সংসারও ঠিক একইভাবে চলছে। খেতে না পেলে বা মরে যাবো তাতে দুঃখ কী! আমি তো কবীর-পন্থীদের মতো মরলে আনন্দ করার পক্ষপাতী। কবীরপন্থীরা যেমন গান করে, বাজনা বাজাতে বাজাতে শবদেহ নিয়ে যায়। আচ্ছা তুমিই বলো, এর থেকে বেশি কিছু করা কী আমার পক্ষে সম্ভব—হ্যাঁ কি, না বলো। সারা দুনিয়া যখন ঘুমে ডুবে থাকে আমি তখন কলম হাতে বসে। লোকে হাসে-খেলে, আমোদ-ফুর্তি করে আর আমার কাছে, আরাম হারাম হ্যায়। মাসের পর মাস হাসি কি জিনিস আমি টের পাইনি। হোলীর দিনটাও কেমন নিরানন্দে কাটাই। জ্বর-জারী-তেও লেখা বন্ধ করার কথা আমি ভাবি না। মনে আছে, একবার তোমার ভীষণ জ্বর হোলো, অথচ বৈদ্যকে ডাকার ফুরসত পর্যন্ত পাইনি। আর এর পরও যদি দুনিয়া আমায় কদর না করে, তবে নাই বা করলো। প্রদীপের কাজ আলো দেওয়া। আলো ছড়াক কি ওর শিখাকে কোন কিছু আড়াল করুক তাতে প্রদীপের কি যায় আসে।

কে এমন আমার পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয় আছেন যাদের ভালো আমি চাই না? এখন ওদের সামনে দাঁড়াতেও লজ্জা করে। তবু সান্ত্বনা, ওরা আমাকে অসৎ মনে করে না। কিছু করুক বা না করুক, মুখে অন্ততঃ সহানুভূতি জানায়। আজ এ রকম দুর্দিনে একজন বড়মানুষ আমাকে সম্মান জানাচ্ছে বলো নিজের খুশীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয় কি!'

হঠাৎ কেমন নেশায় পেয়ে গেল তাকে। বলতে লাগলেন—'না, আমি আজ অন্ধকারে লুকিয়ে যাব না। আমার গরীবীর কথা সবাই জানে। ওটাকে গোপন করার কোন মানে হয় না। আমি এখনই যাব। বড়লোক বা রাজপুরুষেরা যাদের আমন্ত্রণ জানায় তারা হেঁজিপেজি লোক নয়। রাজাসাহেব সাধারণ বড়লোক নন। উনি শুধু এই শহরের না, ভারতবর্ষের বিখ্যাত বড়লোকদের একজন। আজ কেউ যদি আমাকে ছোট ভাবে আসলে সে নিজেই নীচ।'

॥ তিন ॥

সময় সন্ধ্যা। প্রবীণজী ছেঁড়া পুরোনো আচকান, ফাটা জুতো আর বেঢপ টুপী মাথায় ঘর থেকে বেরোলেন। অদ্ভুত বেমানান দেখাচ্ছে তাকে। একটু মোটাসোটা চেহারার হলেও এত কিম্ভূত দেখাতো না। ভাল চেহারা অনেক কিছু ঢেকে দেয়। সাহিত্য আর স্বাস্থ্যে বোধহয় বিরোধ আছে। কোন সাহিত্য-সেবী যদি মোটা-সোটা, গোলগাল চেহারার হয় তবে বুঝতে হবে ওর ভেতরে মাধুর্য, অনুভূতি আর হৃদয়বৃত্তির বড়ই অভাব! প্রদীপের কাজ শুধু জ্বলা। তেলে টই-টম্বুর হলে প্রদীপ কখনো ভালো জ্বলে? যেরকমই দেখাক না আজ উনি যাবেনই। ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে গর্ব যেন ফেটে পড়ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দোকানদারের ভয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে গলিটা পেরোতে হয় তাঁকে। আজ উনি মাথা তুলেছেন, সবার সামনে দিয়েই যাবেন। সব ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আজ তিনি তৈরী। কিন্তু এখন সন্ধে, সব দোকানেই ভিড়। কেউই ওর দিকে চেয়ে দেখছে না।

প্রবীণজী সারা বাজারটা এক চক্কর ঘুরলেন কিন্তু তাতেও মন ভরলো না। আবার দ্বিতীয়বার ঘুরলেন পুরো বাজারটাই। তাও না। এরপর সোজা ঢুকলেন হাফিজ সামাদের দোকানের ভেতর। হাফিজের শয্যাদ্রব্যের ব্যবসা। বহুদিন হোল প্রবীণ এই দোকান থেকে একটা ছাতা নিয়ে গেছেন। সেটার দাম এখনও দেওয়া হয় নি। প্রবীণকে দেখেই হাফিজ বলে উঠল—'জনাব, এখনও তো ছাতার দামটা পেলাম না। এরকম পঞ্চাশ-একশোটা খদ্দের মিললে দেউলিয়া হতে বেশী সময় লাগবে না। অনেক দিন তো হোল!'

প্রবীণজী তো এর অপেক্ষায়ই ছিলেন। উনি যা চেয়েছিলেন তাই হোলো। বললেন—'না, না, আমি ভুলিনি হাফিজজী। আজকাল হাতে এত কাজ যে বেরোনোও মুশকিল। টাকা পকেটে তেমন না আসলেও আপনাদের দয়ায় আমার ভক্তও কিন্তু কম নয়। আর সে তো আপনি জানেনেই।

'দু'চারজন সবসময়েই ঘরে বসে থাকে। আজ যাচ্ছি রাজাসাহেবের ওখানে। নেমন্তন্নো করেছেন। রোজ দুচারটে এরকম লেগেই আছে।'

এতেই কাজ হোলো। হাফিজ সামাদ বিগলিত হয়ে বললো—'আচ্ছা! আপনি রাজাসাহেবের ওখানে যাচ্ছেন। তা তো বটেই, আপনার মতো গুণী লোকেদের কদর ওরকম রইসেরাই করবে। এ ছাড়া কে আর আছে? সুভানল্লাহ্! আপনার নিশ্চয়ই ওনার সংগে ভালো আলাপ আছে? হাতে কোন সুযোগ সুবিধা এলে এই গরীবকে কিন্তু ভুলবেন না। রাজা সাহেবের এদিকে একটু নজর পড়লে কি আর এতো ভাবনা ছিলো? বড়-সড় একটা অর্ডার পেতাম। ভাবুন, ওর বছরে যার আড়াই তিন লাখ টাকা আয়।'

প্রবীণের কাছে আড়াই তিন লাখ টাকা তুচ্ছ মনে হোলো। কথার জমা-

খরচে ওটা দশ-বিশ লাখ করলেই বা ক্ষতি কি? বললেন—'আড়াই তিন লাখ! আপনি তো ওকে অপমান করছেন মশাই। ওর আয় দশ লাখের কম নয়। কেউ কেউ আন্দাজ করে বিশ লাখের মতো। জমি-জমা আছে, বাড়ী আছে, দোকান আছে, ঠিকা আছে, আমানতের টাকা আছে আর সব কিছুর ওপর সরকার বাহাদুরের সুনজর তো আছেই।'

খুব নম্রভাবে হাফিজ বললো—'এটা তো আপনারই দোকান জনাব। আরে মুরাদো, যা না, সাহেবের জন্য ভালো দেখে দু'পয়সার পান নিয়ে আয়। আসুন না, দু'মিনিট বসুন। কোন জিনিস পছন্দ হলে বলুন, দেখাই আপনাকে। আপনি তো ঘরেরই লোক।'

পান খেতে খেতে প্রবীণ বললেন—'আজ থাক। ওখানে দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর এক দিন আসবো।'

ওখান থেকে উঠে একটা কাপড়ের দোকানের সামনে থামলেন। দোকানের মালিকের নাম মনোহর দাস। সামনে ওকে দাঁড়ানো দেখে মনোহর চোখ তুলল। এই লোকটার জন্য বেচারা হা-পিত্যেশ করে বসে থেকেছে দীর্ঘদিন। তারপর ধরে নিয়েছে ও নিশ্চয়ই এ শহরে নেই। এখন দেখে ভাবলো লোকটা বোধহয় টাকা দিতেই এসেছে। বললো—'প্রবীণজী, অনেকদিন তো আপনার পাত্তাই নেই। আমার লোকেদের পাঠিয়েছি, ওরা আপনার ঘরই খুঁজে বার করতে পারেনি। মুনিমজী, দেখুন তো এনার নামে কত আছে?'

প্রবীণের বুক শুকিয়ে আসছে। তবুও শক্তভাবে খাড়া রইলেন তিনি। সমস্ত অস্ত্রের আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারে যেন এমন কোন কবচ ধারণ করেছেন প্রবীণ। বললেন—'রাজা সাহেবের ওখান থেকে ঘুরে আসি, তারপর আরাম করে বসব'খন। এখন একটু তাড়া আছে, ভাই।'

রাজা সাহেবের কাছে মনোহর দাসের কয়েক হাজার টাকা পাওনা। কিন্তু তবুও বেচারা এখনো তাগাদা করে নি। তিনগুণ উসুলের ধান্দায় আছে। বড়লোকদের মাথায় চাটি মেরে পয়সা লোটায় ওস্তাদ এক ধরনের লোক আছে। মনোহর দাস প্রবীণকে তাদেরই একজন ঠাওরালো। বললো—'আসুন না, পানটা অন্ততঃ খেয়ে যান। ভাইসাব, রাজাসাহেব তো একদিনের আর আমরা তো বারোমাসই আপনার পাশে। কোন কাপড়-চোপড় দরকার হলে নিয়ে যাবেন। সামনেই তো হোলী। সুযোগ পেলে রাজা সাহেবের খাজাঞ্চীকে আমার কথাটা একবার মনে করিয়ে দেবেন, পুরোনো হিসেবে অনেক বাকী আছে। দু-দুটো বছরের হিসেব। আমরা এমন কিছু লাভ করি না যে এভাবে বাকী ফেলে রাখা যায়।'

প্রবীণ বললেন—'না ভাই, এখন পান-টান থাক। আমার সাথে দেখা করার জন্য উনি হয়তো বসে আছেন। আমাকে এত সম্মান করেন যে ওঁকে আমার ব্যাপারে কোন কষ্ট না দেওয়াই উচিত। আমি তো গুণগ্রাহী চাই, টাকা পয়সা

ভিক্ষে নয়। যদি কেউ সম্মান করেন তার গোলামীও করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ টাকার গরম দেখালে তার মনিব হতেও আমার ঘেন্না করে।'

॥ চার ॥

প্রবীণজী রাজা সাহেবের বিশাল ভবনের সামনে যখন পেঁছিলেন, চারধারে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। আমীর আর রইস লোকেদের মোটরগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজায় উর্দিপরা দারোয়ান। একজন ভদ্রলোক মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রবীণজীকে দেখে একটু ইতস্তত করলেন উনি। তারপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন—'আপনার কার্ড আছে?'

প্রবীণের পকেটে আমন্ত্রণপত্র ছিলো। কিন্তু এই ভেদাভেদ দেখে রেগে গেলেন। শুধু ওর কাছেই আমন্ত্রণপত্র চাইলো কেন? আর কাউকে কেন একথা জিজ্ঞেস করেনি। বললেন—'না, আমার কার্ড নেই। আপনি অন্য সবার কাছে যদি চাইতেন তবে আমিও নিশ্চয়ই দেখাতাম। জনে জনে একেকরকম ব্যবহার করছেন বলে আমি অপমানিত বোধ করছি। আপনি রাজা সাহেবকে বলে দেবেন, প্রবীণজী এসেছিলেন। দরজা থেকে ফিরে গেছেন।'

'না, না, সে কি মশাই, ভেতরে চলুন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তাই ভুল হয়েছে, মাফ করবেন। ভগবান আপনাদের ক্ষমতা দিয়েছেন, আমরা আপনাদের কি কিছু বলতে পারি?'

এই লোকটা প্রবীণকে কখনো দেখেনি। কিন্তু ও যা বলেছে তা যে কোনো সাহিত্যের লোককে বলা যেতে পারে আর কোন সাহিত্যসেবীই বোধহয় শেষের এই প্রশংসাগুলো উপেক্ষা করতে পারে না।

প্রবীণ ভেতরে ঢুকে দেখলেন বিস্তৃত সুসজ্জিত লন আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। মাঝখানে ছোট্ট এক জলাশয়। জলাশয়ের মাঝখানে শ্বেতপাথরের পরী। পরীর মাথায় ফোয়ারা। লাল নীল আলোয় ফোয়ারার জল মনে হচ্ছে যেন রামধনু বৃষ্টি হচ্ছে। জলাশয়ের চারধারে টেবিল পাতা। টেবিলের ওপর সুন্দর ঢাকনা আর ফুলদানি।

প্রবীণকে দেখেই রাজা সাহেব স্বাগত জানালেন—'আসুন, আসুন! 'হংস'তে আপনার লেখা পড়ে আমার কি যে ভাল লেগেছে! আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি। আপনার মতো রত্ন এ শহরেই লুকিয়ে আছে। এ তো আমার ধারণাও ছিলো না।'

তারপর উপস্থিত অতিথিদের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন—'আপনারা লেখক প্রবীণের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। ইনি সেই। কি মাধুর্য, কি ভাব-ভাষা, আর কি চমৎকার গতি। বাঃ বাঃ! পড়ে আমার মনটা তো খুশীতে নাচতে শুরু করেছিলো।'

বিলিতি স্যুট-টাই-পরা এক ভদ্রলোক প্রবীণকে এক ঝলক দেখলেন; যেন

চিড়িয়াখানার কোন জীব দেখছেন। তারপর বললেন—'আপনি ইংরেজ-কবিদের লেখা পড়েছেন—বায়রন, শেলী, কীট্‌স এসব।'

প্রবীণ একটু তেজের সাথে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, অল্প-সল্প দেখেছি।'

'আপনি এসব মহাকবিদের কোন রচনা অনুবাদ করুন না। হিন্দী ভাষায় অমর হয়ে থাকবেন।'

প্রবীণ নিজেও বায়রন, শেলী কম বোঝেন না। ওরা ইংরেজ কবি। ওদের ভাষা, শৈলী, বিষয় ব্যঞ্জনা সব কিছুই ইংরেজদের রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। ওদের লেখা অনুবাদ করা নিজের পক্ষে গৌরবজনক বলে তিনি মনে করেন না। যেমন তাঁর লেখাও অনুবাদ করা নিশ্চয়ই ওরা গৌরবজনক মনে করবে না। বললেন—'আমাদের নিজস্ব দর্শনের এত অভাব হয়নি যে আমরা বিদেশী কবিদের কাছ থেকে ভিক্ষে করবো। আমার বিচারে এ ব্যাপারে পশ্চিমেরও ভারতবর্ষ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।'

উনি অনর্গল বকে চললেন। ইংরেজভক্ত ভদ্রলোক প্রবীণকে পাগল ঠাওরালেন।

রাজাসাহেব প্রবীণকে একবার বললেন—'আসুন, মওকা-মহল দেখে এসে তারপর আপনারা কথাবার্তা বলুন। আর ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাপারে কি যেন কথা হচ্ছিলো। যাই বলুন, কবিতায় তো ওদের সমকক্ষ কেউ নেই।'

ইংরেজভক্ত মহাশয় প্রবীণের দিকে গর্বভরে তাকালেন—'এখানকার কবিরা কবিতা কি তাই বোঝে না। এখনও স্থূল প্রেমের কবিতা লিখতেই ওরা ব্যস্ত।'

প্রবীণ ইঁটের জবাব পাথর দিয়ে দিলেন—'আমার মনে হয় আপনি এখানকার কোন কবির লেখা পড়েননি। পড়লেও হয়ত কিছু বোঝেননি।'

রাজা সাহেব প্রবীণকে থামাবার চেষ্টা করলেন—'আপনি মিঃ পরাঞ্জপকে চেনেন না, প্রবীণজী। ওঁর লেখা বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় ছাপা হয়, আর লেখার কদরও খুব।'

প্রবীণ বুঝলেন কে তিনি। পরাঞ্জপেকে নিচে দেখেছেন। বিদেশী পোশাক আর বিদেশী ভাষার ভক্ত জাতিদ্রোহীরা কি করে যে এত সম্মান পায়! ওর কাছে এটা অসহ্য লাগে। কিন্তু কি করা যাবে।

ঐ একই বেশে আর এক ভদ্রলোক এলো। রাজাসাহেব ওকে অভিবাদন জানালেন—'আসুন ডাঃ চাড্ডা! কেমন আছেন?'

ডাক্তারসাহেব রাজাসাহেবের সাথে হাত মেলালেন, তারপর প্রবীণের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'আপনার পরিচয়?'

রাজাসাহেব প্রবীণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি প্রবীণজী। আমাদের ভাষার একজন উঁচুজাতের কবি আর লেখক।'

ডাক্তার সাহেব যেন ঠিক আন্দাজই করেছিলেন, এমনভাবে বললেন—'আচ্ছা! আপনি কবি?'

আর কোন কথা না বলে সামনে এগিয়ে গেলেন ডাক্তারসাহেব।

এরপর আবার ঐ একই পোশাকে আর এক ব্যক্তি—ইনি নামী ব্যারিস্টার। রাজাসাহেব ওর সাথেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঐ ভদ্রলোকও একই সুরে বলল —'আচ্ছা আপনি কবি ?' তারপর সামনে এগিয়ে গেলেন।

এই অভিনয় চললো বেশ কয়েকবার। প্রবীণকে একই কথা বারবার শুনতে হলো 'আচ্ছা ! আপনি কবি ?'

এই কথাগুলো প্রতিবারই ওর হৃদয়ে নতুন করে ঠোক্কর দিতে লাগলো। এবং এর আসল মানেটা কি প্রবীণ ভালই বোঝেন। সোজাসুজি যেন বলতে চায়, তোমার নিজের খেয়াল খুশীতে যা খুশী করছো,—করো। কিন্তু এখানে তোমার কি প্রয়োজন ? তোমার সাহস তো কম নয়, এই সভ্যসমাজে হুটহাট চলে আসছো।

প্রবীণ মনে মনে দারুণ আঘাত পেলেন। নিমন্ত্রণে যে আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন এ অপমানে তা সব উবে গেল। নিজের মনকে ধিক্কার দিলেন—যেমন সম্মানের লোভ, বেশ হয়েছে। এখন তো চোখ খুলেছে, আহা ! কি সম্মানের পাত্র ! এই স্বার্থপর সমাজে তুমি কোন কাজের নও। উকিল ব্যারিস্টার তোমাকে কেন সম্মান করবে ? তুমি ওদের কোন কাজে আসবে না, তোমার কাছ থেকে ওরা কোন মামলা পাওয়ার আশা রাখে না। ডাক্তার-হাকিম কেন তোমাকে সম্মান করবে ? ওদেরকে ঘরে ডেকে ফিস দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। লেখার জন্য তৈরী হয়েছ, লিখে যাও। ব্যস্। সংসারে তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ অতিথিদের মধ্যে হইচই পড়ে গেলো। আজকের প্রধান অতিথি এসেছেন। উনি সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। এই উপলক্ষেই আজকের সব আয়োজন। রাজাসাহেব ছুটে গিয়ে হাত মিলিয়ে ফিরে এসেই প্রবীণজীকে বললেন—'আপনি কবিতা লিখে নিয়ে এসেছেন তো ?'

প্রবীণ বললেন—'আমি কিছু লিখিনি।'

'সে কি ! তবে তো আপনি সব গড়বড় করে দিলেন। আচ্ছা লোক তো আপনি। তাড়াতাড়ি কিছু লিখে ফেলুন। দু-চার লাইন হলেই হবে। এরকম আসরে কবিতা পড়াও ভাগ্যের ব্যাপার।'

'আমি এত তাড়া হুড়ো করে কিছু লিখতে পারি না।'

'আমি কি মিছিমিছি তবে এতগুলো লোকের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিলাম।'

'বিলকুল মিছিমিছি।'

'আরে ভাইসাব, কোন একজন প্রাচীন কবির দু'ছত্র কবিতা শুনিয়ে দিন না। কেউ জানে না। বুঝতেও পারবে না।'

'না, মাফ করবেন। আমি খোশামুদে নই, কথকও নই।'

এই বলে প্রবীণজী দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘরে পেঁছে ওর আসল চরিত্র খুলল।

সুমিত্রা খুশি চিত্তে বলল,—'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কিভাবে ?'

'ওখানে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

'তাই বলো, মনে হচ্ছে ওখানে খুব সম্মান পেয়েছো।'

'হ্যাঁ, এমন সম্মান যা কখনও আশা করিনি।'

'খুব খুশী তো।'

'যা হোক খুব একটা শিক্ষা হ'ল। ভুলে গেছলাম, আমি প্রদীপ—অনির্বাণ জ্বলাই আমার কাজ। আর আমার এই ঘরই আমার স্বর্গ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আজ মর্মে মর্মে বুঝলাম নিরলস সাধনা ছাড়া আর যাই হোক সাহিত্যসেবা হয় না।'

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

শিশু

গংগুকে সবাই ব্রাহ্মণ বলে আর গংগুও নিজেকে তাই বলেই ভাবছে। দূর থেকে দেখেই সহিস চাকরবাকরেরা সবাই আমাকে সেলাম করে। গংগু কোনদিন তা করেনি। ওর হয়তো আশা আমিই মাথা নুইয়ে ওকে নমস্কার জানাবো। আমার এঁটো গ্লাস ও কখনো ছোঁয়না। ওকে পাখা চালাতে বলবো সে সাহসও আমার কখনো হয় নি। ভীষণ গরমে ঘেমে নেয়ে স্নান করছি আশেপাশে দ্বিতীয় কেউ নেই, তখন গংগু নিজের থেকে এসেই বাতাস করতো। কিন্তু মুখে চোখে এমন একটা ভাব, আমাকে যেন ও অনুগ্রহ করছে আর কেনই বা আমি ওর হাত থেকে পাখাটা এখনো ছিনিয়ে নিচ্ছ না। ও একটু বদরাগী ধরনের মানুষ। কারোর কথাবার্তা খুব বেশী সইতে পারে না। সেজন্যেই খুব কম লোকের সাথে ওর ভাব। তাছাড়া সহিস বা আর চাকরবাকরদের সংগে ওঠাবসা করাটাও ওর কাছে অপমানের। তাই ওকে আমি বিশেষ কারো সাথে মেলামেশা করতে খুব একটা দেখিনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাঙে-টাঙেও ওর কোন আসক্তি নেই, যা এই শ্রেণীর মানুষেরই এটা অসাধারণ গুণ। সত্যি বলতে কখনোই পুজো পাঠ বা নদীতে স্নান করতে যেতে ওকে দেখিনি। একদম নিরক্ষর। তাহলেও তো নিজে ব্রাহ্মণ, তাই চায় দুনিয়ার সবাই ওকে সম্মান করুক। আর চাইবেই বা না কেন? পূর্ব-পুরুষের ধনসম্পদের ওপর উত্তরাধিকার সূত্রেএ খনো যখন অধিকার দাবী করা যায়, তখন সেই বা কেন বংশানুক্রমিক পাওয়া সম্মান আর প্রতিষ্ঠা নিজের জন্য দাবী করতে পারবে না? আর সেটাই তো ওর একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি।

পরিচারকদের সাথে খুব কম কথা বলাই আমার স্বভাব। ডাকলেই ওরা আমার কাছে আসে সেটা আমি চাই না। সামান্য কাজের জন্য চাকরদের ডাকা-ডাকি করা আমার ভালো লাগেনা। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নেওয়া, ল্যাম্প জ্বালানো, জুতো পরা, বা আলমারি থেকে বই বার করা—এসব ছোটখাটো কাজ আমি নিজেই করি। তবে এর চেয়ে কঠিন কোন কাজটাজ হলে হীংগন বা ম্যায়কুকে ডাকি। এটা আমার নিজের কাছে অনেকটা স্বাধীন আত্মবিশ্বাসের স্বাদ।

পরিচারকরাও আমার এই স্বভাবের সাথে পরিচিত। ওরাও আমাকে খুব কম বিরক্ত করে। তাই সেদিন সকালে গংগু যখন এসে আমার সামনে দাঁড়ালো আমার খুব খারাপ লাগলো। সাধারণত আগাম মাইনে চাইতে বা অন্য কোন চাকরের

নামে নালিশ জানাতেই এরা আসে। দুটোই আমার ভীষণ খারাপ লাগে। মাস পয়লাতেই প্রত্যেকের মাইনে মিটিয়ে দিই। এরপরেও কেউ যখন কিছু চাইতে আসে আমার রাগ হয়। কে ওদের দু' চার টাকার হিসেব রাখতে যাবে। পুরো মাসের মাইনে নিয়ে ওরা যদি তা পনেরো দিনেই খরচ করে ফেলে আর তারপর আগাম চায়, অথবা যদি এর ওর নামে লাগাতে আসে ওদের ওপর তখন আমার ঘেন্না হয়। এদের এই নালিশ করার কারণটা আমি বুঝি, এটা এক ধরণের তোষামোদের চেষ্টা।

মাথা ঘুরিয়ে বললাম—'কি ব্যাপার, তোমাকে তো আমি ডাকি নি।'

গংগুর চোখমুখ আজ কেমন যেন নম্র ; কষ্ট আর সংকোচের ছাপ পড়েছে। আমি অবাক হলাম। মনে হলো ও কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু বলবার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

কিছুটা নরম হয়ে বললাম—'আরে কি বলবে বলে ফেলো। তুমি তো জানো আমি এখন বেরোবো। দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

গংগু বাধো বাধো ভাবে বললো—'তাহলে আপনি এখন বেরোন, আমি পরে আসব'খন।'

এটা আরও চিন্তার ব্যাপার। এই সাত-তাড়াতাড়িতে ও সংক্ষেপে ব্যাপারটা সারলেই তো পারে। ও জানে শোনার মতো বেশি সময় এখন আমার হাতে নেই। পরে অবসর সময়ে ও তো নির্ঘাৎ ঘন্টাখানেক ধরে বকবক করবে। আমার লেখাপড়াটাকে তাও কিছু কাজ বলে ভাবে ; কিন্তু আমি যখন কোন কিছু সিরিয়াস ভাবনায় ডুবে থাকি, ও ভাবে আমি বুঝি বিশ্রাম নিচ্ছি। আর তখনি এসে ও আমার কাঁধে চাপে।

একটু রাগ দেখিয়েই বললাম—'কি, কিছু আগাম চাইতে এসেছো ? দিতে পারবো না।'

'না, হুজুর। আমি কি কখনো তা চেয়েছি।'

'কারো নামে নালিশ করবে ? আমি ওসব ঘেন্না করি।'

'তাও নয়। আমি তো কখনো কারো নামে কিছু বলিনি।'

গংগু নিজের মনকে শক্ত করলো। ওর চেহারা দেখে বুঝলাম দুম্ করে কিছু বলে ফেলার জন্য সমস্ত শক্তিকে জড়ো করছে। কাঁপাকাঁপা গলায় বললো—'আপনি আমাকে ছুটি দিয়ে দিন। আমি আর এ চাকরী করতে পারবো না।'

এ ধরনের প্রস্তাব আমার কাছে এই প্রথম। এটা আমার আত্মাভিমানে ঘা মারলো। আমি যেখানে নিজেকে মনুষ্যত্বের প্রতীক বলে মনে করি, কখনো কোন কাজের লোককে গালমন্দ করিনি, আদর্শ গৃহকর্তার মর্যাদা যথাসম্ভব রাখার চেষ্টা করেছি, সেখানে এ ধরনের প্রস্তাব আমাকে বিস্মিত করলো। কঠোর স্বরে বললাম—'কেন, কি ব্যাপার ?'

'হুজুর, আপনার মতো লোক আমি আর কোথাও পাবো না। কিন্তু এটা

এমন ব্যাপার যে এখানে আর থাকা যায় না। কোন কিছু রটলে আপনি মিথ্যে বদনামের ভাগী হবেন। আমি চাইনা আমার জন্য আপনার চরিত্রে দাগ লাগুক।'

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকলো। কেমন ধন্দ লাগা অবস্থায় চেয়ারে বসে পড়ে বললাম।

—'কি সব আবোল তাবোল বকছো? সাফ সাফ বলে ফেলো কি ব্যাপার?'

গংগু নম্রভাবে বললো—'ব্যাপারটা হোল মানে ঐ যে মহিলাকে বিধবা আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ঐ গোমতী দেবী…'

তারপর চুপ। অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম—'হ্যাঁ, বের তো করে দিয়েছে, তারপর? তোমার চাকরির সাথেই বা তার কি সম্পর্ক?'

গংগু মাথার বোঝাটা যেন মাটিতে ফেলে দিলো—'আমি ওকে বিয়ে করতে চাই বাবুজী।'

আমি বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। সেকেলে এক মুখ্যুসুখ্যু ব্রাহ্মণ, নতুন দিনের হাওয়া স্পর্শ করেনি, সে কিনা এক কুলটাকে বিয়ে করবে কোন ভদ্রলোক যাকে নিজের উঠোনে পা রাখতে দেবে না। এ মহল্লার শান্ত পরিবেশে গোমতী মৃদু চঞ্চল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। কয়েক বছর আগে সে এই বিধবা আশ্রমে এসেছিলো। আশ্রমের কর্মচারীরা তিন তিনবার ওর বিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকবারই ও পালিয়ে এসেছে পনেরো দিন বা একমাস পর। তাই শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ওকে আশ্রম থেকে বের করে দিয়েছে। সেই থেকে ও মহল্লায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। আর এই এলাকার সব ব্যর্থপ্রেমিক যুবকদের আলোচনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে গোমতী।

গংগুর এই সরলতায় একই সঙ্গে রাগ আর দয়া হলো আমার। এই গাধাটার সারা দুনিয়ায় অন্য কোনো মেয়ে জুটলোনা, এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে? যে তিন তিনবার স্বামীর ঘর থেকে পালিয়েছে সে গংগুর সঙ্গেই বা কদ্দিন থাকবে? বড়লোক হলেও তবু একটা কথা ছিল। ছমাস-একবছর কাটাতে পারবে কিনা সন্দেহ চোখ থাকতেও ও এখন অন্ধ। মনে হয়, পুরো এক হপ্তাও ঘর করতে পারবে না।

আমি সবজান্তার মতো জিজ্ঞেস করলাম—'মেয়েটার জীবনের সব ঘটনা কি জানো?'

'সব মিথ্যে হুজুর। লোকে শুধু শুধু ওর নামে বাজে বদনাম রটিয়েছে।' গংগু যেন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমত জানালো।

'কি বলতে চাও তুমি, ও তিনবার স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আসেনি?'

'ওরা যদি বের করে দেয়, ও কি করবে?'

'তুমি একটা আহাম্মক। ওরা এতদূরে এসে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে, বিয়েতে হাজার টাকা খরচা করছে, সেকি মেয়েটাকে ঘর থেকে বের করে দেবার জন্যে?'

দার্শনিকের মতো গংগু বললো—'ওখানে প্রেম ভালোবাসা নেই হুজুর।

কোন বউই ওখানে টিকতে পারতো না। কোন বউই শুধু রুটি কাপড় চায় না, প্রেম ভালোবাসাও দরকার ওদের। ঐ সব লোকগুলো মনে করে একটা বিধবা বিয়ে করে বিশাল পুণ্য করে ফেলেছে। ওরা চায় মেয়েরা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে দাসী হয়ে থাক। কিন্তু কাউকে আপন করতে হলে নিজেকে আগে তার খুব কাছাকাছি যেতে হয় হুজুর। গোমতীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এর ওপর ওর একটা রোগও আছে। মনে হয় ওকে কোন ভুতে ভর করেছে। মাঝে মাঝে চ্যাঁচামেচি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যায় ও।'

'আর তুমি এরকম একটা মেয়েকে বিয়ে করবে ?'—সন্দিগ্ধ চিত্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম—'যা করবার বুঝে সুঝে করো, নয়তো সারা জীবন্ পস্তাবে।'

গংগু দৃঢ়ভাবে বললো—'আমি সব বুঝে নিয়েছি। বাবুজী, ভগবানের ইচ্ছে থাকলে জীবনে একটা হিল্লে হয়ে যাবে।'

'তাহলে শেষমেশ এই ঠিক করলে ?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'ঠিক আছে, তুমি কাজ ছেড়ে দিতে পারো।'

আমি পুরনো গোঁড়া কোন ধ্যানধ্যারণা বা অর্থহীন সামাজিক বিধি নিষেধের ভক্ত নই। কিন্তু লোকটা একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে বিয়ে করে এখানে বাসা বাঁধলে অনেক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। নিত্যনতুন ঝগড়া বা গোলমাল, পুলিশ, কোর্ট, মামলা—এসব ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তেই হবে। এসব থেকে দূরে থাকাই ভালো। ক্ষুধার্ত প্রাণীর মতো রুটির টুকুরো দেখে গংগু দৌড়চ্ছে। রুটিটা যে তেতো, শুকনো, অখাদ্য সেসব জ্ঞানগম্যি ওর এখন নেই। ওর বিচার বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে। ওকে সরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

॥ দুই ॥

পাঁচ মাস কেটে গেছে। গংগু গোমতীকে বিয়ে করে ওই এলাকাতেই ভাঙ্গা একটা ঘরে থাকে। ও এখন চানা-টানা ফিরি করে বেড়ায়। বাজারে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে আমি ওর খবরাখবর জিজ্ঞেস করি। কেন জানিনা ওর জীবন আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে। এটা একটা সামাজিক প্রশ্নের পরীক্ষা—শুধু সামাজিক নয়, মনোবিজ্ঞানেরও। আমি এর শেষ পরিণাম দেখতে চাই। যখনই ওকে দেখি ও কিন্তু বেশ হাসিখুশী। শান্ত ঋজুতার ছাপ ওর মুখে, আত্মসম্মানে গর্বিত। রোজ বিক্রী হয় এক টাকা পাঁচ সিকের মতো। এর থেকে আট দশ আনা লাভ থাকে। এই ওর জীবিকা। এটাও মনে হয় ভগবানের একটা আশীর্বাদ। কারণ নির্লজ্জতা আর লোভ এ ধরনের মানুষকে যেভাবে পেয়ে বসে ওর মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও নেই। ওর মুখে আনন্দের ঝলক, মনের শান্তি ছাড়া তা আসতে পারেনা।

গোমতী গংগুর ঘর থেকে পালিয়েছে এই খবরটা শুনলাম। জানিনা কেন।

শুনে আমার বিচিত্র এক আনন্দ হোলো। গংগুর সুখী সন্তুষ্ট জীবনে আমার কী কোন ঈর্ষা আছে? ওর কোন অনিষ্ট, কোন দুর্ঘটনা, বা কোনো লজ্জাজনক ঘটনার প্রতীক্ষাতেই যেন আমি ছিলাম। এই খবরে সেই ঈর্ষা কিছুটা সান্ত্বনা পেলো। সবকিছু ঘটলো আমার বিশ্বাস মতো। নিজের অদূরদর্শিতার পরিনামেই ওকে ভুগতে হবে। দেখি ব্যাটা এবার কিভাবে মুখ দেখায়। এবার নিশ্চয়ই ওর চোখ খুলবে। বুঝতে পারবে যারা এই বিয়েতে মত দেয়নি তারা আসলে তার শুভাকাংখী। ওতো মনে করেছিলো, কি না কি এক দুর্মূল্য জিনিষ পাচ্ছে। যেন মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছে। লোকে কত বুঝিয়েছে মেয়েটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কতজনকে দাগা দিয়েছে, ওর সাথেও থাকবে না। ও তখন সেসব কানে তোলেনি। মনে মনে ঠিক করলাম, এবার দেখা হলে রেগেই জিজ্ঞেস করবো—'কি মহারাজ, দেবীজার বর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছো তো? তুমি যে বলতে সে এরকম, সে ওরকম, লোকে মিছিমিছি ওর বদনাম দেয়, এবার বিশ্বাস হোলো তো? এখন বলোতো, ভুলটা কার?'

ওই দিনই হঠাৎ গংগুর সাথে বাজারে দেখা হয়ে গেলো। কেমন বিষণ্ন, এলোমেলো অবস্থা। আমাকে দেখে ওর চোখে জল এসে গেলো। লজ্জায় নয়—দুঃখে। সামনে এসে বললো—'বাবুজী, গোমতী আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কোরেছে।'

আমি ভেতরে ভেতরে আনন্দে দুলে উঠলাম, বাইরে কপট সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম—'তোমাকে তো আমি গোড়াতেই বলেছিলাম। তখন শুনলেনা, এখন পস্তাও। কি আর করবে! টাকা পয়সাও সব সরিয়ে নিয়েছে, না কি?'

গংগু বুকের ওপর হাত রাখলো, যেন এ কথায় ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

'আরে বাবুজী এসব বলবেন না। একটা কিছুও ও ছোঁয়নি। নিজের জিনিষপত্তর ফেলে গেছে। জানি না ও আমার কি দোষ দেখলো। হয়তো আমি ওর যোগ্য নই। ও লেখাপড়া জানে, আমি তো ক'অক্ষর গোমাংস। এতো দিন যে আমার সাথে রইলো এই যথেষ্ট। আর কিছু দিন ওর সাথে থাকলে মানুষ হয়ে যেতাম। আপনার কাছে কত আর ওর গুণ গাইবো। অন্যের কাছে যাই হোক, আমার কাছে ও ছিল দেবী। আমার কেন এই দশা কে জানে। দশবারো আনার মজুর ছিলাম, কিন্তু ওর হাতের গুণে কোনদিন কোন অভাব হয়নি।'

এসব কথা আমাকে নিরাশ করলো। আমি ভেবেছিলাম, গংগু নিজের বোকামির কথা বলবে আর আমি সহানুভূতি জানিয়ে ওর ভুল শুধরে দেবো। কিন্তু কি বলবো এখন!—এই গাধাটার এখনো কোনো রকম শিক্ষা হয়নি। সেই একই মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটাও সত্য, ও এখন বেসামাল।

আমি কুটিল ব্যঙ্গ শুরু করলাম—'তোমার ঘর থেকে কিছু নেয়নি তাহলে?'

'না বাবুজী, কিচ্ছু না।'

'আর তোমাকে এখনো ভালোবাসে!'

'বাবুজী, আপনাকে কি বলব। মরণ পর্যন্ত ওর প্রেম ভুলবোনা।'

'তারপরেও তোমাকে ছেড়ে গেলো ?'

'সেটাইতো আজব ব্যাপার বাবুজী।'

'মেয়েদের আর এক নাম ছলনাময়ী—তা জানো ?'

'ওসব বলবেন না বাবুজী। আমার গলায় কেউ ছুরি ধরে থাকলেও ওর গুণের কথাই বলবো।'

'তাহলে আর কি, যাও, ওকে খুঁজে বার করো।'

'হ্যাঁ, হুজুর। ওকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। কোথায় আছে জানলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসবো। বাবুজী, আমার মন বলছে ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। দেখবেন আপনি। আমি জানি আমার ওপর রেগে ও যায়নি, কিন্তু মন মানে না। আমি খুঁজবো ওকে। মাসের পর মাস ধরে পাহাড় জঙ্গল সবজায়গায় ওকে খুঁজবো। যদি বেঁচে থাকি আপনার সাথে দেখা হবে।'

এই বলে পাগলের মতো গংগু চলে গেলো।

॥ তিন ॥

এরপর এক জরুরী কাজে আমাকে নৈনিতাল চলে যেতে হোলো। একমাস বাদে ফিরলাম। ঘরে ঢুকে কাপড় চোপড় ছাড়ছি, দেখি একটা কচি বাচ্চা কোলে করে গংগু দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নন্দও বোধহয় এতো আনন্দ পায়নি। মনে হচ্ছে ওর প্রতিটি রোমকূপ থেকে আনন্দ ফেটে পড়ছে। চেহারায়, চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার ছাপ। দেখে মনে হয় কোন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক যেন ভরপেট্টা খাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম—'কি মহারাজ, বলো, গোমতী দেবীর কোনো খবর মিললো ? তুমি যে বাইরে গিয়েছিলে ?'

সাথে সাথে ও উত্তর দিলো—'হ্যাঁ বাবুজী, আপনার আশীর্বাদে ওকে খুঁজে বের করেছি। লখনৌতে মেয়েদের হাসপাতালে ছিলো। এখানে ওর এক বন্ধুকে বলে গিয়েছিলো আমি যদি খুব ভেঙ্গে পড়ি আমাকে যেন ওর ঠিকানাটা দিয়ে দেয়। শুনেই লখনৌ গিয়ে ধরে আনলাম। উপরি হিসেবে বাচ্চাটা পেয়েছি।'

বাচ্চাটা তুলে ধরে আমার দিকে বাড়ালো। যেন কোনো খেলোয়াড় পুরস্কারের মেডেলটা গর্বের সাথে দেখাচ্ছে।

উপহাসের সাথে বললাম—'আচ্ছা, তাই নাকি, এই ছেলেটাও পেয়েছো ? গোমতী বুঝি এই জন্যই এখান থেকে ভেগেছিলো। তা, তোমার ছেলেইতো কী বলো ?'

'আমার কেন হবে বাবুজী, এতো আপনাদের, ভগবানের।'

'লখনৌতে জন্মেছে, না ?'

'হ্যাঁ বাবুজী, এক মাস হোলো।'

'তোমার বিয়ে হয়েছে ক'দিন ?'

'এই তো, সাত মাস চলছে ?'

'তাহলে, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই বাচ্চা হোলো ?'

'তাছাড়া আর কি বাবুজী—।'

'এরপরেও এটা তোমার ছেলে ?'

'হ্যাঁ, বাবুজী।'

'কি যাতা বলছো, মাথা ঠিক আছে ?'

বুঝতে পারছিনা, ও আমার ইঙ্গিতটা ধরতে পারছে কিনা, নাকি জেনেশুনে না বোঝার ভাণ করছে। একই সরলতায় গংগু বললো—'মরতে মরতে বেঁচেছে বাবুজী, একেবারে নতুন জম্মো হোলো। তিন দিন তিন রাত শুধু ছটফট করেছে। অসহ্য অবস্থা !'

আরও সোজাসুজি ব্যঙ্গের স্বরে বললাম—'কিন্তু ছ'মাসে বাচ্চা হতে এই প্রথম শুনলাম।'

এতক্ষণে বোধহয় ঠিক জায়গায় আঘাত করেছি।

একটু মুচকি হেসে গংগু বললো—'ও এই কথা ! তা এসব আমার মাথায় একদম আসেনি। এই ভয়েইতো গোমতী পালিয়েছিলো। আমি গিয়ে বলেছিলাম, —গোমতী যদি তোমার মন আমাকে না চায়, আমায় ছেড়ে দাও। আমি এখনই চলে যাবো, জীবনে কখনো আর এদিকে আসবোনা।'

'যদি কোনদিন কোন প্রয়োজন হয়, আমাকে জানিয়ো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তোমার ওপর কোন অভিযোগ আমার নেই। আগে যেমন তোমাকে ভালোবাসতাম, এখনও বাসি। আজও তোমাকে একইভাবে চাই। বোধহয় ঠিক বলিনি, আরও বেশী করে চাই। যদি তুমি আমাকে এখনো ভালবাসো, তবে ফিরে চলো গোমতী। গংগু বেঁচে থাকতে তোমার কোন অসম্মান করবেনা। দেবী মনে করে তোমাকে বিয়ে করিনি। করেছি, পরস্পরকে আমরা চাই বলেই। ওটা আমারই বাচ্চা। আমার নিজের বাচ্চা। আমি একটা বোনা ক্ষেত নিয়েছি। আর একজন ওটা বুনেছে বলে কি ফসল ছেড়ে দেবো ? এই বলে ওকে জোর করে তুলে এনেছি···হুজুর।'

আমি কাপড় ছাড়তে ভুলে গেলাম। কোনো কথা বেরোলনা, চোখে জল এসে গেলো। জানিনা কোন শক্তি আমার মনের সব ঘৃণা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার হাত দুটোকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। আমি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ভীষণ আদরে চুমু খেলাম। নিজের সন্তানকেও এতো আদর করতাম কিনা সন্দেহ।

গংগু বললো—'বাবুজী আপনি বড়ো ভালোমানুষ। আমি গোমতীকে বার-বার আপনার গুণের কথা বলেছি। বলেছি, চলো, একদিন বাবুজীর সাথে দেখা করে আসি। কিন্তু ও বড়ো লাজুক। আসতে চায়না।'

হায়রে আমার ভালোমানুষী ! ভালোমানুষীর পর্দা আজ চোখের সামনে থেকে

সরে গেছে। গদগদ স্বরে বললাম—'না, আমার মতো অযোগ্য মানুষের কাছে ও কেন আসবে? চলো, আমিই ওর সাথে গিয়ে দেখা করি। তুমি আমাকে ভালোমানুষ ভাবো গংগু? আসলে, বাইরে আমি খুব ভালো, কিন্তু ভেতরটা নোংরা। আসল ভালোমানুষ তুমি আর বাচ্চাটা হচ্ছে সেই ফুল। ঐ ফুলই তোমার চরিত্রের সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, গংগু।'

বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে গংগুর সাথে সাথে চললাম।

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

তাগাদা

স্নান সেরে, শিবের মাথায় জলটল দিয়ে দু'দানা গোলমরিচ আর দু'লোটা জল খেয়ে লাঠিটা নিয়ে তাগাদায় বেরিয়ে পড়েন শেঠ চেতরাম।

শেঠজীর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। সব চুল পড়ে গিয়ে মাথাটা এমন সাফ-সুফ দেখায় যেন উষর একটা ক্ষেত। চোখ দুটো ছোট ছোট আর একদম গোল। মুখ, মুখের নিচে ভুঁড়ি, ভুঁড়ির তলায় ঠ্যাং ; পিপের ওপর দুটো খুঁটি গেড়ে দিলে যেমন দেখায়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু পিপেটা বাপু খালি নয় ; সেটা তৎপরতা ও কর্মক্ষমতায় একেবারে টইটম্বুর। পাওনাদারদের সামনে ওই পিপের হাত পা নাড়াচাড়া, মুহূর্তে মুহূর্তে রং-ঢং বদলানো দেখলে নউটংকীর জোকাররাও লজ্জা পেয়ে যাবে। তার চোখ-রাঙানো আর তর্জনগর্জন শুনে ভিড় জমে যায়। ওনাকে কিপটে বলা চলে না ; দোকানে উনি যতক্ষণ থাকেন প্রত্যেক ভিখিরিকে এক পয়সা করে ছুঁড়ে দেন। আর এটা ঠিক, দেবার সময় ওর মাথার দু'চারটে চুল খসে যায়, চোখ দুটো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ওর ঐ নাক সিটকানো দেখে একবারের জায়গায় দু'বার আর কেউ আসে না। পাওনা আদায় করতে হলে এছাড়া কোন পথ নেই—এই সিদ্ধান্ত শেঠজী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো। জলপান সেরে সন্ধে পর্যন্ত উনি একটানা তাগাদা চালিয়ে যান। এতে অন্তত এক বেলার খাওয়া বেঁচে যায়, আর কোন পাওনাদারের ঘাড় ভেঙ্গে দুধ, পুরী, মেঠাইও জুটে যায়। এক বেলার খাওয়া বেঁচে যাওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। এক বেলা খাবারের জন্য যদি এক আনা করেও ধরা যায়, তো উনি তার তিরিশ বছরের মহাজনী জীবনে কমসে কম আটশো টাকা বাঁচিয়েছেন। তাছাড়া ফেরার সময় আরেক বেলার জন্য দুধ, দই, তেল, তরকারি, ঘুটে আর কাঠকুটোও জুটে যায়। প্রায়ই সন্ধের খাওয়াও খেতে হয় না। তাই, তাগাদার আর শেষ নেই। আকাশ যতই খর হোক, আগুন ঝরাক, ঝড়-তুফান উঠুক, প্রকৃতির অটল নিয়মের মতো শেঠজী তাগাদায় বেরোবেনই বেরোবেন।

শেঠ গিন্নী জিগেস করলো—'খাবে তো ?'

শেঠজী গম্ভীরভাবে বললেন—'না।'

'সন্ধেবেলা ?'

'ফেরার পর দেখা যাবে।'

॥ দুই ॥

এক চাষার কাছে পাঁচটা টাকা পেতেন শেঠজী। ছ'মাস ধরে সে বেটা না দিচ্ছে সুদ, না কোন ভেট। আর আসছেও না। ওর ঘর তিন কোশের কম হবে না, শেঠজী তাই একটু ইতস্তত করছিলেন। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, আজ ওগাঁয়ে যাবেনই। বেটা যতই কান্নাকাটি আর ঘ্যানর ঘ্যানর করুক, আজ টাকা আদায় না করে কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু এতটা রাস্তা হেঁটে গেলে লোকে বলবে কি? লোকে বলবে—নামেই শেঠ, কাজে ঘণ্টা। তাও চললেন পায়ে হেঁটে। শেঠজী ধীরে সুস্থে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হাঁটেন, পথচারীদের সাথে গালগল্প করেন—ভাবখানা এমন, যেন হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

হঠাৎ তিনি দেখলেন একটা খালি এক্কা ওদিকেই যাচ্ছে। এক্কাওয়ালা জিগেস করলো—'কতদূর যাবেন, লালা?'

শেঠজী বললেন, 'না যাব আর কোথায়, এই তো দু'পা হাটলেই পেঁাছে যাবো। ঠিক আছে, বসা যাক।'

এক্কাওয়ালা এক নজরে শেঠজীকে একবার দেখে নিল। শেঠজীও তার গোল গোল রাঙা চোখে ওকে একবার দেখলে। দু'জনেই বুঝল, আজ একেবারে শঠে শাঠ্যং......

এক্কা চলল। শেঠজীই প্রথম বললেন—'মিয়া সাহেব, ঘর কোথায়?'

'ঘর আর কই হুজুর, যেখানে পড়ে থাকি, সেটাই ঘর। ঘর যখন ছিল তখন ছিল। ঘর নেই, উড়তেও পারি না আর—ডানা কাটা গেছে। কপাল! কপাল! একদম ন্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে। আমার ঠাকুর্দা ছিল নবাবের চাকলাদার—সাত সাতটা জেলার মালিক। কারো গর্দান নিতে চাইলে তৎক্ষণাৎ গর্দান, ফাঁসিতে চড়াতে চাইলে সংগে সংগে ফাঁসি। হুজুর, ভোর হবার আগেই লাখ লাখ টাকার নজরানা এসে যেত, তোড়া। নবাব সাহেব ভাই-এর মতন দেখতেন। সে এক দিন ছিল। আর আজতো আপনাদের গোলামী করছি, ভাগ্যের ফের।'

হাত মেলাবার সাথে সাথেই শেঠজীর মালুম হ'ল, আজ পার পাওয়া মুশকিল—একেবারে পাকা আখড়াবাজ। কিন্তু কুস্তি তো বেঁধে গেছে, আখড়ায় নেমে পড়েছেন তিনি। বললেন—'তাই বলো, বাদশাহী ঘরানার লোক। মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল। কপালের ফের, সব দিন তো সমান যায় না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, লক্ষ্মী চঞ্চলা। আজ আমার ঘরে তো কাল তোমার ঘরে। তো ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই অনেক টাকা পয়সা রেখে গেছ্লো।'

এক্কাওয়ালা—'আরে শেঠজী, সে সব টাকাপয়সার কি কোন হিসেব ছিল! কত যে তোষাখানা ভরা ছিল—কে জানে। বস্তায় করে সোনা-চাঁদী রেখে দিত। টুকড়ির ভেতর সব হীরে-জহরৎ। এক একটা পাথরের দাম পঞ্চাশ লাখ। আর কি জেল্লা, চেরাগের আলোও তার কাছে লাগে না। তবে কপাল বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। এদিকে ঠাকুর্দার চালীসবাও (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) শেষ হ'ল, আর

নবাবীও ঘুচল। লুঠ হয়ে গেল সমস্ত খাজনা। তাও ঘরে যা ছিল, তাতেই সারা জীবন আব্বাজান তোফা আয়েস করে কাটিয়ে দিলেন। কোন ভদ্দরলোক ওরকম আয়েস করেনি। ষোল কাহারের পালকিতে চাপতেন, সামনে পেছনে চৌকিদার ছুটতো। আমার জন্য যা রেখেছিল, তাও ঢের। হিসেব করে চললে আজো দিন ভালই যেত, তবে রইস লোকের ছেলে, রইস না হয়ে যায়? এক বোতল চড়িয়ে তবে বিছানা থেকে উঠতুম। কে জানতো, একদিন এমন ঠোক্কর খেতে হবে।'

শেঠ—'আল্লার কৃপায় ইমানদারি করে ছেলেপুলে নিয়ে সংসারতো চালাতে পারছো। ভেবে দ্যাখো, আমার-তোমার কত ভাই কত বদ কাজ করে দিন গুজরান করছে, এক এক পয়সার জন্য লালা ঝরাচ্ছে। আরে ভাই, দিন তো সবারই কেটে যায়; কিন্তু ইমান তো রাখা চাই। তা সে তুমি দুধ-ঘিই খাও আর শুকনো ছোলাই চেবাও। সবার বড় হ'ল ইমান। আমি তো মুখ দেখেই আন্দাজ করেছি, তুমি বাপু সৎ আর সাদাসিধে লোক। বেইমান লোকের চোখেমুখে একেবারে শয়-তানির ছাপ।'

এক্কাওয়ালা—'তা যা বলেছেন শেঠজী, ইমানই তো সব। হুজুরদের কাছ থেকে চার পয়সা মিললো তো বালবাচ্চার মুখে দুটো দিলুম। আর পাঁচটা এক্কা-ওয়ালকে দেখুন কেউ রোগে ভুগছে, কাউকে নেশায় খাচ্ছে। আমি ও সবের মধ্যে নেই। খোদার কসম। বড় পরিবার হুজুর, মা আছে বালবাচ্চারা আছে আর দুটো বিধবা বুড়ি; কামাই বলতে তো এই এক্কা। আল্লার দোয়ায় দিন তো কোন মতে কেটে যায় হুজুর।'

'সবই ভগবান করবেন খাঁ সাহেব। রোজগার পাতিতে কোন ঘাটতি হবে না।'

এক্কাওয়ালা—'আপনাদের মেহেরবানীও চাই।'

শেঠ—'ভগবানের মেহেরবানী চাও। বরাতজোর, তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল। এক্কাওয়ালাদের আমার কেমন ভয় ভয় করে, ঝামেলা লেগেই যায়। তবে সব জায়গায় খারাপ ভালো দু'রকম লোকই আছে। তোমার মত সৎ, ভালো মানুষ আমি বাপু আগে দেখিনি। তোমার স্বভাবটাও খাসা!'

শেঠজীর গদগদ কথাবার্ত্তা শুনে এক্কাওয়ালা বুঝল, লোকটা এক নম্বর বৈঠকবাজ। প্রশংসা-ট্রশংসা করে লোকটা আমাকে চাকমা দিতে চাইছে। অন্য কোন কায়দায় মতলব হাসিল করতে হবে। ওনার দয়ার ওপর নির্ভর করলে হয়ে গেল, ভয়-টয় দেখিয়ে যদি কিছু আদায় করা যায়। বললো—'আমাকে যতটা সিধে সরল আর ভালোমানুষ ভাবছেন, আমি তেমন নই লালা। ভালো লোকের সাথে ভালো আর বদ লোক হলে আমিও পাক্কা বদমাস। জুতো পালিশ করে দিতে বলুন, দেবো; কিন্তু ভাড়ার ব্যাপারে কাউকে কোন ছাড় দিই না। ছাড় দিলে খাবো কি?' শেঠজী ভেবেছিলেন লোকটাকে কব্জা করে ফেলেছেন, বিনে ভাড়ায় নির্বিঘ্নে যাওয়া। কিন্তু ওর কথাবার্ত্তা শুনে কান খাড়া হয়ে গেল। বললেন—'টাকা পয়সার ব্যাপারে আমিও কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। তবে ইয়ার দোস্তের

ব্যাপারে তো কিছু ছাড়তেই হয়। তোমায়ও তো মাঝে মাঝে ছাড়তে হয়। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তো আর সব সময় অত দরদস্তুর চলে না।'

একাওয়ালা রুক্ষভাবে বলল—'কাউকে আমি কোন ছাড়ফাড় দিই না। ওস্তাদ আমাকে ও পাঠশালায় পড়ায় নি। এ ব্যাপারে আমি পুরোদস্তুর চাড়াল। কার সাধ্য আমার এক পয়সা মারে। নিজের বউ উঠলেও এক পয়সা ছাড় দিই না; অন্যদের বেলায় তো কথাই নেই। অন্য একাওয়ালারা মহাজনের খোসামোদ করে, ওদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমার কাছে মহাজনেরও রেহাই নেই; সবাই আমার নামে কাঁপে। যার টাকাই নিই, বেমালুম হজম করে ফেলি। দেখি কে কেমন করে আদায় করে; নালিশ করবে, ত' করো—ঘরে আছেটা কি যে ক্রোক করবে।'

শেঠজীর মনে হ'ল জ্বর আসছে তার। বুঝল, এই শয়তানটা পয়সা না হাতিয়ে ছাড়ছে না। এমন বিপত্তি ঘটবে জানলে কিছুতেই সে একায় চড়তো না। এভাবে রোজ রোজ পয়সা-টয়সা দিতে হলে তো লেন-দেন লাটে উঠবে।

শেঠজী ভক্ত মানুষ। জ্ঞান হবার পর থেকে তিনি প্রতিদিন শিবের মাথায় জল দেন একদিনের জন্যও অন্যথা করেন নি। ভক্তবৎসল শিব এখন কি আর তার এই বিপদে সহায় হবেন না। ইষ্টদেবকে স্মরণ করে বললেন—'খাঁ সাহেব, আর সবাইকে যতই দাবান, পুলিসকে তো কিছু দিতেই হয়। ওরা কাউকে ছেড়ে কথা বলে না।'

একাওয়ালা হো হো করে হাসতে থাকে। 'আরে না, না—উল্টে ওদের কাছ থেকেও কিছু আদায় করে নি লালা। কোন শিকার মিলে গেলেই, সস্তা ভাড়ায় গাড়িতে তুলে সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে হাজির করি। কার সাধ্য যে কিছু বলে। ভাড়াও মেলে, ইনামও পাওয়া যায়। ঠেকাবে কে? লাইসেন নিইনি এখনো, বুঝলেন, লাইসেন। মজাসে সদরেও একা নিয়ে যাই। কোনো শালা টঁ্যা-ফো করতে পারে না। মেলা-ফেলা হলে খুব কামিয়ে নি। বেছে বেছে লোকজনকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যাই। ওখানে কারো কিছু করার নেই। ইচ্ছে মতো একদিন—দু'দিন তিনদিন আটক করে রাখবে। ছল-ছুতোর কি আর শেষ আছে। বলে দিলেই হ'ল, লোকটা একটা মেয়েছেলেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; আর একটা মেয়েছেলে দাঁড় করিয়ে বলানো হবে, সে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। কে কি বলবে! সাহেব ছাড়তে চাইলেও, ছাড়ার জো নেই। আমায় সরল সিধে ভাববেন না। এক নম্বর হারামী আমি। সওয়ারদের সাথে আগে ভাগে দরদস্তুর করি না, ঠিক জায়গায় পৌছে দিয়ে ডবল আদায় করে নি। কেউ উল্টো সিধে করলে আস্তিন গুটিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কোন্ শালা সামনে এসে দাঁড়াবে?'

শেঠজী রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। হাতে একটা লাঠি আছে বটে, কিন্তু ওটা ব্যবহার করার মত কোন তাকতই নেই। আজ বড় ফেঁসে আছি; কে জানে আজ

কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। ঢের হয়েছে, এখন মানে মানে নেমে যেতে পারলেই হয়। যা বাঁচে, সেই যথেষ্ট। ভেজা বেড়ালের মত মিউ মিউ করে বললো—'ঠিক আছে, গাড়ি রোকো খাঁ সাহেব, আমার গাঁ এসে গেছে। বলো, কি দেবো ?' ঘোড়াটার পিঠে চাবুক চালিয়ে এক্কাওয়ালা নির্মম ভাবে বলে, 'হিসেব করে নিন, কত হ'ল। আপনাকে না নিলে তিনজন সওয়ারী নিতাম। তিনজন চার আনা করে দিলে মোট বার আনা। আপনি আট আনা দিন।'

শেঠজীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। পঞ্চাশ বছরের জীবনে শেঠজী কখনো একসংগে এত ভাড়া দেন নি। মাত্র এটুকু রাস্তার জন্য এত ভাড়া তিনি কেন দেবেন। সব মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে, যখন সে ঠিক পরিণামের কথা ভাবতে পারে না। আজ শেঠজীরও তাই হ'ল। এক আনা দু' আনার ব্যাপার হলে তিনি না হয় দিয়ে দিতেন ; যদিও সেটা এক এক ফোঁটা রক্ত দেবারই সামিল। কিন্তু আট আনা মানে এক টাকার আদ্ধেক, এর জন্য শুধু তর্কাতর্কি নয়—দরকার হলে তিনি হাতাহাতি করতেও রাজী। কঠিন হয়ে, দৃঢ়তার সাথে গাড়ীতে বসে রইলেন তিনি।

হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা ঝুপড়ি নজরে এল। এক্কা থেমে যায়, শেঠজী ট্যাঁক থেকে একটা দু'আনি বার করে এক্কাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দেন।

এক্কাওয়ালা শেঠজীর দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এ যাত্রা লড়তে হচ্ছে। ওর চোখ মুখের চেহারা পাল্টে গেল, দাঁতে দাঁত ঘসলো। এ শালাকে ভদ্রভাবে জুতো মেরে পয়সা আদায় করতে হবে দেখছি।

নরম গলায় বলল—'আমার হ'য়ে এই পয়সা দিয়ে তিলকুট কিনে বাল বাচ্চা-দের দেবেন। আল্লা আপনাকে দোয়া করুন।'

শেঠজী আরো এক আনা বার করে বলল,—'ব্যস্, আর কোন কথা নয়। এর বেশি একটি পয়সাও আমি দেবো না।'

এক্কাওয়ালা—'হুজুর, আপনারা যদি এমন কথা বলেন, আমাদের মত গরীব মানুষ বাল-বাচ্চাকে কি খাওয়াবে। আমরাও তো মানুষ, মালিক।'

ঠিক এই সময় ঝুপড়ি থেকে গোলাপী শাড়ী পরা এক রমণী পান চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে এল। বলল—'আজ ফিরতে এত দেরী হল যে বড়। তারপর শেঠজীকে দেখে বলল—আচ্ছা ! আজ তোমার এক্কায় লালাজী ছিল ? আজতো জবরদস্ত খদ্দের মিলেছে, আজ তোমায় আর পায় কে। একটাকা তো নিশ্চয়ই পেয়েছো, চটপট এদিকে ছাড়ো।'

এই কথা বলে ও শেঠজীর কাছে এসে দাঁড়ালো—'আরাম করে খাটিয়ায় বসে বিশ্রাম করুন লালা। আজ কি ভাগ্যি, সকাল সকাল আপনার দর্শন মিললো।'

রমণীটির জামা কাপড় থেকে সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ আসছিল। শেঠজীর মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠল। আড়চোখে ওকে দেখতে লাগলেন তিনি। রমণী চঞ্চলা, লাস্যময়ী কথাবার্তায় দারুণ। শেঠেনীর ছবিটা ভেসে উঠল চোখের ওপর ; মোটা,

থলথলে আর কেমন বেঢপ। ফুটি-ফাটা রয়োপ পাতা, জামাকাপড় থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। শেঠজী মোটেই তেমন রসিক ব্যক্তি নন। কিন্তু এখন তার চোখ একেবারে ছানাবড়া। চোখ সরিয়ে নেবার জন্য শেঠজী খাঠিয়ায় গিয়ে বসলেন। এখনো এক ক্রোশ রাস্তা যেতে হবে, সে সব তার এখন খেয়াল থাকে না।

রমণী একটা ছোট্ট পাখা নিয়ে এসে শেঠজীকে হাওয়া করতে লাগলো। ওর হাতের আন্দোলনে চারদিকে একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল আর শেঠজীর অবস্থা তখন, যাকে বলে উন্মত্ত।

শেঠজী জীবনে কখনো এমনি উল্লাস ভোগ করেন নি। সবাই ওকে ঘেন্না করে। শেঠজীর মনটা বিহ্বল হয়ে উঠল। ওর হাত থেকে পাখাটা তিনি কেড়ে নিতে চাইলেন।

'তোমার কষ্ট হচেছ, দাও আমি হাওয়া করি।'

'সে কি কথা লালাজী। আপনি আমাদের ঘরে এসেছেন আর এটুকু যত্ন করতে পারবো না? আপনার জন্য আর কি-ই বা এমন করতে পারি! কোথায় যাবেন? এখন অনেক বেলা হয়ে গেছে, আর কোথায় যাবেন।'

শেঠজী তার চোখের লালসা আর মনের কুপ্রবৃত্তিটা কোনমতে দমিয়ে বললেন—'একটু দূরেই একটা গাঁ আছে, ওখানেই যাবো। এদিক দিয়েই ফিরবো সন্ধেবেলা।'

সুন্দরী খুশী হয়ে বলল—'আজ তাহলে এখানেই থেকে যাবেন। সন্ধেবেলা কোথায়ই বা যাবেন, না হয় একটা দিন বাড়ির বাইরেই কাটালেন। কে জানে আবার কবে দেখা হবে।'

এক্কাওয়ালা শেঠজীর কানে কানে বলল—'পয়সা ছাড়ুন, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করি।'

শেঠজী চুপচাপ একটা আধুলি বের করে দিল।

এক্কাওয়ালা আবার জিগেস করলো—'আপনার জন্য মিষ্টি ফিষ্টি কিছু আনবো? আপনার মুখে দেবার মত মেঠাই অবশ্য এখানে মিলবে না, তবু মিষ্টি মুখ করবেন—এই আর কি!'

শেঠজী বলল—'না, আমার মিষ্টির দরকার নেই। বাচ্চাদের জন্য এই চার আনার মিঠাই এনো।'

সিকিটা শেঠজী এমন তাচ্ছিল্যভাবে ছুঁড়ে দিলেন যেন চার আনাটা তার কাছে কোন ব্যাপারই না। সুন্দরীর মুখের ভাবটা লক্ষ্য করার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু তাকালেন না, পাছে কেউ ভেবে বসে লালা চার আনা দিয়ে কাউকে কিনে নিচ্ছে।

এক্কাওয়ালা সিকিটা তুলে চলে যাচ্ছিল; কিন্তু সুন্দরী বলল—'শেঠজীর চার আনা ফেরৎ দাও। সংগে সংগে তুলে নিলে, লজ্জাও করলো না। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও। আট আনার টাটকা মেঠাই বানিয়ে এনো।'

ও টাকা বের করে ছুঁড়ল। শেঠজী লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলেন। এক্কা-

ওয়ালার বউ, সে কিনা তাকে এত খাতির করছে। পুরো একটা টাকাই দিয়ে দিল। এতটা সহ্য হ'ল না শেঠজীর। বললেন—'না, না, এ হতে পারে না। তোমার টাকা তুমি রেখে দাও। আমি টাকা দিচ্ছি। এই নাও, আট আনার নিয়ে এসো।' কথার ফাঁকে শেঠজী একবার সুন্দরীকে দেখে নিলেন। এক্কাওয়ালা চলল মিঠাই আর খাবার-দাবার আনতে ; সুন্দরী শেঠকে বলল—'ওর তো আসতে দেরী হবে লালাজী ততক্ষণে পান তো খান।' শেঠজী এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—'ধারে কাছে পানের দোকান তো দেখছি না।'

সুন্দরী কটাক্ষভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—'কেন, আমার হাতের সাজা পান কি দোকানের পানের চেয়ে খারাপ হবে ?'

শেঠজী লজ্জিত হয়ে বললেন—'না, না, তা না। তুমি তো মুসলমান।'

সুন্দরী মনোরম ভংগীতে বলল—'খোদার কসম, এ কথার পর তো আপনাকে পান খাইয়েই ছাড়তে হবে।'

এই বলে ও পানদান থেকে এক খিলি পান নিয়ে শেঠজীর দিকে এগিয়ে এলো। শেঠজী 'আরে, আরে' করে উঠল, তারপর দু'হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন আর ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে রইলেন। কিন্তু সুন্দরী কিছুতেই হার মানছে না দেখে শেষটায় শেঠজী উপায়ন্তর না দেখে পড়ি কি মরি দৌড় মারলেন। লাঠি খাটিয়ার পাশেই পড়ে রইল। বিশ পা গিয়ে থামলেন একবার, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—'দ্যাখো, এভাবে কারো ধর্মনাশ করা উচিত নয়। তোমাদের হাতের জল খেলে আমাদের ধর্মনষ্ট হবে।'

সুন্দরী আবার ছুটলো। শেঠজী আবার পালাতে লাগলেন। তার পঞ্চাশ বছ-রের জীবনে এভাবে তাকে কোনদিন দৌড় করতে হয় নি। ধুতি খুলে যাচ্ছে। কিন্তু তা ঠিকঠাক করে নেবার মতো সময় নেই। ধর্মকে কাঁধের ওপর ফেলে প্রাণ-পণে ছুটতে লাগলো বেচারা। টেরই পেল না, কখন ট্যাঁক থেকে বটুয়াটা খসে পড়েছে। পঞ্চাশ পা মতো আবার দৌড়লেন, ধুতি ঠিক করতে গিয়ে দেখেন বটু-য়াটা হাপিস। পেছন ফিরে দেখলেন হাতে বটুয়াটা নিয়ে সুন্দরী তাকে দেখাচ্ছে আর ইশারায় ডাকছে।

কিন্তু টাকার চেয়েও শেঠজীর কাছে ধর্মের দাম অনেক বেশি। দু'চার পা গিয়ে আবার ফিরে তাকালেন তিনি।

তার ধর্মবোধ তৎক্ষণাৎ ধিক্কার দিয়ে উঠল। কয়েকটা টাকার জন্য তিনি ধর্ম বিসর্জন দেবেন ! টাকা অনেক মিলবে, কিন্তু একবার ধর্মনাশ হ'লে জীবনে আর রইলটা কি।

এসব ভাবতে ভাবতে শেঠজী নিজের রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন। যেন একটা আহত, ক্ষতবিক্ষত কুকুর প্রাণপণে পালাচ্ছে আর বার বার পেছন ফিরে দেখছে, বদমাশ ঝগড়াটে অন্য কুকুরগুলো তার পেছন পেছন আসছে না তো।

ভাষান্তর : **পার্থ বন্দোপাধ্যায়**

মুক্তি-পথ

সিপাইদের যেমন লাল পাগড়ীর ওপর, সুন্দরীদের যেমন নিজের গয়নার ওপর আর বৈদ্যদের যেমন সামনে-বসা রোগীদের ওপর গর্ব থাকে—ফসলভাঁত নিজের ক্ষেত দেখে কিসানদের গর্বও হয় সেই রকম। নিজের আখ ক্ষেত দেখতে দেখতে কেমন এক নেশায় মেতে ওঠে ঝীংগুর। তিন বিঘে জমির আখ। ছয়শ' টাকা অনায়াসেই পেয়ে যাবে। আর ভগবানের দয়ায় দর যদি কিছু বাড়ে তবে তো কথাই নেই। দুটো বলদই বুড়ো হয়ে গেছে। বটেসরের মেলা থেকে দুটো নতুন বলদ নিয়ে আসবে। আরও দু'বিঘা জমি যদি পেয়ে যায় তবে লিখিয়ে নেবে নিজের নামে। টাকার জন্য কি চিন্তা! মহাজনেরা এখন থেকেই ওর খোশামোদ করছে। গাঁয়ে এমন কেউ নেই যার সাথে ও লড়েনি। ওর চেয়ে বড় কেউ থাকতে পারে এটা ও ভাবতেই পারেনা।

একদিন সন্ধেবেলা ছেলেকে কোলে নিয়ে মটরদানা ছুলছিল ঝীংগুর। হঠাৎ একপাল ভেড়াকে ও ওর দিকে ধেয়ে আসতে দেখলো। মনে মনে বলে উঠলো—'আরে, এদিক দিয়ে ভেড়াগুলোর বেরোনোর রাস্তা কোথায়? ওগুলো কি ক্ষেতের ওধার দিয়ে যেতে পারে না। এদিকে আসার কি প্রয়োজন? ভেড়াগুলো ক্ষেতে চরবে, সমস্ত ফসল নষ্ট করবে। এর খেসারত কে দেবে? এ নিশ্চয়ই বুদ্ধু চরানীটার কাজ। ব্যাটার দেমাক বড্ডো বেড়েছে। নাহলে ক্ষেতের ভেতর ভেড়া নিয়ে আসে। কি স্পর্ধা! দেখছে আমি এখানে তবু ভেড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।' আমাকে কেউ কোনদিন ছেড়ে কথা বলে নি, আর, আমিই বা কাউকে ছেড়ে কথা বলবো কেন? এখন একটা ভেড়া কিনতে চাইলে পাঁচ টাকা দর হেঁকে বসবে। সারা দুনিয়ায় বিক্রী হয় চার টাকায় আর বুদ্ধু পাঁচ টাকার নীচে কথাই বলে না।

ভেড়াগুলো ততক্ষণে ক্ষেতের এপাশে চলে এসেছে। হা হা করতে করতে ঝীংগুর চেঁচিয়ে উঠলো—'আরে, এই ভেড়াগুলোকে কোথায় নিয়ে আসছো?'

বুদ্ধু নম্রভাবে বললো—'মহাতো, আলের ধার ধরেই চলে যাবো। ঘুরপথে গেলে ক্রোশখানেক বেশী ঘুরতে হয়।'

ঝীংগুর—'তোমার ঘুরপথ বাঁচাতে আমি কি নিজের ক্ষেত মুড়িয়ে দেবো? ধার দিয়েই যদি যেতে হয়, অন্য কারোর ক্ষেতের ধার দিয়ে যাওনা কেন? আমাকে কি ডোম চামার ঠাউরেছো? পয়সার খুব গরম হয়েছে, না? নিয়ে যাও এগুলো।

বুদ্ধু—'মহাতো, আজকের মতো যেতে দাও। আর কোনদিন যদি এদিক দিয়ে যাই তোমার যা-ইচ্ছে করো।'

ঝীংগুর—'বললাম না, এগুলোকে নিয়ে যেতে। একটা ভেড়াও যদি ক্ষেতে ঢোকে তো তোমাকে আমি দেখে নেবো।'

বুদ্ধু—'মহাতো, একটা শীষও যদি কোন ভেড়া মাড়ায় তবে আমাকে এখানে বসিয়ে একশোটা গালাগাল দিয়ো।'

বুদ্ধু কথাবার্তা খুব নরম সুরে বলছিলো। কেননা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা ওর কাছে অপমানের। ও ভাবলো, এরকম ছোটখাটো ধমক-ধামকে ভেড়া যদি ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে তো শেষ পর্যন্ত ভেড়া চরানোই মুস্কিল হয়ে পড়বে। আজ ফিরে যাবো তো কাল ওরা কোন রাস্তা দিয়ে যেতে দেবে না। সবাই চোটপাট করতে শুরু করবে।

বুদ্ধু পোড়খাওয়া লোক। ওর এখন বারো কুড়ি ভেড়া। রাতে ভেড়াগুলোকে ক্ষেতে চরানোর জন্য আট আনা মজুরী পায়। এর ওপরে দুধটা সে বিক্রি করে। কম্বল বানায়। ও ভাবতে লাগলো—ওর এত গরম হওয়ার কি আছে? কি করবে ও আমার? আমি কি ওর চাকর নাকি!

এতক্ষণ ধরে ভেড়াগুলো কচি পাতাগুলো দেখতে দেখতে অধীর হয়ে উঠলো। কয়েকটা ক্ষেতে ঢুকে পড়লো। বুদ্ধু লাঠি দিয়ে মারতে মারতে ক্ষেতের কিনারে হটিয়ে দিতে লাগলো ওগুলোকে। কিন্তু ভেড়াগুলো এদিক ওদিক দিয়ে গলে আবার ক্ষেতে নামতে লাগলো। রেগে আগুন হয়ে ঝীংগুর বললো গিয়ে—'আমার ওপর গায়ের জোর ফলাতে এসেছো। ঠিক আছে আমিও দেখছি তোমার কতো হিম্মৎ।'

বুদ্ধু—'তোমাকে দেখে ওরা ঘাবড়ে যাচ্ছে। তুমি একটু সরে যাও। আমি সবকটাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি।'

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে নিজের ডান্ডাটা তুলে নিল ঝীংগুর। তারপর ভেড়ার পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধোপারাও বোধহয় এত নির্দয়ভাবে নিজের গাধাকে পেটায় না। কোন ভেড়ার ঠ্যাং ভাঙলো, কোনটার কোমর। সবকটা ব্যা ব্যা করে ত্রাহি চীৎকার শুরু করলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিজের সেনাদলের এই ক্ষতি নিজের চোখে দেখলো বুদ্ধু। ও না ডাকলো ভেড়াগুলোকে, না ঝীংগুরকে কিছু বললো। ঘটনাটা দেখলো ঠায় দাড়িয়ে। অমানুষিক পরাক্রমে দু'মিনিটের ভেতর এই সেনাদলকে মেরে ছত্রভঙ্গ করে দিল ঝীংগুর। বিজয়গর্বে বললো—'এবার সিধে চলে যাও। ফের এদিকে আসার নামও নিওনা।'

আহত ভেড়াগুলোকে দেখতে দেখতে বুদ্ধু বললো—'ঝীংগুর কাজটা ভাল করলে না। পরে পস্তাবে।'

একজন কিসানের ওপর বদলা নেওয়া একটা কলা কুচি করে কাটার চেয়েও সহজ। কিসানের সমস্ত ধনসম্পদ তার ক্ষেতেই থাকে, নয়তো গোলায়। ঈশ্বর

আর প্রকৃতির কতো বাধা পেরিয়ে ঘরে শস্য তুলতে হয়। আর যদি কেউ এই বাধা-বিপত্তির সাথে মিতালী করে শত্রুতা করে তবে সেই কিসান বেচারার পা রাখবার জায়গা থাকবেনা। বাড়ী ফিরে ঝীংগুর যখন অন্যদের এই সংগ্রামের বৃত্তান্ত শোনালো, লোকজন ওকে বোঝাতে লাগলো—'ঝীংগুর, তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছো। সব জেনেশুনে না জানার ভান করছো। জানোইতো বুদ্ধু কি ঝগড়াটে। এখনো সময় আছে, ওকে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো, নইলে তোমার সাথে সারা গাঁয়ের লোক বিপদে পড়বে।'

ঝীংগুর কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। কেন ওকে রুখতে গেলাম, ভেবে পস্তাতে লাগলো। কিছু ফসল ভেড়াগলো যদি খেতোই কি এমন ক্ষতি হতো। ভগবানও সবসময় এই গোয়ার্তুমি পছন্দ করে না। মন না চাইলেও অন্যদের অনুরোধে বুদ্ধুর ঘরের দিকে রওনা হলো ঝীংগুর। অগ্রহায়ণ মাস, কুয়াশা পড়েছে। চারিদিকে নেমে আসছে অন্ধকার। গাঁ ছাড়িয়ে যাওয়া মাত্রই আখ ক্ষেতের দিকে হঠাৎ একটা আলো দেখে থমকে দাঁড়ালো ঝীংগুর। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো। ক্ষেতে আগুন লেগেছে। ও দৌড় শুরু করলো দিকবিদিক শূন্য হয়ে। মনকে সান্ত্বনা দিলো ওটা নিশ্চয়ই ওর ক্ষেত নয়। কিন্তু দূরত্ব কমার সাথে সাথে আশা কমতে থাকলো। যে অনর্থ দূর করতে ও ঘর থেকে বেরিয়েছে সেটাই ঘটলো। ঐ খুনেটা আগুন লাগিয়ে ওর সাথে সাথে সারা গাঁটা শেষ করে দিলো। দৌড়তে দৌড়তে মনে হচ্ছে ক্ষেতটা আজকে অনেক সামনে চলে এসেছে। মাঝখানের পোড়ো জমিটার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। যখন পেঁছিলো আগুনের তখন ভয়াল রূপ। ঝীংগুর হায় হায় করে চেঁচাতে শুরু করলো। গাঁয়ের লোকেরা দৌড়ে এসে অড়হড়ের ডালগুলো উপড়ে নিয়ে আগুন পেটাতে লাগলো। শুরু হলো আগুন আর মানুষের জবর সংগ্রাম। বহুক্ষণ অব্দি শোনা গেলো হাহাকার। কখন মানুষ জিতছে, কখনও আগুন। এই যুদ্ধ পাগল আগুন মরতে মরতে বেঁচে উঠে দ্বিগুণ শক্তিতে সমস্ত অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলো। মানুষ-যোদ্ধাদের ভেতর যার ভূমিকা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সে বুদ্ধু। কোমর অব্দি ধুতি গুটিয়ে, প্রাণ হাতে করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো বারবার। শত্রুকে হারাতে গিয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি আসতে হলো বুদ্ধুকে। শেষমেশ জয় হলো মানুষেরই! কিন্তু এতো জয় নয়, ধ্বংসের অট্টহাসি। সারা গাঁয়ের আখ জ্বলে ভস্ম হয়ে গেলো। শুধু আখ নয়, ভস্ম হলো মানুষের সমস্ত সাধ।

॥ তিন ॥

আগুন কে লাগিয়েছে এ ব্যাপারটা খুব গোপন রইলোনা। কিন্তু কোন কথা বলতে সাহস করলোনা কেউ। কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া তর্ক করা বৃথা। ঘর থেকে বেরুনোই মুশকিল হোলো ঝীংগুরের। যেখানেই যায় নানারকম কথা শুনতে হয় ওকে। লোকেরা মুখের ওপর বলছে—'এ আগুনতো তোমার জন্যই।

তুমি আমাদের এ সর্বনাশ করেছো। দেমাকে তোমার মাটিতে পা পড়ে না। নিজে নিজের সর্বনাশ করলে আর তার সাথে ডোবালে আমাদেরকেও। বুদ্ধুর সাথে ওই কাণ্ডটা না বাঁধালে আজকে এই দশা হয়?'

নিজের সর্বনাশের জন্য ঝীংগুর যে বড় আঘাত পেয়েছে তার তুলনায় ওদের কথাগুলোর জ্বালা অনেক বেশি। সারারাত ধরে যখন চলে আখ মাড়াই, গুড়ের গন্ধে ম' ম' করে বাতাস, বড়ো বড়ো উনুনে আগুন ধরিয়ে লোকজনে চারপাশে ঘিরে বসে হুকো টানে, সেখানে এখন নিথর নিস্তব্ধতা। ঠাণ্ডার জন্য অন্ধকার পড়তে না পড়তেই লোকে দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে যায় আর ঝীংগুরকে শাপমন্দ করে। মাঘ মাস আরও বেশী কষ্টদায়ক। আখ শুধু পয়সাই দেয়না, কিসানদের বাঁচিয়েও রাখে নানাভাবে। আখ দিয়েই ওরা শীত কাটায়—আখের গরম রস খায়, আখের পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোহায়, আর ডগাগুলো গরু-মোষকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে। গাঁয়ের যে কুকুরগুলো রস জ্বালানো উনুনের গায় নিভু নিভু আগুনের তাপে গরম থাকতো সেগুলো প্রচণ্ড শীতে মারা গেলো। পাতার অভাবে মারা গেল বেশ কিছু গেরস্থের পশু। প্রচণ্ড ঠান্ডায় সারা গাঁয়ে সর্দি জ্বর ছড়িয়ে পড়লো। আর এই সমস্ত বিপত্তির জন্য দায়ী ঝীংগুর—প্রতিবেশী সবাই অভিশাপে অভিশাপে শেষ করে ফেললো ওকে।

এসব দেখে নানা কিছু ভাবতে ভাবতে ঝীংগুর ঠিক করলো বুদ্ধুর দশাও এরকম করতে হবে। বুদ্ধুর জন্য আমার সর্বনাশ হলো আর ও ফূর্তিতে মশগুল। আমিও ওর সর্বনাশ করবো।

সেই ভয়ংকর ঝগড়ার বীজ যেদিন পোঁতা হয়েছে তারপর থেকে বুদ্ধু এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ওর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করলো ঝীংগুর। বুদ্ধুকে দেখাতে চায় আগুন লাগাবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ওকে ঝীংগুর করেনি। একদিন কম্বল নেওয়ার আছিলায় ওর কাছে গেলো, একদিন গেলো শুধু দুধের জন্য। বুদ্ধু ওর খুব যত্ন-আত্তি করলো। দুধ আর সরবৎ না খাইয়ে ছাড়লো না ঝীংগুরকে।

ঝীংগুর এখন চটকলে মজদুরের কাজ করে। বেশ কয়েক দিনের মজুরী ও একসাথে পায়। তবু বুদ্ধুর সহযোগিতায় ঝীংগুরের রোজেরটা রোজ ঠিকঠাক চলে। আর এভাবেই ঝীংগুর বুদ্ধুর সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে চলে। একদিন বুদ্ধু ওকে জিজ্ঞেস করলো—'কি ঝীংগুর, তোমার আখ যে জ্বালিয়েছে তাকে যদি এখন হাতের কাছে পাও কি করবে? সত্যি কথা বলবে কিন্তু।'

গম্ভীর ভাব দেখিয়ে ঝীংগুর বললো—'আমি ওকে বলবো, ভাই, তুমি যা করেছো ভালই করেছো। আমার দেমাক ভেঙ্গেছো। আমাকে মানুষ বানিয়েছো।'

বুদ্ধু—'আমি যদি তোমার জায়গায় পড়তাম, ওর ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না।'

ঝীংগুর—'দু'চার দিনের এই জীবনে এত শত্রু বিরোধ বাড়িয়ে কি লাভ

বলো ? আমি তো শেষ হয়েছিই, আর একজনকে শেষ করে কি পাব আমি ?'

বুদ্ধু—'ঠিক, এই তো মানুষের ধর্ম। কিন্তু দেখলামতো অনেক, ক্রোধে মানুষের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়।'

॥ চার ॥

ফাল্গুন মাস। চাষীরা আখ বোনার জন্য ক্ষেতকে তৈরী করছে। বুদ্ধুর বাজার গরম। প্রত্যেকেই ওর ভেড়া চায়। রোজই দু চার জন দরজায় দাঁড়িয়ে খোশামোদ করে ভেড়ার জন্য। বুদ্ধু কারোর সাথেই সোজা মুখে কথা বলে না। ভেড়ার ভাড়াও দ্বিগুণ করেছে। কেউ আপত্তি করলে ও সোজাসুজি বলে—আরে ভাই, আমি আমার ভেড়াকে তো তোমার গলায় ঝোলাচ্ছিনা। না পোষায় নিওনা। কিন্তু যা বলে দিয়েছি তার চেয়ে এক পয়সাও কম হবে না।

ঠেকা থাকে বলেই এই চড়াদাম শুনেও লোকে ওর চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো। ঠিক যেমন পান্ডাগুলো যাত্রীদের পিছু নেয়। লক্ষ্মীর চেহারা তো খুব বিশাল নয় কিন্তু সময় বুঝে সেও নিজেকে ছোট বড়ো করে নেয়। আকার ছোট করে কখনো একটা কাগজের ওপর ছাপা অক্ষরে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। কখনো মানুষের জিভে গিয়ে বসে। ওর তখন কোন আকারই থাকে না। কিন্তু সবসময় থাকার জন্য ওর বেশ বড়সড় জায়গার দরকার। ও আসে আর ঘর বাড়তে থাকে। ছোট ঘরে কখনো থাকতে চায় না। বুদ্ধুর ঘরও বাড়ছে। দরজার সামনে একটা বারান্দা করিয়েছে। দুটোর জায়গায় ছটা ঘর বানিয়েছে। কোন কিসানের কাছ থেকে কাঠ নিয়েছে, কারোর কাছ থেকে বাঁশ, কারোর কাছ থেকে ঘুঁটে নিয়েছে, উনুন জ্বালানোর জন্য। চালা ছাইতে ওকে কোন নগদ পয়সা গুনতে হয়নি। কিন্তু কয়েকটা ভেড়ার বাচ্চা অবশ্য খরচা করতে হয়েছে। এ সবই লক্ষ্মীর ক্ষমতা। সমস্ত কাজ ফোকটে হয়ে গেছে। বিনে পয়সায় একটা খাসা বাড়ী হয়েছে। গৃহ-প্রবেশ উৎসবের জন্য তৈরী হতে শুরু করলো বুদ্ধু।

ঝীংগুর দিনভর খাটে তবুও আধপেটের বেশী ভাত জোটেনা। বুদ্ধুর ঘরে সোনা বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ঝীংগুর যদি এতে রাগে ক্রোধে জ্বলতে থাকে তবে সেটা কি ওর একটা মস্ত অপরাধ ? এই অন্যায়কে কি ও সহ্য করবে ?

একদিন হাঁটতে হাঁটতে চামার পট্টির দিকে চলে এলো ঝীংগুর। হরিহরকে ডাকলো। বেরিয়ে এসে 'রাম রাম' জানালো হরিহর। তামাক সাজলো হুকোয়। দুজনেই টানতে লাগলো। চামারদের মুখিয়া হরিহর লোক হিসেবে খুব একটা সুবিধের নয়। সব কিসানই ওকে দেখে থর থর কাঁপে।

হুকো টানতে টানতে ঝীংগুর বললো—'ফাগ-টাগ আজকাল আর হয়না বুঝি ? গান তো শুনতে পাই না।'

হরিহর—'ফাগ কি করে হবে ? পেটের ধান্ধায় সারাদিন খাটতে হয়। ছুটি কোথায় ? তা তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে ?'

ঝীংগুর—'কাটছে একরকম। সময় খারাপ হলে দিনগুলোও কষ্টেই কাটে। সারাদিন কলে খাটলে ঘরে উনুন জ্বলে। দিন তো এখন বন্ধুর। টাকা পয়সা রাখার আর জায়গা নেই। নাহলে এমন বড় বাড়ী বানায়। শুনেছি আরো অনেক ভেড়াও কিনেছে। এখন তো গৃহপ্রবেশের ধুমধাম চলছে। সাত গাঁয়ে সুপুরী যাবে শুনছি।'

হরিহর—'লছমী ঘরে এলে লোকের চোখে কোন পর্দা থাকেনা। যখন হাঁটে চেয়ে দেখো, মাটিতে যেন পা পড়ে না। কথা বলবে যেন গর্বে ফেটে পড়ছে।'

ঝীংগুর—'ফেটে পড়বেনা কেন? এ গাঁয়ে কে আছে ওর ধারে কাছে আসে। কিন্তু দোস্ত, ওর অন্যায়গুলো তো দেখছোনা। ভগবান অনেক দিলেও মাথা নুইয়ে চলতে হয়। ভাবতে নেই যে নিজের সমকক্ষ কেউ নেই। ওর কথাবার্তা শুনলে রাগে মুখচোখ জ্বলতে থাকে। কাল কা যোগী কিনা আজকের শেঠ। আমাদের ঘাড়ে পা রেখেই তো এগোচ্ছে। এই সেদিন লেংটি পরে ক্ষেতে কাক তাড়াতো আর আজ আসমানে বাতি জ্বালিয়েছে।'

হরিহর—'বলো। কিছু একটা করবো না কি?'

ঝীংগুর—'কি করবে। এই ভয়েই তো ও গরু মোষ পোষে না।'

হরিহর—'ভেড়া নেই?'

ঝীংগুর—'শুধু শুধু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে?'

হরিহর—'তাহলে তুমিই ঠিক করো।'

ঝীংগুর—'একটা বুদ্ধি তো বার করতেই হবে যাতে ওর এই বারফাট্টাই চিরদিনের মত ঘুচে যায়।'

এরপর ফিসফিসিয়ে কিছু কথাবার্তা চললো। ভালোয় ভালোয় যে ঈর্ষা, খারাপে খারাপে ঠিক সেই পরিমাণ প্রেম থাকে। এটা একটা রহস্য। বিদ্বান বিদ্বানকে সাধু অন্য সাধুকে আর কবি কবিকে দেখে জ্বলতে থাকে। একে অন্যের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিন্তু জুয়াড়ী জুয়াড়ীকে মাতাল মাতালকে আর চোর অন্য একটা চোরকে দেখে সহানুভূতি জানায়, সাহায্য করে। কোন পণ্ডিত আঁধারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে হাত ধরে তোলাতো দূরের কথা, অন্য আর এক পণ্ডিত আরো কয়েকটা লাথি মেরে চলে যাবে, ও যাতে উঠতে না পারে! কিন্তু কোন চোরের দুরাবস্থায় অন্য চোর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেই। সবাই খারাপদের ঘৃণা করে এইজন্য কারণ খারাপরা পরস্পরকে ভালবাসে। ভালোদের সারা সংসার প্রশংসা করে তাই নিজেদের ভেতর ওদের এই বিরোধ। চোরকে মেরে আর একটা চোর কি পাবে? ঘৃণা। বিদ্বানকে অপমান করে আর একটা বিদ্বান কি পাবে? যশ।

ঝীংগুর আর হরিহর শলাপরামর্শ করে নিল। ষড়যন্ত্রের ছকটা ঠিক করলো—পদ্ধতি, সময় আর ধাপগুলো। ঝীংগুর এতক্ষণে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে রওনা হোল—এবার কোথায় যাবে দুষমন!

পরের দিন কাজে যাওয়ার পথে ঝীংগুর বুদ্ধুর বাড়ী গেল। বুদ্ধু জিজ্ঞেস করলো—'কি, আজ কাজে যাবেনা ?'

ঝীংগুর—'হ্যাঁ, কাজেই তো যাচ্ছি। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। তুমি আমার বাছুরটাও তোমার ভেড়ার সাথে সাথে একটু চরিয়ো। বাঁধা থাকতে থাকতে ওটা বোধহয় মরেই যাবে। না খায় ঘাস, না পাতা, কে খাওয়াবে ?'

বুদ্ধু—'ভাই, আমিতো গরু মোষ রাখি না। তুমিতো চামারদের চেনই, সবকটা খুনী। ওই হরিহর আমার দুটো গরুকে মেরেছে। কি খাইয়েছিলো ব্যাটা কে জানে। সেই থেকে কান মলেছি আর কোনদিন গরু মোষ পালবো না। কিন্তু তোমার একটা মাত্র বাছুর, ওটার কে আর ক্ষতি করবে। যখন খুশী দিয়ে যেও।'

একথা বলে বুদ্ধু ঝীংগুরকে নিয়ে গৃহপ্রবেশের সমস্ত জিনিসপত্র দেখাতে লাগলো। ঘি, চিনি, ময়দা, তরকারী সব কিনে রেখেছে। কেবল সত্যনারায়ণের জন্যই যা দেরী। ঝীংগুরের চোখ বড় হয়ে গেলো। এসব কার ঘরে হওয়ার কথা ছিলো, আর কার ঘরে হচ্ছে।

কাজের পর ঘরে ফিরে ঝীংগুরের প্রথম কাজই হলো বুদ্ধুর বাড়ী বাছুরটা-টাকে পেঁছে দেওয়া। ওই রাতে বুদ্ধুর ওখানে সত্যনারায়ণের পাঠ হবে। ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। সারারাত ওদের অভ্যর্থনা আর বিদায় জানাতেই কাটলো। ভেড়া-গুলোর ওখানে যাওয়ার কোন ফুরসতই মেলেনি বুদ্ধুর।

সারারাত খাওয়া কিছু হয়নি, সকালে উঠে যখন ও খাবার খেতে যাবে তখন একটা লোক এসে খবর দিলো—'বুদ্ধু তুমি এখানে আর তোমার ভেড়া-গুলোর ওখানে বাছুরটা মরে পড়ে আছে। আচ্ছা লোক তো তুমি, ওর গলার দড়িটাও খোলেনি।'

কথাটা শুনে বুদ্ধুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ঝীংগুর ও খাওয়ার জন্য ওখানে বসে ছিলো। বললো—'হায়! হায়! আমার বাছুরটা! চলতো দেখি গিয়ে। আমিতো ওকে বাঁধিনি। ঘর থেকে এনে এখানে এমনি রেখে দিয়েছি। তুমি ওটাকে কখন বাঁধলে, বুদ্ধু ?'

বুদ্ধু—'ভগবান সাক্ষী, আমি কোন দড়িই ছুঁইনি। ওখান থেকে চলে আসার পর ভেড়াগুলোর ধারে কাছেও আর যাইনি।'

ঝীংগুর—'তুমি জানো না তো, কে জানবে ? তুমিই লাগিয়েছো, এখন মনে পড়ছে না।'

এক ব্রাহ্মণ—'তোমার ভেড়াগুলোর মধ্যেই তো মরেছে। সবাই বলবে বুদ্ধুর অসাবধানতায়ই বাছুরটা মরলো। দড়ি কে লাগিয়েছে সেটা বড় কথা নয়।'

হরিহর—'কাল রাতে এনাকে তো আমি বাঁধতে দেখেছি।'

বুদ্ধু—'আমাকে ?'

হরিহর—'তুমি বাছুরটা বাঁধোনি ? বাঁধার সময় লাঠিটা তোমার কাঁধের ওপর ছিলো।'

বুধু—'কি আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এসেছেন রে! কখন তুই আমাকে বাছুর বাঁধতে দেখেছিস্ ?'

হরিহর—'আরে ভাই, আমার ওপর রেগে কি লাভ ? তুমি যদি বলো বাঁধোনি, তাহলে তাই।'

ব্রাহ্মণ—'এর একটা বিহিত তো করতেই হবে। গো হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—এটা হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়।'

ঝীংগুর—'মহারাজ। ওতো কিছু জেনেশুনে করেনি।'

ব্রাহ্মণ—'তাতে কি ? যে ভাবেই মরুক, এটা হত্যাই। ব্যস্ !'

ঝীংগুর—'হ্যাঁ, ঠিকই। গরুকে এভাবে বাঁধা নিষ্ঠুর কাজ।'

ব্রাহ্মণ—'শাস্ত্রে এটাকে মহাপাপ বলে। গো হত্যা ব্রাহ্মণ হত্যার চেয়ে কিছু কম নয়।

ঝীংগুর—'হ্যাঁ, গরুর স্থান খুব উঁচুতে। সেজন্যই তো আমরা মানি। গরু মানেই মা। কিন্তু মহারাজ যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। এমন কিছু করুন যাতে এই বেচারাকে বিশেষ ঝামেলায় না পড়তে হয়।'

বুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো কি অনায়াসে এই হত্যার দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপানো হলো। ঝীংগুরের কূট চালাকিও বুধু বুঝতে পারলো। ও বাছুরকে বাঁধেনি—লক্ষবার এই কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবেনা। লোকে বলবে প্রায়-শ্চিত্ত থেকে বাঁচার জন্য ও এসব বলছে।

ওর প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ব্রাহ্মণ দেবতারও কিছু কল্যাণ হবে। এরকম সুযোগ ব্রাহ্মণের জীবনে খুব বেশী আসে না। ফলে বুধুকে যাবতীয় দোষের দোষী সাব্যস্ত করা হোলো। সমস্ত বিচার করে ব্রাহ্মণ ওর দণ্ড দিলেন: তিন মাস ভিক্ষে, সাতটা তীর্থস্থান যাত্রা, তারপর পাঁচশ ব্রাহ্মণ ভোজন করানো আর পাঁচটা গরু দান। শুনে বুধু পাথর। ওর কান্নাকাটি দেখে ভিক্ষে-দণ্ড মকুব করা হোলো দুমাস।এছাড়া আর কোন মকুবের চেষ্টা হোলনা। কেউ ওর হয়ে একটু দয়া প্রার্থনা করলো না, প্রতিবাদ জানানোরও কেউ নেই। বেচারীকে দণ্ড স্বীকার করতেই হলো।

ভগবানের নামে ভেড়াগুলো ছেড়ে দিলো বুধু। ছেলেমেয়েগুলো সব ছোট ছোট। একা একা এখন বউটাই বা কি করবে? বেচারী এখন গরীব; লোকের দুয়ারে দুয়ারে যায় মুখ লুকিয়ে ভিক্ষে চায়।

ভিক্ষে হয়তো মেলে, কিন্তু সাথে সাথে হজম করতে হয় অপমানজনক নানা-কথাও। সারাদিনে যা মেলে সন্ধেবেলা কোন গাছের নীচে বসে তা ফুটিয়ে নেয় বুধু। তারপর খেয়েদেয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই পরিশ্রমকে ও ভয় পায় না কারণ ভেড়া নিয়ে ওকে সারাদিনই ঘুরতে হতো। গাছের নিচেই শুতে হয় আর বাড়ীতে যে খাবার খেতো সেটাও যে আহামরি ছিলো তাও নয়, আসলে এই ভিক্ষে করাটাতেই ওর যত লজ্জা। বিশেষ করে যখন কোন নীচু জাতের লোক

ভিক্ষে দিয়ে কর্কশ ব্যঙ্গ করে বলে 'রুটি খাওয়ার ভালো রাস্তাই বের করেছো,' দুঃখে তখন ওর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কি করবে ?

দু মাস পরে বুদ্ধু ঘরে ফিরলো। চুল বড়ো বড়ো হয়ে গেছে, দুর্বল শরীর। দেখলে মনে হয় ষাট বছরের বুড়ো। তীর্থযাত্রার জন্য টাকার যোগাড় করতে হবে। কিন্তু মেষপালককে কোন্ মহাজন ধার দেবে ? ভেড়াতে কোন ভরসা আছে ? হঠাৎ কোন মড়ক লাগলো এক রাতেই সব সাবাড়। জ্যেষ্ঠ মাস। ভেড়া থেকে কোনরকম আমদানীর আশাও এসময় কম।

এক তেলের দোকানের মালিক রাজী হলো তাও টাকায় দু আনা সুদে। আট মাসে সুদটা আসলের সমান হয়ে যাবে। এই শর্তে রাজী হতে পারলোনা বুদ্ধু। এই দু মাসে ওর বহু ভেড়া চুরি হয়ে গেছে। ওর ছোটো ছোটো ছেলেরা যখন চরাতে নিয়ে যেতো গাঁয়ের লোকেরা মাঠে বা কুঁড়েতে দু একটাকে লুকিয়ে রেখে পরে জবাই করে মাংস খেয়েছে। ছোট ছোট ছেলেগুলো ধরতে পারেনি। পারলেও কি করবে ? কিছু করার ক্ষমতা তো ওদের ছিল না। সারা গাঁ তখন ওদের বিরুদ্ধে একজোট। একমাস বাদে ভেড়াতো অর্ধেকও থাকবে না। এ এক মস্ত সমস্যা। হত-বুদ্ধি বুদ্ধু এক কসাইকে ডেকে সমস্ত ভেড়া বিক্রী করে দিলো। হাতে পেলো পাঁচশ টাকা। এর থেকে দুশ টাকা নিয়ে তীর্থে গেলো বুদ্ধু। শেষ টাকাটা ব্রাহ্মণ-ভোজের জন্য রেখে গেছে।

বুদ্ধু যাওয়ার পরে চোর দুবার সিঁদ কাটলো ওর ঘরে। কিন্তু ভাগ্যের জোরে ওর পরিবারের লোক জেগে ওঠায় টাকাটা চোর নিতে পারে নি।

।। পাঁচ ।।

শ্রাবণ মাস। চারিদিক সবুজে সবুজ। ঝীংগুরের কোন বলদ নেই। তাই ওর জমিটা ও ভাগে চাষ করতে দিয়েছে। বুদ্ধুরও প্রায়শ্চিত্তের শেষপর্ব হয়েছে, সেই সাথে শেষ হয়েছে, ওর টাকা পয়সার গরম। এখন কারোর কাছেই কিছু নেই, না ঝীংগুরের না বুদ্ধুর। তাই কেউ কারো ওপর এখন রাগে না, রাগবার মতো নেইও কিছু এখন।

চটকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঝীংগুর এখন মাটি খোঁড়ার কাজ করছে। শহরে এক বিশাল ধর্মশালা তৈরী হবে। হাজার হাজার মজদুরী কাজ করছে। ঝীংগুরও আছে সাথে। সপ্তাহের শেষে পয়সা নিয়ে ঝীংগুর বাড়ী যায়। বাড়ীতে রাত কাটিয়েই পরের দিন সকালে ফিরে আসে কাজে।

কাজের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে বুদ্ধুও ওখানে আসে। ঠিকাদার ওকে দুর্বল দেখে শক্ত কাজ না দিয়ে যোগাড়ের কাজ দিলো। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মাটি ভরতে গিয়ে ঝীংগুরকে প্রথম দেখে বুদ্ধু। সাথে সাথে 'রাম রাম' বললো ঝীংগুরকে। ঝীংগুর মাটি তুলে ওর ঝুড়ি ভরে দিলো। বুদ্ধু ঝুড়িটা মাথায় তুলে নিলো। সারাদিন দুজনে চুপচাপ নিজের নিজের কাজ করলো।

সন্ধের সময় ঝীংগুর জিজ্ঞেস করলো—'কিছু রান্না করবে না ?'

বুধু—'না হলে খাব কি ?'

ঝীংগুর—'আমি তো এখন দিনে একবার খাই। রাতে ছাতু খেয়েই কাটিয়ে দিই। জল তো আছেই সাথে। এত ঝামেলা কে করে ?'

বুধু—'এখানে সেখানে লকড়ী পড়ে আছে। তুলে আনো না। আমি ঘর থেকে কিছু আটা নিয়ে এসেছি। ওখানেই ভাঙিয়েছি—শহরে গম ভাঙাতে অনেক খরচ। পাথরের ওপর সমান জায়গাটায় আটাটা মেখে নেবো। তুমি তো আমার রান্না খাবে না। আমি রুটি বেলে দিচ্ছি, তুমি সেঁকে নাও।'

ঝীংগুর—'কোন চাটুও তো নেই যার ওপর করবো।'

বুধু—'আরে আছে, অনেক আছে। ওই চুণ স্বরকি মেশানোর কড়াইগুলো আছে না। ওর একটা নিয়ে আসছি।'

উনুন জ্বললো। আটা মাখা হোলো। রুটি বানালো ঝীংগুর। বুধু গিয়ে জল নিয়ে আসলো। দুজনে রুটি খেলো নুন লঙ্কা দিয়ে। তারপর তামাক সাজলো। পাথুরে জমিতে শুয়ে দুজনেই হুকা টানতে লাগলো।

বুধু বললো—'তোমার আখের ক্ষেতে আমিই আগুন লাগিয়েছিলাম।'

ঝীংগুর উদাস ভাবে বললো—'জানি।'

কিছুক্ষণ বাদে ঝীংগুর বললো—'জানো বাছুরটা আমিই বেঁধেছিলাম। হরিহর ওটাকে কিছু খাইয়েছিলো।'

একই রকম উদাস স্বরে বুধু উত্তর দিলো—'জানি।'

তারপর দুজনে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

নেউর

আকাশ জুড়ে রুপোর পাহাড়ের চলাচল। কখনো ধাক্কা খেয়ে সেটা টুকরো টুকরো হচ্ছে, কখনো আবার জোড়া লাগছে। যেন সূর্য আর মেঘের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এই ছায়া, এই আলোর ঝলকানি। বর্ষাকাল। বেশ গুমোট। হাওয়াও বন্ধ।

গাঁয়ের বাইরে কিছু মজুর ক্ষেতের ধারে আল বাঁধছিলো। খালি গা, ঘামে জবজবে ভিজে শরীর, খাটো ধুতি নেংটির মতো পরা, সবাই কোদাল দিয়ে মাটি তুলে আলের ধারটা মাটি দিয়ে উঁচু করছিলো। বর্ষার জলে মাটি এখন নরম।

গোবর নিজের কানা চোখটা নাচিয়ে বললো—'হাত যে আর চলছেনা ভাই। গোণার আওয়াজও হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। চলো, দুটো খেয়ে নিই।'

নেউর হেসে বললো—'আলটা পুরো করে নে, তারপর বসে বসে চিবোস। আমিতো তোদের আগে থেকেই কাজে লেগেছি।'

ঝুড়িটা মাথায় ওঠাতে ওঠাতে দীনা বললো—'জোয়ান বয়সে তোমরা যা ঘি খেয়েছো নেউরদা, অতোটা জলও তো এখন আমাদের জোটেনা।'

নেউর ছোটখাটো গড়নের, মজবুত, কালো আর চটপটে মানুষ। পঞ্চাশের ওপরে বয়েস। কিন্তু আচ্ছা-আচ্ছা স্বাস্থ্যবান যুবকও ওর সমান খাটতে পারেনা। দু তিন বছর আগে পর্যন্তও ও কুস্তি লড়তো। গাইটা মারা যাবার পর কুস্তি ছেড়ে দিয়েছে।

গোবর—'তামাক-টামাক না টেনে কিভাবে যে তুমি থাকো, নেউরদাদা? রুটি না পেলেও চলে, কিন্তু তামাক ছাড়া কিছুতেই থাকতে পারবোনা।'

দীনা—'দাদা, ফিরে গিয়ে রুটি বানাবে? বুড়ীয়া কিছু করেনা? বুঝলে দাদা, এরকম বৌয়ের সাথে আমার একদিনও বনবেনা।'

নেউরের ভাঁজপড়া, অবিন্যস্ত গোঁফওয়ালা মুখটায় হাসি ঝিলিক খেলে গেলো। তাতে ওর কুশ্রী মুখটাও সুন্দর হয়ে উঠলো। বললো—'জোয়ান বয়েসটাই তো ওর সাথে কাটিয়ে দিলাম রে ব্যাটা। এখন যদি ওকে দিয়ে কোন কাজ না হয়, তো কি করা যাবে, বল।'

গোবর—'তুমি ওকে মাথায় তুলে রেখে দিয়েছো, নইলে কাজ করবে নাই বা কেন। মজাশে খাটিয়ায় বসে তামাক টানবে আর সারা গাঁয়ের লোকের সাথে ঝগড়া করে বেড়াবে। তুমি বুড়ো হয়ে গেলে—আর ও কেমন ছুড়ীই রয়ে গেলো।'

দীনা—'ছুকড়ীরাও ওর কাছে হার মানবে ! টিকলী, কাজল, মেহেদী এসবেই ওর মন পড়ে থাকে। বিনা পাড় রঙীন শাড়ি ছাড়া কখনো ওকে দেখিনি। গয়নায়-তো ওর মন ভরেনা। তুমি হাবাগোবা তাই পার পেয়ে যাচ্ছে, না হলে চড়-চাপটা, গালি-গালাজই ওর কপালে জুটতো।'

গোবর—'ওর সাজগোজ দেখে আমার তো গা জ্বলতে থাকে। কোন কাজ কাম করবেনা। আবার খাওয়া পরার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালটা চাই ওনার।'

নেউর—'তোরা আর কতটা জানিস ব্যাটা। ও যখন এসেছিলো আমার তখন সাত হাল দেওয়ার মতো জমি। রাণীর মতো বসে থাকতো ও। সময় বদলে গেছে তো কি, ওর মনটা বদলায় নি। কিছুক্ষণ উনুনের সামনে বসে থাকলে ওর চোখ লাল হয়ে যায়, মাথা দপদপ করতে থাকে,—অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। আমি সেসব সহ্য করতে পারিনা। বল্ দিন-রাতের জন্যই তো লোকে বিয়ে-সাদী করে, নয়তো এসব ঝামেলায় কে যায়। এখান থেকে গিয়ে রুটি বানাবো, জল তুলবো, তবে তো ও কিছু খাবে। নইলে আমার আর কি ছিলো, তোদের মতোই চারটি গোগ্রাসে গিলে এক লোটা জল খেয়ে নিতাম। মেয়েটা মারা যাবার পর থেকে ওতো আরও উদাস হয়ে গেলো। বড় ভারী ধাক্কা খেয়েছে ও। মা'র মমতা আমি তুই কি বুঝবো রে ব্যাটা। প্রথম প্রথম কখনো সখনো ওকে ধমক-ধামক দিতাম। এখন আর কোন মুখে ধমকাবো ?'

দীনা—'কাল দেখলাম গাছে চড়েছিলে—কি ব্যাপার? এখন কি তুমুর পেকেছে নাকি ?'

নেউর—'ওই ছাগলটার জন্য পাতা পাড়ছিলাম। মেয়েটাকে দুধ খাওয়াবো বলে কিনেছিলাম। বয়েস হয়ে গেলেও এখনও অল্পসল্প দুধ দেয়। বুড়ীয়া তো রুটি আর ওটার দুধ খেয়েই বেঁচে আছে।'

ঘরে পেঁছে নেউর লোটা আর কুয়োর দড়িটা নিয়ে স্নান করতে যাবে এমন সময় স্ত্রী খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে বললো—'তুমি সবসময় এতো দেরী করে আসো কেন বলতো ? অন্য লোকেরা কাজের জন্যে কি এরকম মনপ্রাণ ঢেলে দেয় ? মজুরী যখন সবাই সমানই পায়, তখন তুমি শুধু শুধু কাজের পেছনে ছুটে মরছো কেন ?'

নেউরের মনের ভেতরটা গলে গিয়ে মমতার এক দীঘি হয়ে গেলো। স্ত্রীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নিবেদিত ভালোবাসায় 'আমি' শব্দের ছিটেফোঁটাও নেই। কি অপার স্নেহ ! ওর আরাম স্বাচ্ছন্দ্য, মরা-বাঁচার চিন্তা আর কেই বা এভাবে করে ? সেই বা নিজের বুড়ীয়ার জন্যে মরবেনা কেন ? বললো—'আর জন্মে তুই কোন দেবী ছিলি বুড়ীয়া, সত্যি বলছি।'

'আচ্ছা, রাখো তোমার ঐ সোহাগপনা। আমি ছাড়া কেউ বসে আছে নাকি ! কাকে শোনানোর জন্যে এরকম কথাবার্তা বলছো ?'

খুশী মনে নেউর স্নান করতে গেলো। ফিরে এসে রুটি বানালো মোটা

মোটা। আলু ঢেলে দিলো উনুনে। আলুর ভরতা বানালো। তারপর বুধিয়া আর সে খেতে বসে গেলো একসাথে।

বুধিয়া—'আমাকে বিয়ে করেতো তোমার সুখ মিললোনা। বসে বসে খাই আর তোমার সাথে ঝগড়া করি। ভালো হয়, ভগবান যদি আমাকে টেনে নেয়।'

'ভগবান এলে বলবো আগে আমাকে নিয়ে চলো নয়তো এই খাঁ খাঁ ঝুপড়িতে কে থাকবে?'

'তুমি না থাকলে আমার কি দশা হবে, এই ভাবলে আমার সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। বড়ো পুণ্যি করেছি তাই তোমাকে পেয়েছি। অন্য কারোর সাথে ভালো থাকবো কি করে?'

এমনি মিঠে আনন্দের জন্য নেউর করতে পারেনা এহেন কাজ নেই। অলস, লোভী, স্বার্থপর বুধিয়া জিভের ডগায় এসব মিঠে কথার জাল বুনে নেউরকে নাচায়, ঠিক যেভাবে মাছ-শিকারী ছিপের ডগায় টোপ ঝুলিয়ে খেলায় মাছকে।

আগে কে মরবে এই বিষয়ের ওপর এই প্রথমবারই কথাবার্তা হচ্ছেনা। এর আগেও বহুবার এই প্রশ্ন উঠেছে আর আলোচনা শেষ হয়েছে এখানে এসে। না জানি কেন নেউর সিদ্ধান্তে আসতো, সেই নিশ্চয়ই প্রথম যাবে। তারপর বুধিয়া যতদিন বাঁচবে ততদিন বুড়ী যেন আরামে থাকে, কারোর কাছে হাত না পাতে, এইজন্যেই তো ও খেটে মরছে, যাতে মরার আগে চার পয়সা রেখে যেতে পারে। কঠিন কঠিন কাজ যা কেউ করতে পারেনা, নেউর করে। দিনভর কোদাল নিড়া-নির কাজ করবার পর আখের সময় রাতে আখ পেষাই কাজ করে বা আখ ক্ষেত পাহারা দেয়। কিন্তু এই সুন্দর দিনগুলো জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আর যা পয়সা ও রোজগার করছে সেগুলোও কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। বুধিয়াকে ছাড়া ওই জীবন···না, না, এসব ও কল্পনাও করতে পারছেনা।

কিন্তু বউয়ের কথাবার্তা নেউরকে আজ ভয় পাইয়ে দিলো। জলের ভেতর এক ফোঁটা রং যেমন গুলে ছড়িয়ে যায়, এই ভয়টাও ওর মনের ভেতর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যেতে লাগলো শেকড়বাকড় মেলে।

গাঁয়ে নেউরের জন্য কাজের কমতি ছিলোনা। এতোদিন যা মজুরী পেতো, এখনো তাই পায়। কিন্তু এই মন্দার বাজারে ঐ মজুরীও রইলোনা। এসময় হঠাৎ করে কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে গাঁয়ে এক সাধু এসে হাজির। আর এসে ধুনি জ্বাললো নেউরের ঘরের ঠিক সামনের পিপুল গাছটার ছায়ায়। গাঁয়ের লোক এটাকে ভাগ্যের লক্ষণ হিসাবে দেখলো। বাবাজীর সেবা ধর্ম করার জন্য সবাই জমায়েত হোলো। কোথা থেকে যেন লকড়ী এসে গেলো, বিছানার জন্যে কম্বল এলো, খাবারের আটা-ডালও এসে গেলো। নেউরের কাছে এসব না থাকায় বাবাজীর ভোজনের রান্না করার দায়িত্ব নিলো ও। চরস এলো—দম দেওয়া শুরু করলেন বাবা।

দু-তিন দিনেই বাবাজীর নাম ছড়িয়ে পড়লো। কি আত্মদর্শী বাবা, ভক্ত

ভবিষ্যত সব বলে দিতে পারেন। পার্থিব জগৎ সম্বন্ধে কি উদাসীন। হাতে পয়সা ছোঁননা। আর খাওয়া দাওয়াও কিই বা করেন। সারাদিনে এক দু বাটি খাবার খান। কিন্তু মুখের কি দীপ্তি। আর কথাবার্তাও কি মিষ্টি। সরলমনা নেউর বাবাজীর সবচেয়ে বড় ভক্ত বনে গেলো। ক্রমে যদি ওর ওপর বাবাজীর কিছু কৃপা হয়, তবে তো ওর সিদ্ধি এসে যাবে। আর মিটবে ওর সমস্ত দুঃখ-ভাবনা।

ভক্তেরা সব একে একে চলে গেছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে জবর। শুধু নেউর বসে বসে বাবাজীর পা টিপছিলো।

বাবাজী বললো—'বৎস ! এ সংসার মায়া, এখানে আটকে আছিস কেন ?'

নেউর মাথা নীচু করে বললো—'আমার তো এসব জ্ঞান নেই মহারাজ, কি করবো ? ঘরে বৌ আছে, ওকে কে দেখবে ?'

'তুই ভাবছিস তুই স্ত্রীকে পালন করছিস ?'

'আর কে ওকে দেখবে, বাবাজী ?'

'তাহলে ঈশ্বর কেউ নয়, তুই-ই সব ?'

নেউরের মনে নতুন এক জ্ঞানের উদয় হোলো। তুই এতো অহংকারী হয়েছিস ? তোর দেমাক এতো বেড়েছে ? খেটে খেটে তোর জান যায় বলে তুই কিনা বুঝে গেলি, তুই-ই দুনিয়ার সবকিছু ! সারা সংসারকে দেখাশুনো করছে যে প্রভু, তুই তার কাজে দখল বসাতে চাস্। এই সরল গ্রামীণ হৃদয়ে নয়া বিশ্বাসের শব্দগুলো নিজেকে ধিক্কার জানাতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নেউর বললো—'আমি কিছু জানিনা, মহারাজ।'

এর বেশী কিছুও বলতে পারলোনা। গভীর বিষাদে দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো।

বেশ তেজের সংগে বাবাজী বললেন—'ঈশ্বরের লীলা দেখতে চাস। ইচ্ছে করলে তিনি এই মুহূর্তেই তোকে লাখপতি করে দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তেই তোর সমস্ত ভাবনা কেড়ে নিতে পারেন। আমি তো ওঁর এক তুচ্ছ ভক্ত, কাকবিষ্ঠা। কিন্তু আমার ভেতরেও এমন শক্তি আছে যা দিয়ে তোকে সিদ্ধপুরুষ বানিয়ে দিতে পারি। তোর ভেতরটা সাফ, সাচ্চা। লোক হিসেবেও তুই সৎ। তোকে আমার ভালো লেগেছে। এই গাঁয়ের সবাইকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। কারোর ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই। তোর ভেতরেই ভক্তের হৃদয় আছে। আচ্ছা, তোর কাছে রূপোর টাকা আছে ?'

নেউরের মনে হচ্ছে ও স্বর্গের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

'পাঁচ-দশ টাকা হবে হয়তো মহারাজ !'

'রূপোর কোনো ভাঙাচোরা গয়না নেই ?'

'বউয়ের কাছে কিছু আছে।'

'যা রূপো পাস্ তা নিয়ে কাল রাতে এখানে চলে আয় আর ঈশ্বরের মহান

শক্তি দেখে যাস্। তোর সামনে রুপোগুলো হাড়িতে ভরে ধুনীর আগুনে রেখে দেবো। ভোরবেলা এসে হাড়িটা বের করে নিবি, পাবি সোনা। কিন্তু বাছা ঐ সোনা মদ খেয়ে, জুয়া খেলে বা অন্য কোন খারাপ কাজে-কর্মে যদি খরচ করিস, তোর কিন্তু কুষ্ঠ হয়ে যাবে। এখন যা, গিয়ে শুয়ে পড়্। হ্যাঁ, আর একটা কথা মনে রাখিস্, এসব কথা কারোর সঙ্গেই আলোচনা করবিনা, এমনকি বউয়ের সাথেও না।'

নেউর ঘরের দিকে রওনা হোলো। খুশি আর ধরে না বুঝি ভগবানের হাত ওর মাথার ওপরে। রাতে ও ঘুমোতে পারলোনা। সকালে উঠে কারোর কাছ থেকে দুটাকা, কারোর কাছ থেকে চার টাকা ধার নিয়ে ওর পঞ্চাশ টাকা হোলো। লোকে ওকে বিশ্বাস করে। কাউকে এক পয়সাও ঠকায়নি। কথা একদম পাক্কা, যা বলে তাই করে। টাকা তো সহজেই মিললো। পঁচিশ টাকা ওর কাছেই ছিলো। কিন্তু বুধিয়ার গয়না? সেটা কি করে নেবে? একটা বুদ্ধি বার করলো। 'তোর গয়নাগুলো ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে। টক জলে সাফাই করতে হবে। সারা-রাত টকজলে থাকলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।' বুধিয়া এই ভাওতায় ধরা পড়লো। হাড়ি থেকে তেঁতুল বার করে টকজলে গয়না ভিজিয়ে দিলো। বুধিয়া রাতে শুয়ে পড়লে, নেউর ঐ হাড়িতেই টাকা ঢেলে বাবাজীর কাছে নিয়ে গেলো। কিছু মন্ত্র পড়লো বাবাজী। ধুনীর ছাইয়ে হাড়িটা বসিয়ে নেউরকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলো।

রাতভর ছটফট করার পর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই নেউর ছুটলো বাবাজীর কাছে। কিন্তু কোথায় বাবাজী! ও পাগলের মত ধুনীর আগুনের ছাইয়ে আঙুল ও হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলো হাড়িটা। হাড়ি নেই। ধক্ করে উঠলো বুকটা। খ্যাপার মতো চারধারে বাবাজীকে খুঁজলো। বাজারের দিকে যেতে চাইলো, পৌঁছলো গিয়ে পুকুরের ধারে। দশ মিনিট, বিশ মিনিট, আধ ঘন্টা। বাবার কোন চিহ্ন নেই। ভক্তরা আসতে সুরু করেছে। বাবা কোথায়? কম্বল নেই, পাত্র টাত্র কিছু নেই।

একজন ভক্ত বললো—'এইসব সাধুদের কোন ঠিকানা থাকে! আজ এখানে, কাল সেখানে। এক জায়গারই যদি থাকবে, তবে সাধু কেন? লোকজনের সংগে আত্মীয়তা হয়ে যাবে, বাঁধা পড়ে যাবে।'

'সিদ্ধপুরুষ ছিলো।'

'কোন জিনিসের ওপর লোভ নেই।'

'নেউর কোথায়? ও তো বাবাজীর খুব পেয়ারের ছিলো। ওকে হয়তো বলে গেছে।'

নেউরের খোঁজখবর শুরু হোলো, কিন্তু পাওয়া গেলনা কোথাও। ইতিমধ্যে নেউরকে ডাকতে বুধিয়া ঘর থেকে বেরিয়েছে। আবার চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হোলো। বুধিয়া কাঁদতে কাঁদতে নেউরকে গালাগাল দিতে থাকলো।

নেউর তখন ক্ষেতের ধানের উপর দিয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়চ্ছে যেন এই পাপে ভরা সংসার থেকে ও ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

একজন বললো—'নেউর কাল আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় দেবে বলেছে।'

আর একজন—'আমার থেকেও তো আজ ফেরত দেবে বলে দুটাকা নিয়েছে।'

বুধিয়া কাঁদলো—'ঐ নিষ্কর্মাটা আমার সব গয়না নিয়ে গেছে। পঁচিশ টাকা রেখেছিলাম, সেটাও নিয়ে গেছে।'

লোকে বুঝলো বাবা আসলে এক ঠগ। নেউরকে পথে বসিয়েছে। সংসারে এতসব ঠগও থাকে। নেউরের ওপর কারো কোন সন্দেহ হয়নি। বেচারা সোজা-সাপ্টা মানুষ, চোট খেয়ে গেছে। লজ্জায় কোথায় লুকিয়ে আছে।

॥ তিন ॥

তারপর তিন মাস কেটে গেলো।

ঝাঁসী জেলায় ধসান নদীর পারে ছোটো এক গাঁয়ের নাম কাশীপুর। নদীর পারেই এক পাহাড়ী টিলা। ওর ওপর আজ কদিন হোলো এক সাধু এসে নিজের আসন গেড়েছে। ছোটোখাটো গড়নের মানুষ। গায়ের রং কালো, মজবুত শরীর। এই সেই নেউর, সাধু বেশে দুনিয়াকে আজ ধোঁকা দিচ্ছে—এই সেই সরল, দিল-খোলা নেউর যে পরের জিনিষের দিকে কোনদিন কখনো তাকায়নি, নিজের পরিশ্রমে পাওয়া রুটিতেই যে বরাবর সন্তুষ্ট ছিলো ; যে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতোনা নিজের ঘর, গাঁ আর বুধিয়াকে। এই জীবনে হয়তো আবার আসবে সেই সব দিন, যখন ও ঘরে ফিরে সংসারের উচ্ছলতা, ছোট ছোট ভাবনা, ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষায় মশগুল থাকবে। কি সুখের ছিলো তার জীবন। সবাই ছিলো আপন, সবাই আদর যত্ন করতো, সহানুভূতি জানাতো। সারাদিন খেটে অল্প কিছু আনাজ আর দু'চার পয়সা নিয়ে যখন সে ঘরে ফিরতো, কি গভীর মমতায় বুধিয়া তাকে স্বাগত জানাতো। সারাদিনের খাটুনি, ক্লান্তি আরও মিঠে হতো ওর এই মিষ্টি আপ্যায়ণে। হায়রে, সেসব দিন আবার কবে আসবে ? না জানি বুধিয়া এখন কেমন আছে। কে ওর দেখাশোনা করছে ? কে ওকে রান্না করে খাওয়াবে ! ঘরে পয়সাও সে রেখে আসেনি, গয়নাও সব গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই রাগ আবার ওকে পেয়ে বসে—যদি ঐ বাবাকে পাই তো কাঁচা গিলে ফেলবো। হায়রে লোভ !

নেউরের অসংখ্য ভক্তের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতীও আছে, যার স্বামী মেয়েটাকে ত্যাগ করেছে। ওর বাপ একজন ফৌজী পেনশনভোগী। একজন লেখা-পড়া জানা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ছেলেটা মার শাসনে জুজু আর শাশুড়ীর সাথে এই মেয়ের একদম বনতোনা। মেয়েটা চাইতো আলাদা সংসার করতে কিন্তু স্বামী ওর মাকে ছাড়া থাকতে রাজী নয়। রেগেমেগে বউ বাপের বাড়ী চলে এসেছে। সেই থেকে এই তিন বছরে শ্বশুর বাড়ী থেকে

কোন লোক আসেনি নিয়ে যেতে, ওর স্বামীও কোনদিন আসেনি। যে কোন ভাবে স্বামীকে বশে আনতে চায় এই যুবতী। এইসব মহাত্মার পক্ষে লোকের মনকে ঘুরিয়ে দেওয়া কোন ব্যাপারই নয়। হ্যাঁ, ওঁর কৃপা চাই।

একদিন একান্তে বাবাজীকে নিজের বৃত্তান্ত সব শোনালো যুবতীটি। নেউর যে শিকারের ধান্দায় ঘুরছিলো সেটা আজ মিলে গেল মনে হচ্ছে। গম্ভীর ভাবে বললো —'বেটী আমি সিদ্ধ নই, মহাত্মাও নই, সংসারের ঝামেলাতেও আমি নেই, তোর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা দেখে তোর ওপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। ভগবান চাইলে তোর মনের ইচ্ছে পূরণ হবে।'

'আপনিই এটা করতে পারেন, আপনার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস।'

'ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।'

'ইচ্ছে করলে এই অভাগিনীর ডিঙ্গিটা আপনিই তীরে নিয়ে যেতে পারেন।'

'ভগবানের উপর ভরসা রাখো।'

'আমার ভগবান তো আপনিই।'

নেউর যেন ধর্মের ব্যাপারে দ্বিধায় পড়েছে এমন ভান করে বললো—'লেকিন বেটী, এর জন্যে তো বড়ো অনুষ্ঠান করতে হবে, আর ঐ অনুষ্ঠানে শয়ে-হাজারে খরচ হবে। তারপরেও তোর কাজ সিদ্ধ হবে কিনা বলতে পারছিনা। হ্যাঁ, আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, তাই করবো। তারপর সবকিছু ভগবানের হাতে। আমি ওসব টাকাকড়ির মায়াতে হাত ছোঁয়াইনা, কিন্তু তোর দুঃখও যে সইতে পারছিনারে বেটী।'

ঐ রাতে যুবতীটি নিজের সোনার গয়নার বাক্স নিয়ে এসে বাবাজীর চরণে রেখে দিলো। কাঁপতে থাকে মেয়েটি। ডালা খুলে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় গয়নাগুলোকে ঝকমক করতে দেখলো বাবাজী। চোখে ধাঁধা লেগে গেলো। এখন এই সমস্তই ওর। হাতজোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে যুবতীটি—'দয়া করে রাখুন!'—বাক্সটা নিয়ে মাটিতে রেখে তারপর আশীর্বাদ জানিয়ে যুবতীকে বিদায় দেওয়া ছাড়া বাবাজীর এখন আর বিশেষ কিছু করার নেই। ভোরবেলায় মেয়েটি আসবে। এর ভেতর পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূরে সে সরে পড়বে। আহা! কি আশাতীত সৌভাগ্য! টাকা ভর্তি থলিটা নিয়ে গাঁয়ে পৌছে সে যখন বুধিয়ার সামনে রাখবে। ওহো! এর চেয়ে বেশী আনন্দ ও কিছুতেই কল্পনা করতে পারেনা।

কিন্তু কেন জানি ওই সামান্য কাজটুকুও সে করতে পারছেনা। বাক্সটা তুলে নিয়ে কম্বলের নিচে ঢোকানো সেটাও পারছেনা। কোন ব্যাপারই নয়,—তবু ওর কাছে কেমন অসম্ভব, অসাধ্য হয়ে উঠছে। ওই বাক্সটার দিকে ও হাতও বাড়াতে পারছেনা। হাতের ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ঠিক আছে, হাত না হয় বাদ দেওয়া গেলো, কিন্তু মুখে তো কিছু বলতে পারে। এটা বলতে কি এমন দুনিয়া উল্টে যাবে যে, বেটী, ওটা তুলে আমার কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে দে। ওর

জিভ এতে খসে পড়বেনা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কোন কথা বলাও ওর পক্ষে অসম্ভব। চোখের ইশারায় কাজটা হতে পারে, কিন্তু এ সময় চোখ দুটোও কেমন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এতো সব মন্ত্রী, সাঙ্গোপাঙ্গো থাকা সত্বেও মনের রাজা দুর্বল, পঙ্গু। লাখ টাকার থলির প্রলোভনে উম্মুক্ত তরবারি হাতে কী দঁাড়িতে বাঁধা গোরুর গলায় কোপ বসিয়ে দেয়া যায়? না পারা যায় না। কখনো নয়। কেউ যদি তাতে ওর মুণ্ডু কেটে নেয় তাও সম্ভব নয়। ও গোহত্যা করতে পারবে না। এই পরিত্যক্তা যুবতীকে ঐ গোরুর মতোই মনে হোলো তার। যে সুযোগের খোঁজে ও তিনমাস ঘুরে বেড়িয়েছে সেটা হাতে পেয়েও ওর আত্মা কাঁপতে থাকলো। জঙ্গলের বুনো জন্তুর শিকার করাই নেশা, কিন্তু বাঁধা থাকতে থাকতে তার নখ পড়ে গেছে, দাঁত কমজোরী হয়ে গেছে।

কাঁদতে কাঁদতে বললো—'বেটী, বাক্সটা তুলে নিয়ে যা। আমি তোকে পরীক্ষা করছিলাম। তোর মনোবাসনা পূর্ণ হবে।'

নদীর অন্যপারে চাঁদ তখন গাছগুলোর পেছনে বিশ্রাম করছে। নেউর আস্তে আস্তে উঠে ধসান নদীতে স্নান করলো তারপর তার যাত্রা শুরু করলো। ওইসব ধুনীর ছাই আর চন্দনের তিলকের ওপর তখন ওর ঘেন্না ধরে গেছে। আশ্চর্য হলো ঘর ছেড়ে কেন বেরুলো ও? ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে সেই ভয়েই। না! মনে মনে ও এক বিচিত্র উল্লাস অনুভব করলো, সে এখন সব সংকোচের বাঁধন থেকে মুক্ত। এ এক বিশাল জয়।

।। চার ।।

আট দিনের মাথায় নেউর গাঁয়ে পেঁাছলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়ে ওর সামনে এসে, নেচে লাফিয়ে ওর হাতের লাঠিটা হাত থেকে নিয়ে নেউরকে স্বাগত জানালো।

একটা ছেলে বললো—'কাকীতো মরে গেছে দাদা!'

নেউরের পা জমে গেলো। মুখের দু'ধার ঝুলে পড়লো নিচে। বিষাদভরা চোখ দুটো কেঁপে উঠলো। কিছু বললোনা, কিছু জিজ্ঞেস করলোনা। কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো; তারপর পাগলের মতো দৌড়লো নিজের ঘরের দিকে। ছেলেগুলোও দৌড়লো ওর পেছন পেছন। কিন্তু ওদের ছেলেমানুষী আর চঞ্চলতা এখন কোথায় পালিয়ে গেছে।

ঝুপড়ির দরজা হা করে খোলা। বুধিয়ার খাটিয়াটা যেখানে থাকতো সেখানেই পড়ে আছে। পড়ে আছে ওর তামাক খাওয়ার জিনিষপত্র। এক কোণে কিছু মাটির আর পিতলের বাসন পড়ে রয়েছে। ছেলেগুলো বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝুপড়ির ভেতরে ঢুকবে কি করে। ওখানে যে বুধিয়া বসে।

গাঁয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। নেউরদা ফিরে এসেছে। দরজায় বেশ ভীড় জমে গেলো, প্রশ্নের পর প্রশ্ন—'দাদা, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? তুমি যাওয়ার তিন

দিনের মাথায় কাকী মরলো। রাতদিন তোমাকে গালাগাল দিয়েছে। মরতে মরতে ও তোমাকে অভিশাপ দিয়ে গেছে। তারপর তিন দিনের মাথায় মারা গেলো। কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন, দাদা?'

কোন জবাব দিলোনা নেউর। নিরাশ করুণ চোখে সবাইকে দেখতে লাগলো, যেন ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে কেউ। সেদিন থেকে নেউরকে কেউ কথা বলতে, হাসতে বা কাঁদতে দেখেনি।

গাঁয়ের আধ মাইলের ভেতর পাকা সড়ক। লোকজনের যাতায়াতও খুব সেখানে। নেউর খুব ভোরে উঠে সেখানে গিয়ে সড়কের ধারে একটা গাছের নিচে বসে পড়ে। কারো কাছেই কিছু চায়না। কিন্তু পথিকেরা কিছু না কিছু দেয়ই—আনাজ, আটা, পয়সা। সন্ধ্যায় নিজের ঝুপড়িতে ফিরে আসে, বাতি জ্বালায়, রাতের খাবার বানায়, খায়, তারপর ঐ খাটিয়াতেই পড়ে থাকে। ওর জীবনের যে একটা চালিকাশক্তি ছিলো, সেটা এখন নেই। শুধু কোনমতে ও টিকে আছে। মানবতা কি গভীর! গাঁয়ে প্লেগের মড়ক লাগলো; ঘরদোর ছেড়ে লোকে পালাতে লাগলো। নেউরের কথা তখন আর কারো মাথাতেই নেই। কেউ ওকে ভয়ও করেনা, ভালওবাসেনা। সারা গাঁয়ের লোক ভেগে পড়লেও নেউর কিন্তু নিজের ঝুপড়ি ছাড়েনি। এরপর হোলী এলো। সবাই খুশিতে মেতে উঠলো, তখনোও নেউর নিজের ঘরের বাইরে এলোনা। আজও নেউর ওই গাছের নিচে, সড়কের ধারে, ওইরকম মৌন চুপচাপ, নির্জীব হয়ে বসে আছে।*

অনুবাদঃ **প্রদীপ গোস্বামী**

*এই গল্পের উর্দু ভাষান্তরে প্রেমচন্দ শেষ অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে এই বাক্যটি দিয়ে গল্পের শেষ করেছিলেন: 'কিন্তু সে তার কাজকর্ম আগের মতোই ঠিকঠাক মতই করে, মজুরী হিসেবে শুধু কয়েকটা রুটি নেয়'।

শেষ পুরস্কার

দুখী চামার তার দাওয়ার কাছটা ঝাঁট দিচ্ছে আর ওর বউ ঝুরিয়া গোবর দিয়ে মেঝে লেপছিল। কাজের ফাঁকে দু'জন একটু দম ফেলার সুযোগ পেতেই ঝুরিয়া বলে, 'ঠাকুরের জন্যে খরচ করতে হবে না ? এখনই না গেলে, কে জানে, আর কোথায় চলে যাবে।' দুখী বলে, 'হ্যাঁ যাই। লেকিন লোকটা এলে কোথায় বসতে দিই বলতো ? 'কোথাও কি একটা খাটিয়া মিলবে না ? গাঁয়ের মোড়ল গিন্নীর কাছ থেকে একটা চেয়ে আনা যায় না ?'

'মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলিস, পিত্তি জ্বলে যায়; মোড়লবাড়ির লোকেরা আমায় খাটিয়া দেবে ? বলে চুলা জ্বালাবার জন্য একটুকরো কয়লা চাইলে দেয় না, আর তুই ভাবছিস ওরা আমায় খাটিয়া দেবে। আমরা ওদের বাড়ি যাই, কথাবার্তা বলি, তাও একলোটা জল চাইলে পাবো না। আর ওরা দেবে খাটিয়া ? খাটিয়াতো আর তোর গোবর, ঘুঁটে বা লকড়ি নয়—দরকার হল যার যা খুশী নিয়ে গেল। তুই বরং আমাদের খাটিয়াটাই ধো। গরমের দিন, আমি ওকে নিয়ে আসার আগেই ঠিক শুকিয়ে যাবে।'

ঝুরিয়া বলে, 'আমাদের খাটিয়ায় বসবেন না উনি। যা গোঁড়া, নিয়মকানুন খুব মানে ঠাকুর।'

দুখী একটু ভাবে; তারপর বলে, 'তা বটে। তবে চ' মহুয়ার পাতা দিয়ে ওর জন্য একটা চাটাই বানিয়ে ফেলি, সেই ভালো হবে। মহুয়ার পাতা খুব পবিত্র, শুনেছি বড় বড় লোকেরাও নাকি ওতে খায়। তুই লাঠিটা দে, কটা ডাল ভেঙে আনি।' 'চাটাই আমি বানিয়ে নেবো'খন, তুমি বাপু ওর কাছে যাও। আচ্ছা, ওকে তো কিছু আনাজ ও দক্ষিণা দিতে হবে ? আমার থালাতে সাজিয়ে দেবো-খন'—'বলিস কি, ওতে সব্বোনাশ হবে। তুই যদি ওতে দিস সব দক্ষিণা বর-বাদ হয়ে যাবে, আর থালাটা তো ভাঙবেই। থালাটা তুলে ঠাকুর সোজা আছাড় মারবে। হাত চালাতে ঠাকুর ওস্তাদ। রাগলে বৌকেও ছেড়ে কথা বলে না। ছেলে-টাকে সেদিন এ্যায়সা পিটিয়েছে—হাতটাই ভেঙে গেছে ছেলেটার, এখনো সারেনি। যা দেবার পাতাতেই দেবো। কিছু ছুঁসনা। গোড়াদের মেয়ে ঝুরিটাকে ডেকে নিয়ে বানিয়ার কাছ থেকে যা যা লাগে নিয়ে আয়। দক্ষিণা আমরা পুরোই দেবো —এক সের আটা, আধসের চাল, একপোয়া ছোলা, দু ছটাক ঘি, নুন, হলুদ আর চার আনা প্রণামী রাখবো। ঝুরিকে যদি না পাস, যে মেয়েটা চিড়ে মুড়ি ভাজে,

হাতে পায়ে ধরে তাকেই না হয় নিয়ে যাস। কোনো কিছুতে হাত দিস নি, তা'লেই সব মাটি।'

বউকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলার পর দুখী তার লাঠিটা আর বড়সড় এক গাঁট ঘাস নিয়ে পণ্ডিতের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। খালি হাতে তো আর পণ্ডিতকে কিছু বলা যায় না। ঘাস ছাড়া দেবার মত আর ওর কিই বা আছে। খালি হাতে আসতে দেখলে, দূর থেকেই পণ্ডিতজী গালমন্দ করে তাকে তাড়িয়ে ছাড়বে।

।। দুই ।।

পণ্ডিত ঘাসীরামের ভগবৎভক্তি অঢেল। ঘুম থেকে উঠেই সব একেবারে শাস্ত্র-মাফিক সারা চাই। বেলা আটটায় হাত পা ধুয়ে পুজোর ফুল উপাচার শুরু কর-বেন তিনি। পয়লা কাজটাই হ'ল ভাংগ তৈরী। তারপর আধঘন্টা ধরে চন্দন বেটে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঠি দিয়ে চন্দন লাগাবেন। দু'সারি চন্দনের ঠিক মাঝখানে গোল করে সিদুঁরের টিপ পরবেন, বুকে-হাতেও ফোঁটা আঁকবেন। এসব সেরে শালগ্রাম শিলাকে স্নান করানো, চন্দন লাগানো, ফুলটুল দিয়ে সাজানো : দেবতার সামনে প্রদীপ জেবলে ছোট্ট ঘন্টাটা বাজানো। দশটায় পুজো-আচ্চা সেরে, ভাংগ খেয়ে বাইরে অপেক্ষমান যজমানদের কাছে যাবেন তিনি। হাতে-নাতে ভক্তির ফলও মিলছে তার। এ হ'ল তার আবাদ করার ফসল।

আজ পুজোর ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি দেখলেন দুখী চামার এক গাঁট ঘাস নিয়ে বসে। তিনি ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দুখী উঠে দাঁড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ঠোকে, হাত জোড় করে দাঁড়ায়। পণ্ডিতের তেজস্বী চেহারাটা দেখে ভক্তিতে ওর মন ভরে উঠল। কেমন যেন দিব্যভাব। বেঁটেখাটো, গোলগাল আর মাথা জুড়ে টাক। গাল ফোলাফোলা আর জবলজবলে দু'চোখে একেবারে ব্রহ্মতেজ। চন্দন-চর্চিত হয়ে তার মধ্যে যেন একটা দেবত্ব এসেছে।

দুখীকে দেখে বললেন, 'কিরে দুখী, তোর আবার কি দরকার?'

মাথা নিচু করে দুখী বলে, 'বিতিয়ার সাগাই ঠিক করেছি, মহারাজ। এখন, শুভ লগন একটা যদি দেখে দেন? একবার যদি সময় করে আসেন?'

ঘাসী—'আজতো এখন সময় হবে না। বিকেলের দিকে অবশ্য যাওয়া যেতে পারে।'

দুখী—'না মহারাজ, দয়া করে একটু জলদি আসুন। সব জিনিষ গোছগাছ করে রেখেছি। এই ঘাসগুলো কোথায় রাখবো?'

ঘাসী—'ওই গরুটার সামনে রেখে আয়। আর ঝাড়ুটা দিয়ে দরজার সামনেটা সাফ কর। বাইরের ঘরটা কদিন থেকে লেপা হয়নি, ওটাও গোবর দিয়ে লেপে দে। ততক্ষণে আমি খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নিই, তারপর যাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, ওই কাঠটা কেটে রাখিস। খামারে চার বস্তা ভুষো রয়েছে, ওগুলো গোয়াল-ঘরে এনে রাখিস।'

দুখী সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে লেগে যায়। উঠোনে ঝাড়ু দিল, বাইরের ঘরটা গোবর দিয়ে লেপল। ততক্ষণে বারোটা বেজে গেছে। পণ্ডিতজী খেতে গেলেন। দুখী আজ সকাল থেকেই কিছু খায় নি। ওর দারুন ক্ষিদে পেয়ে যায়। কিন্তু খাবার কোন উপায় নেই এখন। এক মাইল দূরে ওর ঘর। ওখানে খেতে গেলে পণ্ডিতজী বিগড়ে যেতে পারে। ক্ষিদের কথা ভুলে বেচারা কাঠ কাটতে গেল। বেশ বড় গোছের গাছের গুঁড়ি একটা আর ভক্তদের অনেকেই যে ওটার ওপর তাদের শক্তি পরীক্ষা করে গেছে, তা বোঝা যাচ্ছে। লোহার মত শক্ত ওই গাছের গুঁড়িটা কাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। দুখী ঘাস কেটে হাটে বেচতো, কাঠকাটার কোন অভিজ্ঞতাই ওর ছিলনা। কাস্তের মুখে সহজেই ঘাসগুলো মাথা লুটিয়ে দেয় আর এখন সে তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রাণপণে কুড়ুল চালিয়েও কাঠটায় একটা দাগ পর্যন্ত বসাতে পারেনি। কুড়ুলটা কাঠের গায়ে লেগে যেন ছিটকে যাচ্ছে। ঘামে ওর সারা শরীর ভেজা, হাফ ধরে গেছে, দম ফুরিয়ে বসে পড়ে, তারপর আবার ওঠে। পা কাঁপছিল, হাত দুটো সে ঠিকমত তুলতে পারছেনা, কোমর সিধে করতে পারছেনা, চোখের সামনে সব ঝাপসা লাগছে, মাথা ঘুরছে, তবু সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ও ভাবছিল এক ছিলিম তামাক টানতে পারলে গায়ে একটু জোর পাওয়া যেত। কিন্তু ছিলিম আর তামাক কোত্থেকে পাওয়া যাবে? চারপাশে ব্রাহ্মণদের পাড়া, ওরাতো আর আমাদের ছোটলোকদের মত তামাক-টামাক খায় না। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায়, আরে এ গাঁয়ে তো একজন গোড় থাকে, তার কাছে নিশ্চয়ই তামাক আর ছিলিম দুই-ই মিলবে। তখুনি সে দৌড়ে লোকটার ঘরে যায়। ওর বরাত ভালো; গোড় তাকে ছিলিম আর তামাক দিল, কিন্তু তার ঘরে কোন আগুন ছিলনা। দুখী বলে, 'ঠিক আছে আগুনের জন্য ভেবো না; পণ্ডিতজীর বাড়িতে এখনো রান্নাবান্না চলছে, গিয়ে নাহয় একটু আগুন চাইবো।'

এই বলে ছিলিম তামাক নিয়ে ও ঠাকুরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'একটু আগুন পেলে এক ছিলিম তামাক খেতাম হুজুর।'

পণ্ডিতজী আহারে বসেছেন। তার স্ত্রী জিগেস করল, 'আগুন চাইছে কে?'

পণ্ডিত—'আরে ও হ'ল দুখী চামার। ওকে বলেছি কাঠটা কেটে দিতে। উনুনে তো আঁচ আছে, ওকে একটু আগুন দিয়ে দাও।'

ভ্রূকুটি করে পণ্ডিতাইন বলল, 'পুঁথিপত্তর পড়ে পড়ে জাতপাতের নিয়ম পর্যন্ত ভুলতে বসেছো তুমি। চামারা, ধোপা, পাখীমারা যার খুসী এসে একেবারে দাওয়ায় উঠবে, বাড়ি যেন ওদের। এটা কি ধম্মোশালা, না পবিত্র হিন্দুবাড়ী। ওফ, আগুন চাইতে এসেছে। লোকটাকে এখুনি বিদেয় কর, নইলে ওর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেবো।'

তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য পণ্ডিতজী বলে, 'না হয় ভেতরেই এসেছে, তাতে হ'লটা কি? তোমার কোন জিনিষতো ও ছোঁয়নি। ঘরদোর পরিষ্কার করেছে।

কাজতো তোমারই করছে, নাহয় একটু আগুন দিলে? কাঠটা কাটতে যাকেই ডাকো, কমসে কম চার আনা সে চাইবেই।'

এসব কথাবার্তার কিছুটা দুখীর কানে এল। ওর আফশোষ হ'ল, কি ভুলই না করেছে। সত্যি কথাই বলেছেন উনি। কবে কোন চামার বাপু বামুনের বাড়ির ভেতর ঢুকেছে। ওরা হলেন শুদ্ধ, পবিত্র; আর সে জন্যেই না দুনিয়ার সবাই ওদের ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আর আমি তো একটা চামার বই তো কিছু নয়। এ গাঁয়ে বুড়ো হলাম, আর এটুকু বুদ্ধি হ'ল না আমার। এরপর, পণ্ডিতের বউ যখন কয়লা নিয়ে এল, ওর মনে হ'ল উনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। হাত জোড় করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ও বলল, 'বাড়ির মধ্যে ঢুকে বড় অন্যায় করে ফেলেছি, মা। চামারের কি আর কাণ্ডজ্ঞান আছে? বুদ্ধু না হলে কি আর দিনরাত লাথি ঝাঁটা খায়।'

চিমটেয় করে আগুন নিয়ে এলেন পণ্ডিতাইন। ঘোমটায় ঢাকা মুখ, কয়েকপা দূর থেকে কয়লার টুকরোটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি। দুখীর মাথায় কয়েকটা বড় ফুলকি ছিটকে আসে; তাড়াতাড়ি পেছন ঘুরে আগুনের ফুলকিগুলো ও চুল থেকে ঝেড়ে ফেলল। মনে মনে সে ভাবে, পবিত্র ব্রাহ্মণবাড়ি অপবিত্র করার এই ফল। আর ভগবান কি তাড়াতাড়িই না শাস্তি দেন। এর জন্যেই না লোকে পণ্ডিতকে ভয় করে। আর সবারই টাকা ইচ্ছে করলে মারা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের টাকা কেউ মেরে দেখুক তো। পরিবারের সব্বোনাশ হবে, পা গলে-গলে খসে পড়বে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ও তামাক খেল। তারপর কুড়ুলটা তুলে নিয়ে আবার কাজে লেগে যায়। খটা খট আওয়াজ উঠতে থাকে।

লোকটার গায়ে আগুনের ফুলকি লাগায় ওর জন্যে মায়া হল পণ্ডিতাইনের। পণ্ডিতের খাওয়া শেষ হলে সে বলে, 'চামারটাকে কিছু খেতে দিলে হয় না, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে লোকটা। নিশ্চয়ই ওর খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

এই প্রস্তাব শুনে পণ্ডিতজীর কোন ভাবান্তর ঘটল না। সে জিগেস করল, 'রুটি আছে?'

'দু চারখানা বেঁচে যাবে।'

'দু চারটে রুটিতে চামারদের কিস্যু হয় না। অন্তত সেরখানেক আটা না হলে ওদের চলে না।'

পণ্ডিতাইন কান চেপে বলল, 'অ্যাঁ...এক সের। তবে থাক।'

পণ্ডিতজী গম্ভীরভাবে বললেন—'ঘরে ভুষি-টুসি থাকে তো আটার সাথে মিশিয়ে কয়েকটা লিট্টি বানিয়ে দাও। পাতলা পাতলা আটার রুটি দিয়ে ওদের তুমি পেট ভরাতে পারবে না। ওদের চাই জোয়ারের লিট্টি।'

পণ্ডিতাইন বলে, 'তা'লে বাপু থাক। আমি এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের সামনে বসতে পারবো না, যা গরম আজ।'

তামাক টেনে দুখী যখন আবার কুড়ুলটা তুলে নিল, ততক্ষণে একটু দম নিয়ে

তার হাত দুটোয় যেন কিছুটা তাকত ফিরে এসেছে। প্রায় আধঘন্টা ধরে ও কুড়ুল চালালো, তারপর দম হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এর মধ্যে গোড় এসে হাজির। বলে, 'দাদা, এভাবে নিজেকে শেষ করছো কেন? যত জোরেই কুড়ুল চালাও, ও গাছের গুঁড়িটা সহজে ভাঙ্গার নয়। শুধু শুধু নিজেকে খতম করছো?'

কপালের ঘাম ঝেড়ে দুখী বললো, 'ভাই, এরপরও আমাকে এক গাড়ি ভুষো আনতে হবে।'

'কিছু খেয়েছো? নাকি ওরা খেতে না দিয়েই কাজ করিয়ে নিচ্ছে? কিছু চাইছোই না বা কেন'?

'বামুনের বাড়ির খাবার আমি গিলবো, এ তুমি ভাবলে কি করে চিকুরি।'

'গেলাটা কোন ব্যাপার না। আগে তো খাবারটা পাওয়া চাই। উনি ওদিকে গোঁফে তা দিতে দিতে রাজার হালে গিলবেন, তারপর ঘুমোবেন, আর তুমি কাঠ কেটে মরবে। জমিদার বাবুরা তোমায় দিয়ে অবিশ্যি জোর করে কাজ করিয়ে নিতে পারে, সরকারী বাবুরাও পারে; তবে যত কমই হোক, ওরা অন্তত কিছু দেয়। আর এ লোকটা নিজেকে সাধুসন্ত ভেবে যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে।'

'আরে, আস্তে আস্তে। কেউ শুনে ফেললে দু'জনেই বিপদে পড়বো।' এই বলে দুখী আবার গিয়ে কুড়ুল চালাতে লাগলো। দুখীর জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছিল চিকুরির। ওর হাত থেকে কুড়ুলটা নিয়ে আধঘন্টাটাক কুড়ুল চালালো। কিন্তু গাছের গুড়িটায় একটা চিড় পর্যন্ত খায় নি। তারপর কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবার সময় বলে, 'যতই কুড়ুল চালাও, ওটা কাটা যাবে না। জান্ কয়লা হয়ে যাবে।'

দুখী ভাবছিল, কোত্থেকে যে বাবা এই গুঁড়িটা যোগাড় করেছে, এতো কিছুতেই কাটা যাচ্ছে না। এতক্ষণে একটা চিড় পর্যন্ত খায়নি। আর কতক্ষণ ধরে কাঠ কাটার চেষ্টা চালিয়ে যাবো, নিজের ঘরে তো কাজের কামাই নেই, কত কি বাকি পড়ে আছে। কিন্তু তাতে ওনার কি এসে যায়। ভুষোটা তুলে দিয়ে ওনাকে না হয় বলব, বাবা, কাঠ তো কাটা গেল না। কাল ঠিক কেটে দিয়ে যাবো।

ও ঝাঁকাটা তুলে ভুষো আনতে গেল। খামার বাড়ি থেকে গোয়াল ঘরটার দূরত্ব কমসে কম আধ মাইল। ঝাঁকাটা পুরো ভরতে পারলে কাজটা শেষ হতে বেশি সময় লাগার কথা না, কিন্তু পুরোটা চাপালে ঝাঁকাটা ওর মাথায় কে তুলে দেবে? বোঝাই ঝাঁকাটা তোলার মত দম ছিল না ওর, তাই কম কম করে ভরছিল দুখী। ভুষো আনতে আনতে চারটে বেজে যায়। এই সময় পণ্ডিত ঘাসীরাম উঠলেন, হাত-পা ধুয়ে কয়েকটা পান মুখে পুরে বাইরে এলেন। দেখলেন ঝাঁকাটা মাথায় দিয়ে দুখী ঘুমুচ্ছে। চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'আয়ে দুখী, ঘুমুচ্ছিস? কাঠটা যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। এতক্ষণ ধরে তুই করলিটা কি? সামান্য ভুষো আনতেই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলি, আর তারপর ঘুমুচ্ছিস। কুড়ুল নিয়ে কাঠটা কাট। গুড়িটাকে একটু চিরতে পর্যন্ত পারিসনি। এরপর

কোন শুভ লগন যদি খুঁজে না পাই, আমায় কিন্তু দোষ দিতে পারবি না। এই জন্যেই লোকে বলে, ছোটলোকগুলোর পেটে কিছু পড়লেই ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করে।'

দুখী আবার কুড়ুলটা তুলে নেয়। একটু আগে সে যা ভাবছিল, বেমালুম ভুলে যায়। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি আজ, হাতে সময়ই ছিল না; এখন তার পেটে পিঠে একাকার। উঠে দাঁড়ানোই অসম্ভব মনে হচ্ছে। দম ফুরিয়ে এসেছে, তবু কোনমতে সে উঠে পড়ে। উনি পণ্ডিত, লগন দেখেনা দিলে সর্বনাশ। এজন্যেই না সমাজে ওর এত মান-সম্মান। পণ্ডিত দিনক্ষণ দেখে দিলে তবেই না সব ঠিকঠাক। ইচ্ছে করলে যার তার সর্বনাশ করতে পারে। গুঁড়িটার দিকে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, 'ঠিক হ্যাঁয়, খুব জোরেচালা, চালা। এইতো, চালা, কি রে হাতে জোর নেই নাকি? ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববার কি হ'ল? ওইতো, ওইতো, গুঁড়িটায় চিড় ধরেছে, চালিয়ে যা।'

দুখী তখন ঘোরের মধ্যে। কোত্থেকে একটা লুকোনো শক্তি তার দু'বাহুতে উঠে আসে। মনে হয় ক্ষিদে, ক্লান্তি, দুর্বলতা সব কেটে গেছে। নিজের তাকত দেখে নিজেই সে অবাক। বাজের মত কুড়ুলের ঘা পড়ছিল একটার পর একটা। যতক্ষণ না গাছের গুঁড়িটা ঠিক মাঝখান থেকে দু'ফালা হয়ে যায়, ততক্ষণ নেশার ঘোরের মতই ও কুড়ুল চালিয়ে গেল—তারপর ওর হাত থেকে কুড়ুলটা খসে পড়ল। আর ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে, অবসাদে মাথা ঘুরে পড়ে গেল দুখী। নিভে গেল ওর জীবনদীপ।

পণ্ডিতজী বললো 'আর দু'চার ঘা লাগালেই হবে। টুকরো না হলে তো আর কোন কাজে আসবে না ওটা।' দুখী উঠল না। পণ্ডিত ঘাসীরাম এরপর ওকে আর খোঁচালেন না। বাড়ির ভেতর চলে গেলেন তিনি। ভাংগ খেলেন, টাট্টি সারলেন, স্নান করলেন, তারপর পণ্ডিত-সুলভ সাজগোজ করে তিনি বাইরে এলেন। দুখী তখনও ওখানেই পড়ে।

পণ্ডিত চিৎকার করে বললো, 'আরে কি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস দুখী; চল, তোর বাড়ির দিকেই যাবো। সব ঠিকঠাক আছে তো, না কি?' দুখী তাতেও উঠলো না। একটু ঘাবড়ে গেলেন পণ্ডিতজী। কাছে এসে দেখেন, দুখীর দেহ একেবারে নিঃস্পন্দ। দৌড়ে সে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে, 'দুখীটা বোধহয় মারা গেছে।'

পণ্ডিতাইন শংকিত হয়ে বলে, 'এইতো একটু আগেই কাঠ কাটছিল।'

'কাঠটা চেরবার সময়েই ও মরেছে। এখন কি হবে বলো তো?' অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় পণ্ডিতাইন বলে, 'হবে আবার কি? চামারপট্টিতে খবর দিয়ে দাও, ওরা এসে লাশটা নিয়ে যাক।'

মুহূর্তে সারা গাঁয়েই খবরটা রটে যায়। গোড়দের পরিবারটা ছাড়া এ গাঁয়ে

সবাই বামুন। লোকজন এ রাস্তা দয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু কুয়োতলা যাবার ওটাই একমাত্র রাস্তা—জল আনবে কি করে। চামারটার লাশ পড়ে আছে, ওদিক দিয়ে জল আনতেই বা কে যাবে। এক বুড়ি পণ্ডিতজীকে বলে—'লাশটা সরাবার ব্যবস্থা করতে পারছো না। গাঁয়ের লোক জল পাবে কি পাবে না।' এদিকে গোড়-লোকটা চামারপট্টিতে গিয়ে সবাইকে বলল—'খবরদার, লাশ তুলতে যাবেনা কেউ। আগে পুলিশ এসে তদন্ত করুক। ইয়ার্কি নাকি যে গরীবের জান নিয়ে নেবে। পণ্ডিতজী তো কি হয়েছে। লাশ তুললেই পুলিশ তোমাদের ধরবে।'

এর পরেই পণ্ডিতজী এলেন। কিন্তু চামারদের কেউই লাশ তুলতে যেতে রাজি নয়। দুখীর বউ আর মেয়ে হায় হায় করতে করতে পণ্ডিতজীর দরজায় এসে কপাল ঠুকে কাঁদতে লাগলো। ওদের সাথে আর পাঁচ-দশজন চামারনীও গেল। কেউ কাঁদছে, কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে—কিন্তু পুরুষ মানুষ একজনও নেই। পণ্ডিতজী চামারদের শাসালেন, মিষ্টি কথায় বোঝালেন; কিন্তু পুলিশের ব্যাপারটা ওরা ভোলে নি—কেউই নড়ল না। শেষটায় নিরাশ হয়ে পণ্ডিতজী ফিরে এলেন। মাঝরাত পর্যন্ত কান্নাকাটি চলল। আর ব্রাহ্মণরা চামারের লাশ ছোঁয় কি করে। কোন শাস্ত্র-পুরাণে এমন কথা লিখেছে? কেউ বলুক তো।

ক্রুদ্ধ পণ্ডিতাইন বলে, 'ওই ডাইনিগুলো মাথা খারাপ করে দেবে। আর গলার আওয়াজ কি এক একজনের।'

পণ্ডিত বললো, 'কাঁদুক, কতকাল কাঁদবে। যখন বেঁচেছিল তখনতো কেউ ওর কথা ভাবে নি, আর এখন মরে যাবার পর একেবারে সোরগোল তুলেছে।'

পণ্ডিতাইন—'চামারগুলোর কান্না অসহ্য।' পন্ডিতজী সায় দিলেন।

পণ্ডিতাইন—'এরই মধ্যে দুর্গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে।'

পণ্ডিত—'ব্যাটা বেজন্মা চামার! যা পাবে তাই খাবে।'

পণ্ডিতাইন—'ওদের ঘেন্নাও নেই।'

পণ্ডিত—'সব ব্যাটা পাষণ্ড।'

সকাল হলো। কোন চামারই এলো না। চামারনীরাও কান্নাকাটি করে চলে গেছে। দুর্গন্ধটা এরই মধ্যে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে!

পণ্ডিতজী একটা দড়ি বার করলেন। তাতে একটা ফাঁস বানিয়ে লোকটার পায়ে লাগিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন। চারপাশ তখনো ফর্সা হয়নি। পন্ডিতজী দড়ি ধরে টানতে টানতে লাশটাকে একেবারে গাঁয়ের সীমানায় নিয়ে এলেন। ওখান থেকে ফিরে স্নান সারলেন। চন্ডীপাঠ করে বাড়ির চারপাশে গঙ্গাজল ছেটালেন।

ওদিকে, মাঠের দিকে তখন শেয়াল, শকুন, কাক আর কুত্তারা দুখীর লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সারা জীবনভর ভক্তি, সততা সেবা আর নিষ্ঠার এই হল শেষ পুরস্কার।

ভাষান্তর: **পার্থ বন্দোপাধ্যায়**

মন্দির

মায়ের ভালোবাসা ! ধন্য সেই ভালোবাসা ! সংসারে আর যা কিছু সব মিথ্যে, সব ফাঁকা। মায়ের স্নেহই সত্যি, অক্ষয়, অবিনশ্বর। গত তিন দিনে এক দানা ভাতও মুখে যায়নি সুখিয়ার, না গেছে এক ফোঁটা জল। সামনে খড় বিছানো বিছানার ওপর পড়ে আছে মায়ের আদরের দুলাল। তিনদিন ধরে চোখ খোলে না ছেলেটা। কখনো কোলে করে বসে থাকে সে, কখনো শুইয়ে দেয় বিছানার ওপর। হাসি খুশী ছেলেটারও হঠাৎ কি যে হোলো, কেউ বলতে পারছে না তাকে। এই অবস্থায় মায়ের কি খিদে পায়, না তেষ্টা ? একবার কয়েক ফোঁটা জল মুখে ঢেলে-ছিলো, গলা বেয়ে নিচে নামেনি।

এই অভাগিনীর দুঃখের সীমা নেই। এক বছরের ভেতর দু'দুটো ছেলেকে গঙ্গার কোলে সঁপে দিতে হয়েছে। স্বামী তো আগেই গেছে। এখন এই অভা-গিনীর অবলম্বন, সর্বস্ব বলতে যা কিছু তা ওই ছেলেটাই। হায় ! ভগবান এই ছেলেটাকেও তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ? —এই চিন্তা মাথায় আসলেই চোখ ছাপিয়ে জল নেমে আসে মায়ের। এক মুহূর্তের জন্যও ছেলেকে কাছ-ছাড়া করে না। ওকে সাথে নিয়েই ঘাস কাটতে যায়। বাজারে যায় ঘাস বেচতে, কোলে থাকে ছেলে। ছেলের জন্য ছোট দেখে একটা খুরপী আর একটা ছোট ঝুড়ি বানিয়ে দিয়েছিলো সে। জিয়াবন মার সাথে ঘাস কাটতো আর গর্বের সাথে বলতো—আম্মা ! এর চেয়ে বড়ো একটা খুরপী বানিয়ে দাও। আমি অনেক অনেক ঘাস কাটবো। তুমি দাওয়ায় বসে থাকবে আম্মা, আমি ওগুলো বিক্রী করে দিয়ে আসবো। মা জিজ্ঞেস করতো—আমার জন্য কি কি আনবি রে ব্যাটা ? জিয়াবন তখন লাল লাল শাড়ির কথা বলতো। আর নিজের জন্য আনতে চাইতো অনেক গুড়।

এই সব আধো আধো মিঠে কথার স্মৃতি মনে পড়তেই মার বুকে যেন শূল বিঁধলো। এই শিশুকে যে দেখছে সেই বলছে নিশ্চয়ই কেউ কুনজর দিয়েছে। কিন্তু কে দেবে নজর ? এই বিধবারও কোন শত্রু সংসারে থাকতে পারে ? নাম জানতে পারলেই সুখিয়া তার পায়ের ওপর গিয়ে পড়তো আর তার কোলে তুলে দিতো বাচ্চাটাকে। তাতে কি লোকটার মন গলতো না একটুও ! কিন্তু নামতো কেউ বলে না। হায়, কাকে জিজ্ঞেস করবে, কি করবে !

॥ দুই ॥

তিন পহর রাত পেরিয়েছে। সুখিয়ার চঞ্চল মন নানা চিন্তায় নানাদিকে ঘুর-পাক খাচ্ছে। কোন্ দেবীকে পুজো দেবে, কোন্ দেবতার কাছে মানত করবে, এসব ভাবতে ভাবতে কখন ওর ঝিমুনি এসে গিয়েছিলো। তন্দ্রার ঘোরে দেখতে পেলো ওর স্বামী এসে ছেলের শিয়রে দাঁড়িয়েছে আর ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলছে—সুখিয়া, কাঁদিস না! তোর বাচ্চা ভাল হয়ে যাবে। কালকে ঠাকুরের কাছে পুজো দে, তাতেই কাজ হবে।—এই বলে সে চলে গেলো। ঘোর কেটে যায় সুখিয়ার। নিশ্চয়ই তার স্বামী তবে এসেছিলো। এতটুকুও সন্দেহ নেই সুখিয়ার। স্বামী এখনও ওর তার সাথে আছে ভেবে, আশায় চনমন করে ওঠে মন। স্বামীর ওপর ভক্তি আর শ্রদ্ধায় চোখ ভরে জল এসে যায়। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও বলে ওঠে—ভগবান! তুমি ছেলেকে ভালো করে দাও, আমি পুজো দেবো। এই অনাথ বিধবার ওপর দয়া করো।

ঠিক সেই সময় জিয়াবনের চোখ খুলে যায়। জল খেতে চায় সে। মা দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এসে বাচ্চাকে খাওয়ায়।

জল খেয়ে জিয়াবন বলে—আম্মা, এখন রাত না দিন?

সুখিয়া—এখনো তো রাতই বাবা। শরীর কেমন লাগছে?

জিয়াবন—ভালো, আম্মা! আমি এখন ভালো হয়ে গেছি।

সুখিয়া—ফুল চন্দন পড়ুক তোমার মুখে। ভগবান করে তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। কিছু খেতে ইছে করছে?

জিয়াবন—হ্যাঁ আম্মা, একটু গুড় দাও।

সুখিয়া—গুড় খাসনে বাবা, গা গোলাবে। খিচুড়ী বানিয়ে দেবো?

জিয়াবন—না আম্মা, না। একটু গুড় দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

মা এই আব্দারে আর থাকতে পারলো না। কিছুটা গুড় বের করে জিয়াবনের হাতে দিয়ে হাঁড়ির মুখটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিলো। হাঁড়িটা ওখানে রেখেই দরজা খুলতে গেলো সুখিয়া। জিয়াবন এই ফাঁকে দুটো বড়ো ড্যালা গুড় বের করে নিয়ে তাড়াতাড়ি চাটতে শুরু করলো।

॥ তিন ॥

পরের দিন গোটা দিনটাই জিয়াবনের শরীর ভালোই ছিল। অল্প খিচুড়ী খেয়েছে, দু'একবার আস্তে আস্তে দরজার গোড়ায় এসেছে। বন্ধুদের সাথে খেলতে না পারলেও ওদের খেলা দেখে আনন্দে মেতে উঠেছে। সুখিয়াও ভাবলো, বাচ্চার শরীর ভালো আছে। হাতে পয়সা আসলে দু-একদিনের ভেতরই ঠাকুরের পুজো দেবে। শীতের দিন। ঝাড়-পোঁছ করা, ধোয়া-মোছা করতে করতেই দিনটা কেটে

গেলো। কিন্তু সন্ধের সময় আবার জিয়াবনের শরীর খারাপ লাগতে থাকে। ঘাবড়ে যায় সুখিয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয় ঢুকলো, এখনো পুজো না দেওয়ায় কি ছেলেটার আবার এই অবস্থা ? এখনো দিন ফুরোতে কিছু বাকী। ছেলে কোলে ও পুজোর যোগাড় যন্তর শুরু করলো। ফুল পেলো জমিদারের বাগান থেকে। তুলসীপাতা তো দরজার সামনেই আছে। কিন্তু ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু মিষ্টি-টিষ্টি তো দরকার। নইলে গাঁয়ে বিলোবে কি ? প্রণালী হিসেবেও কম সে কম এক আনা পয়সা চাই। সারা গাঁ ঘুরে একটা পয়সাও মিললো না। হতাশ হলো সুখিয়া। হায় রে কি দুদিন! কেউ চার আনা পয়সাও দেয় না। শেষে নিজের হাতের রুপোর রুলি খুলে দৌড়ে গেলো বেণের দোকানে। ওগুলো বাঁধা রেখে দৌড়ে ফিরে এলো ঘরে। পুজোর উপকরণ তৈরী। এক হাতে ছেলেকে কোলে নিয়ে অন্য হাতে পুজোর ডালা নিয়ে মন্দিরের দিকে চললো সুখিয়া।

আরতির ঘণ্টা বাজছে তখন মন্দিরে। পাঁচ দশজন ভক্ত ভগবানের নাম গান করছে। সে সময় সুখিয়া গিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালো।

পুজারী জিজ্ঞেস করলো—কি চাই ? কি করতে এসেছিস ?

সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে সুখিয়া বললো—ঠাকুরের মানত ছিলো মহারাজ, পুজো দিতে এসেছি।

পুজারী দিনভোর জমিদারের বাড়িতে পুজো করে, আর সকাল সন্ধেয় এই মন্দিরে। রাতে মন্দিরেই শোয়, মন্দিরেই খাবার তৈরী হয়। স্বভাবে বড়ো দয়ালু, খুব নিষ্ঠাবান। যতই শীত ঠান্ডা পড়ুক স্নান না করে মুখে জলও ছোঁয়ায় না। আর এর পরেও ওর হাতে পায়ে যদি ময়লার মোটা পরত জমা হয় তো কি করা যাবে ? এতে ওর কি দোষ ! পুজারী বললো—কি বলে তুই ভেতরে চলে এলি ? পুজো তো হয়ে গেছে। এখানে উঠে জায়গাটা অশুচি না বানিয়ে ছাড়বি না ?

একজন ভক্ত বললো—ঠাকুরকে অপবিত্র করতে এসেছিস্ ?

বিনয়ের সংগে সুখিয়া বলে—একটু ঠাকুরের পা ছোঁব মহারাজ। পুজোর সব কিছু নিয়ে এসেছি।

পুজারী—কি অবুঝের মতো কথা বলছিস্ ? পাগল-টাগল হোস্‌নি তো ? বোকা, তুই ঠাকুরকে কি করে ছুঁবি ?

এর আগে কোনদিন ঠাকুরের দরজায় আসার ফুরসুত মেলেনি সুখিয়ার। আশ্চর্য হয়ে বললো—হুজুর। তিনি তো সারা সংসারের মালিক। তাঁর দর্শনে পাপীও ভাল হয়ে যায়, আমি ছুঁলে তিনি অশুচি হবেন কি করে ?

পুজারী—আরে, তুই চামার তো ? নাকি ?

সুখিয়া—তাতে কি, ভগবান কি চামারকে তৈরী করেননি ? চামারের ভগবান কি অন্য কেউ ? হুজুর, এই বাচ্চার মানত আছে।

এরপর সেই ভক্তমশাই, যে সবে নামগান শেষ করেছে, গলা চড়িয়ে বললো—চাঁড়াল দুটোকে মেরে ভাগিয়ে দাও। সব অশুচি করতে এখানে এসেছে। থালা-

টালাগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দাও। সংসারে আগুন তো লেগেছেই। এরপর চামারও যদি ঠাকুরকে পুজো দেয় তবে পৃথিবী রসাতলে যাবে না ?

দ্বিতীয় ভক্তমশাই বললো—এরপর ঠাকুরকে তো চামারের হাতে ভোগও খেতে হবে। প্রলয়ের আর বেশী বাকী নেই হে।

ঠাণ্ডা বেড়েই চলে। সুখিয়া ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। ওদিকে ধর্মের ঠিকেদাররা আলোচনায় মত্ত। সময়ের কোন হুঁশ নেই। দারুণ ঠাণ্ডায় বাচ্চাটা মার বুকে মুখ গুঁজে দেয়। কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করে না সুখিয়া। মনে হচ্ছে ওর দুটো পা-ই মাটিতে গেড়ে বসে গেছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে ঠাকুরের পায়ে গিয়ে পড়বে বুঝি। ঠাকুর কি শুধু এদের, আমরা গরীবরা কি ওঁর কেউ নয় ? এই লোকগুলো কেন আমাকে আটকাবে ? কিন্তু ভয় হচ্ছে ওর এই লোকগুলো যদি সত্যি সত্যিই থালা-টালা ছুঁড়ে ফেলে দেয় তো ও কি করবে ? এসব ভাবতে ভাবতে ওখান থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে একটা গাছের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রেখে এই ভক্তদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে থাকে সুখিয়া।

॥ চার ॥

আরতি আর স্তুতির পর অনেকক্ষণ ধরে ভক্তরা শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করতে থাকে। ওধারে পূজারীও উনুন ধরিয়ে শুরু করলো রান্না। উনুনের সামনে বসে মাঝে মধ্যে হুঁ হুঁ করতে থাকলো, মাঝে মধ্যে দু একটা জায়গার ব্যাখ্যা করলো। রাত দশটা পর্যন্ত এরকম কথাবার্তা চললো আর সুখিয়া গাছের তলায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এরপর ভক্তরা একে একে ঘরের দিকে রওনা হোলো। পূজারী রইলো একলা। তখন মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো সুখিয়া। মাথা ঘোরাতেই সুখিয়াকে দেখতে পেলো পূজারী। খিঁচিয়ে উঠলো—কি ব্যাপার, তুই এখনো যাস্‌নি ?

সুখিয়া থালাটা মাটিতে রেখে এক হাতেই ভিক্ষে চাওয়ার মতো করে বললো—মহারাজ, বড়ো অভাগী আমি। এই বাচ্চাটাই আমার সব। একটু দয়া করো মহারাজ। তিনদিন ধরে ও মাথা তোলেনি। তোমার খুব পুণ্য হবে মহারাজ।

এসব বলতে বলতেই সুখিয়া কাঁদতে থাকে। পূজারী এমনিতে বেশ দয়ালু। কিন্তু চামারকে ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়ার মতো অভুতপূর্ব ঘোর পাতকের কাজ সে করবে কেমন করে ? না জানি ঠাকুর এর কি দণ্ড দেবেন ? ওরও তো ছেলেপিলে আছে ঘরে। ঠাকুরের অভিশাপে গাঁয়ের যদি সর্বনাশ হয়, তবে ? বললো—ঘরে গিয়ে ভগবানের নাম নে। তোর ছেলে ভালো হয়ে যাবে। আমি ঠাকুরের চরণামৃত দিচ্ছি। বাচ্চাকে খাইয়ে দে। চোখেও গিয়ে লাগা। ভগবান চাইলে তোর বাচ্চা নিশ্চয়ই ভালো হবে।

সুখিয়া— তবুও ঠাকুরের পায়ে মাথা ছোঁয়াতে দেবে না, মহারাজ ? বড় গরীব আমি। কষ্টেসৃষ্টে পুজোর জিনিসপত্তর যোগাড় করেছি। কাল স্বপ্ন দেখেছি

মহারাজ—ঠাকুরের পুজো করলেই ছেলে আমার ভালো হয়ে যাবে। তাই দৌড়ে এসেছি। একটা টাকা আছে আমার কাছে। ওটা নিয়ে একবারের জন্যে ঠাকুরের পায়ে মাথা ছোঁয়াতে দাও।

এই প্রলোভন পণ্ডিতজীকে মুহূর্তের জন্য বিচলিত করলো। কিন্তু মূর্খ বলেই ভগবানের ভয় তখনো তার ভেতর অল্প টিকে আছে। লোভ সামলে বললো—আরে পাগলী; ভগবান কে পায়ে মাথা ঠোকালো সেটা বিচার করেন না, ভক্তের ভাবভক্তিটা দেখেন। শুনিসনি সেই কথা—'চাইলে মন, ঘরেই গঙ্গার আগমন'। মনে ভক্তি না থাকলে লাখবার ঠাকুরের পায় মাথা ঠুকলেও কোন লাভ হবে না। আমার কাছে একটা মাদুলী আছে। দাম সেটার অনেক, তবে তোকে এক টাকাতেই দিয়ে দেবো। ওটা নিয়ে বাচ্চার গলায় বেঁধে দে, ব্যস্ কালই তোর ছেলে খেলতে শুরু করবে।

সুখিয়া—তবু ঠাকুরের পুজো করতে দেবে না?

পুজারী—তোর জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত যা হয়নি সেটা করে গাঁয়ে আপদ বিপদ ডেকে আনব নাকি। তুই ওই মাদুলীটাই নিয়ে যা। ভগবান চাইলে রাতেই তোর বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে কারো নজর লেগেছে।

সুখিয়া - যেদিন থেকে ছেলেটার এই অবস্থা, সেদিন থেকে আমার ধড়ে প্রাণ নেই।

পুজারী—বড়ো ভাগ্যবান ছেলে তোর। ভগবানের ইচ্ছেয় তোর সব সঙ্কট দূর হবে। ছেলেটা তো এধারে প্রায়ই খেলতে আসতো। দু'তিন দিন ধরে ওকে দেখছিলাম না।

সুখিয়া মাদুলীটা কিভাবে বাঁধব, মহারাজ?

পুজারী - আমি এখন কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছি। গিয়ে গলায় পরিয়ে দে। এই অসময়ে নতুন কাপড় কোথায় খুঁজবি।

সুখিয়ার আঁচলের খুঁটে দুটো টাকা বাঁধা ছিলো। একটা আগেই গচ্চা গেছে। দ্বিতীয়টা পুজারীকে দিতে হোলো। তারপর মাদুলীটা নিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ঘরে ফিরে এলো।

॥ পাঁচ ॥

ঘরে গিয়ে ছেলের গলায় মাদুলী বেঁধে দিলো সুখিয়া। কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে ছেলের জ্বরও বাড়তে লাগলো হু হু করে। রাত তিনটে নাগাদ হাত পাও ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো ছেলেটার। ঘাবড়ে গিয়ে সুখিয়া ভাবতে লাগে—হায়! কেন আমি ঠাকুরকে দর্শন না করেই চলে এলাম। যদি ভেতরে ঢুকে ভগবানের পায়ে আছড়ে পড়তাম কি করতো ওরা? বড়োজোর ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতো, হয়তো বা মারতোও। কিন্তু তাতে কি, আমার কাজটা তো হাসিল হোতো। ঠাকুরের পা দুটো যদি চোখের জলে ভিজিয়ে দিতাম, যদি বাচ্চাটাকে

ঠাকুরের পায়ে শুইয়ে দিতাম, ঠাকুরের কি দয়া হোতো না ? দয়াময় ভগবান, দীনকে দয়া করেন, আমাকে দয়া করবেন না কেন, ভাবতে ভাবতে চঞ্চল হয়ে ওঠে সুখিয়ার মন। না, আর দেরী করার সময় নেই। সে অবশ্যই যাবে। গিয়ে ঠাকুরের পায়ে পড়ে কাঁদবে। এই অবলা নারীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে এর চেয়ে বড়ো অবলম্বন, অন্য কোন ভালো রাস্তা এখন আর নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকলে তালা ভেঙে ঢুকবে সে। ঠাকুর কি কারো নিজের সম্পত্তি নাকি যে তাকে বন্ধ করে রাখবে কেউ।

রাত তিনটে বেজে গেছে। ছেলেটাকে কম্বলে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলো সুখিয়া। এক হাতে পুজোর থালাটা তুলে মন্দিরের দিকে রওনা হোলো। ঘর থেকে বাইরে পা দেওয়া মাত্র ঠান্ডা কনকনে বাতাসে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো তার। শীতে পা জমে যাচ্ছে যেন। এর ওপর চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তা সিকি মাইলের কম নয়। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা গাছের নীচ দিয়ে দিয়ে গেছে। ডাইনে কিছু দূরে একটা পুকুর মতো আছে। এই পুকুরে একটা ধোপা ডুবে মরেছিলো। তার পরে বাঁশবন। সেখানে ভূত-প্রেতের আড্ডা। বাঁয়ে বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত। চারধারেই ছমছমে ভাব। অন্ধকারে সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠছে। হঠাৎ শেয়ালগুলো কর্কশ স্বরে হুক্কা হুয়া করতে শুরু করলো। হায় ! এক লাখ টাকা দিলেও কোনদিন এ সময় এখানে আসতো না সে। কিন্তু পুত্রস্নেহ এমনই যা সব-কিছুর ঊর্ধ্বে। হে ভগবান ! এরপর সবই তোমার হাতে। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে মন্দিরের কাছে চলে এলো সুখিয়া।

মন্দিরে পেঁছে সুখিয়া আড়াল থেকে দেখলো দরজায় তালা লাগানো। পুজারী পাশের ঘরটায় দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। চারধারে জমাট বাঁধা অন্ধকার। সিঁড়ির তলা থেকে একটা ইট তুলে নিয়ে তালার ওপর জোরে জোরে মারতে শুরু করলো সুখিয়া। কে জানে কোত্থেকে ওর গায়ে এত শক্তি এসেছে। দু'তিনবার মারতেই তালা আর ইট দুটোই চৌকাঠের ওপর ছিটকে পড়লো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে ঠিক সে সময়েই সুখিয়া দেখলো পুজারী ওর ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গাঁয়ের দিকে দৌড়তে লাগলো। প্রচন্ড শীতে ভোর রাতেই লোকের ঘুম ভেঙে যায়। এই চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়ে এদিক ওদিক থেকে লোকজন লণ্ঠন নিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগলো – কোথায় ? কোথায় চোর ? কোন দিকে গেলো ?

পুজারী—মন্দিরের দরজা খুলেছে। আমি খট খট আওয়াজ শুনেছি।

হঠাৎ সুখিয়া বারান্দা থেকে সিঁড়ির ওপর নেমে চিৎকার করে উঠলো—চোর না। আমি। ঠাকুরকে পুজো দিতে এসেছি। এখনো তো ভেতরেতে ঢুকিইনি। তাতেই এতো হৈচৈ !

পুজারী বললো—সর্বনাশ হয়ে গেছে। সুখিয়া মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে অপবিত্র করে দিয়েছে।

আর কি ! কয়েকজন লোক সুখিয়ার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে লাথি ঘুঁষি চালাতে

লাগলো। সুখিয়া এক হাতে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে লাগলো। একজন বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ওকে এতো জোর ধাক্কা দিলো যে বাচ্চাটা হাত থেকে ছিটকে পড়লো মেঝেতে। কিন্তু পড়ে গিয়ে বাচ্চাটা কাঁদলো না, কিছু বললো না, নিঃশ্বাসও নিলো না। সুখিয়াও পড়ে গেলো মাটিতে। একটু সামলে নিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলতে গিয়ে চোখ পড়লো বাচ্চাটার মুখের ওপর। সংগে সংগে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে আসে তার গলা দিয়ে। বাচ্চার মাথা ছুঁয়ে দেখলো। সারা গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় সুখিয়া। চোখে কোন জল এলো না তার। রাগে মুখ ঝলসে উঠলো, চোখ থেকে আগুন ঝরছে যেন। শক্ত হয়ে উঠলো হাতের মুঠো। দাঁত কড়মড় করতে করতে বললো —পাপীর দল, আমার বাচ্চাকে মেরে দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওর সাথে আমাকেও মেরে ফ্যালো না? আমার ছোঁয়ায় ঠাকুর অচ্ছুৎ হয়ে গেছে, না? পরশপাথর ছুঁইয়ে লোহা সোনা হয়, পরশপাথরটা লোহা হয়ে যায় না। আমি ছুঁলে ঠাকুর অপবিত্র হয়ে যাবে। আমাকে বানাবার সময় তোমাদের ঠাকুর ছোঁয়নি আমাকে? তখন অপবিত্র হয়নি? নাও, আর কখনও আসব না ঠাকুরকে ছুঁতে। লাগাও এখানে তালা, বসাও পাহারা।…হায়, এতোটুকু দয়ামায়াও নেই তোমাদের। তোমাদেরও তো বাচ্চাকাচ্চা আছে। এই অভাগী মায়ের ওপর এতটুকু দয়াও হোলো না? তোমরাই ধর্মের ঠিকেদার। হায়রে! সবকটা খুনে, একদম খুনে। ভয় পেও না, থানা পুলিসে যাব না আমি। এর বিচার ভগবানই করবেন, ওঁর দরবারেই বিচার চাইব।

সবাই নিস্তব্ধ। কারোর মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না। পাষাণ মূর্তির মতো সবাই মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইতিমধ্যে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। সুখিয়া আর একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো—হায় রে আমার বাছা। হায়রে! কোথায় গেলি জিয়াবন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। সংগে সংগে শেষ নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে গেলো সুখিয়ার। ছেলের জন্য প্রাণ দিলো মা।

মা, তুই ধন্য! তোর মতো নিষ্ঠা, তোর মতো শ্রদ্ধা, তোর মতো বিশ্বাস দেবতাদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

আহূতি

গদি আঁটা চেয়ারে বসে আনন্দ একটা সিগার ধরিয়ে বললো—বিশ্বম্ভর আজ একটা দুঃসাহসের কাজ করেছে। সামনেই পরীক্ষা আর ও কিনা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বসলো। ধরা পড়লে আর পরীক্ষা দেয়া হয়ে উঠবে না। আমার তো মনে হয়· বৃত্তিটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

সামনে আর একটা বেঞ্চে বসে রূপমণি কাগজ পড়ছিলো। চোখ দুটো তার কাগজের ওপর থাকলেও কথাটা কিন্তু শুনছে। বললো—খুবই খারাপ হলো ব্যাপারটা। তুমি কেন ওকে বোঝাওনি ? মুখ বেঁকিয়ে ওঠে আনন্দ—কেউ যদি নিজেকে দুনম্বরে গান্ধী ভাবতে শুরু করে, তবে তাকে বোঝানো খুবই মুসকিল। ও-ই উল্টে আমাকে বোঝাতে শুরু করতো।

কাগজটা মুড়ে চুল ঠিক করতে করতে রূপমণি বললো—তুমি আমাকেও বললে না, হয়তো আমি ওকে ঠেকাতে পারতাম।

বিরক্ত হয় আনন্দ—তাহলে আর কি, গিয়ে দ্যাখো এখনো বোধ হয় কংগ্রেস অফিসেই আছে ; আটকাও গিয়ে ওকে।

আনন্দ আর বিশ্বম্ভর দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আনন্দের ভাগ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই-ই প্রসন্ন। বিশ্বম্ভর তার ভাঙা-কপাল নিয়েই এসেছিল। অধ্যাপকরা দয়া করে ওকে ছোট একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ব্যস্, ওটাই ওর জীবিকা। বছর খানেক আগে রূপমণিও ওদের সাথেই পড়তো। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না বলে এবছর ও কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলো। দুই যুবকই মাঝে মধ্যে ওর সাথে দেখা করতে আসতো। আনন্দ অনেকটা ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো ; বিশ্বম্ভর এমনিই আসতো। পড়তে ভালো না লাগলে বা মনটা খারাপ থাকলে ওর কাছে এসে বসতো। রূপমণিকে নিজের দুঃখকষ্টের কথা বলে ও হয়তো মনটাকে একটু হাল্কা করতো। আনন্দর সামনে সাহস করে ও কিছু বলতে পারতো না। আনন্দ কিন্তু ওর জন্য সামান্য সহানুভূতিও দেখাতো না। উল্টে বকাঝকা, দোষারোপ করতো আর বেকুব বানিয়ে ছাড়তো। ওর সঙ্গে তর্ক করার সাহস ছিল না বিশ্বম্ভরের। সূর্যের তুলনায় প্রদীপের ক্ষমতাই বা কতটুকু ? মানসিক ভাবেও বিশ্বম্ভরের ওপর আনন্দর একটা আধিপত্য ছিল। জীবনে এই প্রথম সে আনন্দর আধিপত্যটাকে অস্বীকার করলো। আর সেই অভিযোগ নিয়েই আনন্দ রূপমণির কাছে এসেছে। ক'মাস ধরেই আনন্দর যুক্তিগুলোকে খতিয়ে

দেখছিলো বিশ্বম্ভর ; যুক্তিতে না পারলেও ইতিমধ্যেই ওর মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। এ বছরটা তো যাবেই ; বলা যায় না, এজন্য ওর গোটা ছাত্রজীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চোদ্দ-পনেরো বছরের মেহনতটাও মাটি হতে পারে ; হয়তো এ কূল ও কূল—দুকূলই গেলো। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে কি লাভ ! ইউনিভার্সিটিতে থেকে দেশের কাজ করার কতো সুযোগ। প্রতি মাসে আনন্দ কিছু টাকা তুলে দেয় আর অন্যান্য ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বম্ভরকেও আনন্দ এ পরামর্শই দিয়েছিল। যুক্তি দিয়ে বিশ্বম্ভরকে হারিয়ে দিলেও আনন্দ ওর মনটাকে জয় করতে পারেনি। আজ যখন আনন্দ কলেজে যাচ্ছে, বিশ্বম্ভর ততক্ষণে স্বরাজ ভবনের রাস্তা বেছে নিয়েছে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে ওর টেবিলেতে বিশ্বম্ভরের একটা চিঠি পেল আনন্দ। তাতে লেখা—

প্রিয় আনন্দ,

জানি, যা করতে যাচ্ছি, তা আমার পক্ষে আদৌ-ই ভালো না। কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যেতে চাই না, তবুও চলেছি। মরতে না চাইলেও মানুষ যেমন মরে, অনেকটা তেমনি। যাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, তারাও যখন ফাঁসি কাঠে জীবন দিচ্ছে, তখন আমার সামনেও এছাড়া কোন পথ নেই। নিজেকে আমি আর ঠকাতে পারছি না। এটা আত্মসম্মানের প্রশ্ন, আর এ জায়গায় কোন সমঝোতা (compromise) চলে না। তোমার—বিশ্বম্ভর

চিঠিটা পড়ে প্রথমটায় আনন্দর মনে হলো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ও বিশ্বম্ভরকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ওর দুঃসাহসের জন্য রাগও হলো ; আর সেই রাগ নিয়েই সে রূপমণির কাছে হাজির হয়েছে। রূপমণির অনুরোধে হয়তো ও বিশ্বম্ভরকে ফিরিয়ে আনতে যেত ; কিন্তু রূপমণির 'আমি ওকে আটকাতে পারতাম' এই কথাটাই ওর কাছে অসহ্য ঠেকলো। ওর কথার মধ্যে তাই ক্ষোভ ছিল, রুক্ষতা ছিল হয়তো কিছুটা অভিমানও ছিল।

রূপমণি গর্বিতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললো—ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি। একটু পরেই ভয়ে ভয়ে বললো— তুমিও চল না ?

আবার সেই ভুল। রূপমণির অনুরোধে আনন্দ নিশ্চয়ই ওর সাথে যেতো ; কিন্তু ওর কথার ধরনটাই এমনি যেন আনন্দ যেতে চায় না। অভিমানী আনন্দ এভাবে যেতে পারে না। উদাসীনভাবে সে বললো—আমি গিয়ে কোন লাভ নেই। তোমার কথায় অনেক বেশী কাজ হবে। ও আমার টেবিলে চিঠিটা রেখে গেছে। বিবেক, কর্তব্য আর আদর্শের বড় বড় কথা ও যখন ভাবছে, নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাউরেছে, তখন আর আমার কথায় কোন কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

পকেট থেকে চিঠিটা বার করে ও রূপমণির সামনে রাখলো। এসব সংলাপে এমন কিছু একটা ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা ইঙ্গিত দিলো, রূপমণি কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকাতেই পারলো না। আনন্দর নির্দয় আঘাত যেন ওকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল।

মুহূর্তে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো ওর ভেতর। সহজভাবেই চিঠিটা পড়লো ও। পড়তে পড়তে ওর সারা চোখমুখ জ্বল জ্বল করে উঠলো ; সোজা হয়ে গেল শিরদাঁড়া আর দু'চোখে আত্মসমর্পণের আভা ছড়ালো। চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে ও বললো—না, এখন আমি গিয়েও আর কোন লাভ হবে না।

বিজয়গর্বে আনন্দ বললো—আমি তো প্রথমেই তোমায় সে কথা বলেছিলাম ওকে এখন ভূতে পেয়েছে। কারো কথাই ও শুনবে না। বছর খানেক জেলে ঘানি ঘুরিয়ে যখন টিবি-তে ভুগবে কিংবা পুলিসের ডাণ্ডা খেয়ে হাত পা ভাঙবে তখন ওর চৈতন্য হবে। এখন তো ও জয়োল্লাস আর হাততালির স্বপ্নে মশগুল।

রূপমণি খোলা আকাশটার দিকে তাকিয়েছিল। দেখতে দেখতে নীল আকাশে একটা ছবি ভেসে উঠল—দুর্বল, শুকনো রোগা শরীর। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, মাথায় ছোট ছোট চুল আর মুখখানা যেন ত্যাগ, তপস্যা আর সত্যের সজীব প্রতিচ্ছবি।

আনন্দ আবার বললো—আমার রক্ত দিলে যদি দেশোদ্ধার হয় তো আমি আজই প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার মতো পঞ্চাশ-একশো লোক জুটলেই বা কি হবে? প্রাণটা দেয়া ছাড়া এতে আর কোন ফলই পাওয়া যাবে না।

রূপমণি এখনো সেই ছবিটাই দেখছিল। সে মুখ যেন হাসছে। সহজ, সরল হাসি, যেন সে দুনিয়া জয় করেছে।

আনন্দ বলেই চলে—যারা পরীক্ষা-ভূতের ভয়ে সিটিয়ে আছে, তারাই এখন দেশোদ্ধারের কথা ভাবে। নিজেকেই যে উদ্ধার করতে শেখেনি, কিনা সে করবে দেশোদ্ধার? পরীক্ষায় ফেল করলেও ডাণ্ডার বাড়িগুলো হাল্কা লাগবে।

রূপমণি আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল। সহসা সেই ছায়াছবিটা যেন কঠিন হয়ে উঠলো।

হঠাৎ ব্যস্তভাবে আনন্দ বললো— আজ একটা দারুন সিনেমা আছে। যাবে? চলো না, দুপুরের শোয়ে দেখে আসি।

রূপমণি যেন হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এসে বললো—না, আমার ভালো লাগছে না।

আনন্দ আলতোভাবে ওর হাতটা তুলে নিয়ে বললো—কেন, শরীর ভালো নেই? রূপমণি হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টা করলো না—না, শরীর ভালোই আছে।

'তাহলে যাবে না কেন?'

'যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'তবে থাক, আমিও যাবো না।'

'বেশ, টিকিটের টাকাটা তাহলে কংগ্রেসে দিয়ে দাও।'

'অদ্ভূত শর্ত যা হোক—তাও মঞ্জুর করছি।'

'কাল আমায় রসিদ দেখাবে।'

'আমাকে তোমার এতটুকু বিশ্বাস হয় না।'

আনন্দ হোস্টেলে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই স্বরাজভবনের দিকে পা বাড়ালো রূপমণি।

॥ দুই ॥

রূপমণি স্বরাজভবনে পেঁ‌ৗছে দেখে একটা দল বিলিতি কাপড়ের গুদামে পিকেট করতে চলেছে। সেই দলে বিশ্বম্ভর নেই। আর একটা দল মদের দোকানে পিকেট করতে যাবার জন্য তৈরী, কিন্তু সেখানেও বিশ্বম্ভর নেই।

রূপমণি সেক্রেটারীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, বিশ্বম্ভর নাথ কোথায় বলতে পারেন ?

সেক্রেটারী জিজ্ঞেস করল—আজ যে নাম লিখিয়েছে, সে ?

'জী, হাঁ—সে-ই।'

'খুব হৃদয়বান মানুষ। গাঁয়ের লোকদের তৈরী করার ভার নিয়েছে। সাতটার গাড়ীতে যাবে—এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্টেশনে পেঁৗছে গেছে।'

'তাহলে এখনো তো স্টেশনেই পাওয়া যাবে।'

সেক্রেটারী হাত-ঘড়িটা দেখে নিলো—মনে তো হয় স্টেশনেই পাওয়া যাবে।

বাইরে বেরিয়ে এসেই রূপমণি খুব জোরে সাইকেল চালাতে লাগলো। স্টেশনে পেঁৗছেই দেখে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বম্ভর।

রূপমণিকে দেখেই দৌড়ে ওর কাছে আসে বিশ্বম্ভর। 'তুমি কি করে এখানে এলে ? আনন্দর সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়নি ?'

পা থেকে মাথা অবধি একবার দেখে নিয়ে রূপমণি বললো—এ কি চেহারা করেছো ? আচ্ছা, জুতো পরাও কি দেশদ্রোহিতা ?

বিশ্বম্ভর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো—আনন্দবাবু তোমায় কিছু বলেনি ?

গাঢ়স্বরে রূপমণি বললো—হ্যাঁ, বলেছে। এ তুমি কি করলে ? দু' বছরের কমে ছাড়া পাবে না।

বিশ্বম্ভর মুখ তুলতে পারছিলো না। বললো—সবই যখন তুমি জানো, তখন আমায় ভরসা দেবার মত দু' চারটে কথাও কি তোমার নেই ?

হৃদয় কেঁপে উঠলো রূপমণির। তবু, নিজেকে সংযত করে বলে ও—তুমি আমাকে শত্রু ভাবো, না বন্ধু ভাবো ?

ছলছল চোখে বিশ্বম্ভর বললো—এ প্রশ্ন করছো কেন রূপমণি ? আমার মুখ থেকে এর জবাব না পেলেও তুমি কি কিছু বুঝতে পারো না ?

রূপমণি—তাহলে আমি বলি, তুমি যেও না।

বিশ্বম্ভর—এটা ঠিক বন্ধুর মত পরামর্শ হলো না, রূপমণি। আমি জানি, এ তোমার ভেতরের কথা নয়। একবার ভাবো তো, আমার জীবনটার কি এমন দাম। এম. এ. পাস করে একশো টাকার একটা চাকরি। খুব বেশী হলে তিন-চারশো টাকা। তার বদলে এখানে কি মিলবে বলোতো ? গোটা দেশের স্বরাজ। এমনি

একটা মহান ব্রতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাও ওই জীবনের চেয়ে ঢের ঢের বড় কাজ। গাড়ি আসছে, এবার যাও। আনন্দবাবুকে বোলো আমার ওপর যেন রাগ না রাখেন।

রূপমণি এতদিন এই নির্বোধ যুবকটিকে অনুকম্পা করে এসেছে। কিন্তু এবার সে তাঁর চোখে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলো। ত্যাগের ভেতর মন টানার যে শক্তি রয়েছে, সে শক্তি এমন প্রচণ্ডভাবে টান দিলো যে আমূল বদলে গেল পরিস্থিতি। বিশ্বম্ভরের যা কিছু দোষ ত্রুটি, তাই যেন গুণ, অলংকার হয়ে ঝলসে উঠলো। ওর বিপুল বিস্তৃত হৃদয়ের ভেতর পাখির মত আশ্রয় খুঁজতে লাগলো রূপমণি।

আতুর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রূপমণি বললো—আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

বিশ্বম্ভর যেন মোহাবিষ্ট, তার যেন নেশা চড়ে গেছে।

'তোমাকে ? আনন্দবাবু আমাকে তাহলে আর জ্যান্ত রাখবে না !'

'আমি আনন্দর হাতে বিকিয়ে যাইনি।'

'কিন্তু আনন্দ যে তোমার কাছে বিকিয়ে গেছে।'

রূপমণি মুখে কিছুই বললো না, শুধু ওর দু'চোখে ঝলসে উঠল বিদ্রোহ। পরিস্থিতিটা যেন ক্রমশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে যেন বিশ্বম্ভরের মত সহজ হতে পারছে না।

বড়লোক মা-বাপের একমাত্র মেয়ে, ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেই বড় হয়েছে। নিজেকে এখন তার জেলখানার কয়েদীদের মত মনে হচ্ছিল। প্রাণপণে ওই বাঁধন-টাকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য ভেতরে ভেতরে মনটাকে শক্ত করছিল ও।

গাড়ি এসে গেছে। যাত্রীরা উঠছে-নামছে। রূপমণি সহজ চোখে বলে—তুমি আমায় নিয়ে যাবে না ?

বিশ্বম্ভর গলায় দৃঢ়তা এনে বললো—না।

'কেন ?'

'এখুনি এ প্রশ্নটার আমি কোন জবাব দিতে চাই না।'

'ভাবছো, আমার মত বিলাসী মেয়ে কিছুতেই গাঁয়ে থাকতে পারবে না।'

বিশ্বম্ভর লজ্জা পায়। সত্যি, এটাও একটা বড় কারণ তো বটেই। তবু, সেসব অস্বীকার করে বললো—না, তা নয়।

'তাহলে কি ? বাবা আমায় ত্যাগ করবে ভেবে ভয় পাচ্ছো ?'

'ধরো যদি সেটাই হয়, সেক্ষেত্রে কি একবারও ভেবে দেখার দরকার নেই বলতে চাও ?'

'সেজন্যে আমি একটুও পরোয়া করি না।'

রূপমণির চাঁদের মত সুন্দর মুখে একটা গর্বিত সংকল্পের আভাষ লক্ষ্য করলো বিশ্বম্ভর। এই সংকল্পের সামনে সে কেঁপে উঠলো। বললো—আমার কথাটা শোনো রূপমণি, আমি···আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।

রূপমণি ভাবতে লাগলো।

বিশ্বম্ভর আবার বলে—অন্তত এ ভাবনাটা তুমি আমার জন্য ছেড়ে দাও।

রূপমণি মাথা নীচু করে বললো—বেশ, এই যদি তোমার আদেশ হয়, আমি মেনে নেবো। তুমি হয়তো ভাবছো ক্ষণিকের উন্মাদনায় আমি আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে যাচ্ছি। আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো ক্ষণিকের উন্মাদনা নয়—এ আমার দৃঢ় সংকল্প। যাও ; শুধু আমার একটা কথা মনে রেখো, তোমার আত্ম-মর্যাদা কিংবা সিদ্ধান্তে চোট খেলেই তবে আইনের কাছে ধরা দিও। আমি তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।

গাড়ি হুইসেল দিল। ভেতরে চলে গেল বিশ্বম্ভর। গাড়ি ছাড়লো, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ আঁচলে নিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো রূপমণি।

॥ তিন ॥

আলমারির একটা কোণে বিশ্বম্ভরের একটা পুরোনো রং-চটা ছবি ছিল রূপমণির কাছে। আজ স্টেশন থেকে ফিরেই সেই ছবিটা বার করে একটা ফ্রেমে লাগিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো সে। আনন্দর ছবিটা সরিয়ে দিল ওখান থেকে।

ছুটি-ছাটায় ওকে দু'চারটে চিঠি লিখেছিলো বিশ্বম্ভর। পড়েটড়ে সেগুলোকে এক কোণে রেখে দিয়েছিল রূপমণি। চিঠিগুলোকে বার করে আজ সে আবার পড়লো। এখন ওই চিঠিগুলোই কত মধুর লাগছে। সযত্নে চিঠিগুলোকে রাইটিং-বক্সে তুলে রাখলো রূপমণি।

পরের দিন খবরের কাগজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই ও ঝুঁকে পড়লো। বিশ্বম্ভরের নামটা দেখে গর্বে ওর মনটা ভরে উঠলো।

রোজই স্বরাজভবনে যাওয়াটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালো রূপমণির। সব-কটা মিটিংয়েও যেতে শুরু করলো ; একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমস্ত বিলাসের সামগ্রী। রেশম শাড়ির বদলে এল মোটা শাড়ি। চরকা এলো। কয়েক ঘন্টা ধরে সুতো কাটাও সুরু হলো। ক'দিন যেতে না যেতেই ও মিহি সুতো কাটতে শিখলো। ওই সুতো দিয়েই সে বিশ্বম্ভরের জন্য জামা বানাবে।

এদিকে পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। আনন্দর মাথা তোলার সময় নেই। রূপমণির কাছে দু'একদিন এসেও সে বেশীক্ষণ বসেনি। হয়তো বা রূপমণির ছাড়া-ছাড়া স্বভাবটাই ওকে বেশীক্ষণ বসতে দেয়নি।

এক মাস কেটে গেল।

একদিন বিকেলে আনন্দ এলো। রূপমণি সেসময় স্বরাজভবনে যাবার জন্য তৈরী। আনন্দ ভুরু কুঁচকে বললো—তোমার সংগে তো এখন কথা বলাই মুশ-কিল। রূপমণি চেয়ারে বসে বললো—তোমারও তো বই থেকে মুখ তুলবার সময় নেই। আজকে নতুন খবর কিছুই পাইনি। স্বরাজভবনে গেলে রোজকার তাজা খবর পাওয়া যায়।

দার্শনিক উদাসীনতা নিয়ে আনন্দ বললো—বিশ্বম্ভর তো গ্রামে খুব সোর-গোল ফেলে দিয়েছে। উপযুক্ত কাজই পেয়েছে ও। এখানে তো ওর মুখ থেকে রা বেরোতো না। ওখানে গেঁয়ো লোকগুলোর সাথে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে দিয়েছে। মানুষটা দিলখোলা ছিল বটে। রূপমণি এমনভাবে ওর দিকে তাকালো, যেন বলতে চাইছে এসব তোমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। তারপর বললো—মানুষের ভেতর এই গুণটা থাকলে তার আর সব দোষ মুছে যায়। তুমি নিশ্চয়ই কংগ্রেস বুলেটিন পড়ার সময়টুকু অন্তত পাও। গাঁয়ে বিশ্বম্ভর এমন একটা চেতনা সঞ্চার করতে পেরেছে যে সেখানে ছিটে-ফোঁটাও বিলিতি সুতো বিক্রি হয় না। কেউ নেশা করতেও যায় না। পিকেটিং করারও কোন দরকার পড়ে না। এখন তো ও পঞ্চায়েত খুলেছে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আনন্দ বললো—তার মানে, ওর জেলে যাবার দিনও ঘনিয়ে এসেছে।

রূপমণি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো—ব্যাপারটা অত সোজা না। কাল তো কৃষকদের একটা বড় জুলুস বেরোবার কথা ছিল। বোধহয় গোটা পরগণার লোক তাতে জমা হয়েছিল। শুনছি আজকাল গাঁ থেকে কোন মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত আসে না। উকিলদেরও অবস্থা কাহিল।

কড়া ভাষায় আনন্দ বললো—এই তো স্বরাজের মজা। জমিদার, ব্যবসায়ী আর উকিলরা সব মরুক, শুধু মজুর-কিষাণ বেঁচে থাকলেই হলো, ব্যস্।

রূপমণি বুঝলো আনন্দ আজ একটা ফয়শালা করতেই এসেছে। সেও তৈরী হয়েই জবাব দিলো—তো তুমি কি চাও, জমিদার উকিল ব্যবসায়ীরা গরীবের রক্ত চুষে মোটা হতে থাক আর যে সামাজিক ব্যবস্থাটায় এই মহান অন্যায়টি ঘটে যাচ্ছে কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না? তুমি তো সমাজনীতিতে পণ্ডিত; কোন অর্থে এই ব্যবস্থাকে আদর্শ বলা চলে? এ অবস্থায় সভ্যতার তিনটি প্রধান শর্তের কোনটারও কি ন্যূনতম ব্যবহার সম্ভব?

আনন্দ রেগে গিয়ে বলে—শিক্ষা আর সম্পত্তির প্রভুত্ব বরাবর ছিল এবং বরাবর থাকবে। অবশ্য তার রূপ বদলাতে পারে।

আবেগ চেপে বসে রূপমণির মধ্যে—স্বরাজ আসার পরও যদি সম্পত্তির এমনি প্রভুত্ব থাকে আর শিক্ষিত সমাজে যদি একই রকম স্বার্থপরতা থেকে যায়, তাহলে আমি বলবো তেমন স্বরাজের কোন প্রয়োজন নেই। ইংরেজ মহাপ্রভুদের টাকার লালসা আর অন্যদিকে শিক্ষিত লোকদের শুধু নিজেদের নিয়ে ভাবা, এ দুটোই আজ আমাদের পিষে মারছে। যে সব খারাপ জিনিসগুলো হটাবার জন্য আজ আমরা জীবনটা বাজী রাখছি, বিদেশী না হয়ে স্বদেশী হলেই কি সেই সব খারাপ জিনিসগুলো মানুষ এর জন্য মাথায় করে রাখবে? জন-এর জায়গায় গোবিন্দ বসলো, আমার কাছে স্বরাজের মানে তা নয়। আমি সেই সামাজিক ব্যবস্থা দেখতে চাই, যেখানে অন্তত পক্ষে কোন অসাম্য থাকবে না।

আনন্দ—এ তোমার নিজের কল্পনা।

রূপমণি—তুমি এখনো এ আন্দোলনের সাহিত্য পড়োনি।

আনন্দ—পড়িনি এবং পড়তে চাইও না।

রূপমণি—তাতে দেশের কোন ক্ষতিও হবে না।

আনন্দ—তুমি আর আগের মতো নেই। একেবারেই বদলে গ্যাছো। এই সময় পোস্টম্যান এসে একটা কংগ্রেস বুলেটিন দিয়ে গেল। অধীর আগ্রহে ওটা খুললো রূপমণি। প্রথম খবরটা পড়ার সংগে সংগেই সে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপরই তার শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠলো আর একটা অদ্ভুত দ্যুতি খেলে গেল ওর মুখে।

আবেগে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে বললো—বিশ্বম্ভর ধরা পড়েছে। দু'বছর জেল হয়েছে ওর।

আনন্দ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কি মামলায় সাজা হলো ওর? অভিমানী চোখে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রূপমণি বললো—রানিগঞ্জে কৃষকদের একটা বিরাট সভা ছিল। ওখানেই ধরা পড়েছে।

আনন্দ—আমি আগেই বলেছিলাম, অন্তত দু' বছরের জেল হবেই। জীবনটা নষ্ট করে ফেললো।

রেগে গিয়ে রূপমণি বললো—শুধু ডিগ্রী পেলেই কি মানুষের জীবন সার্থক হয়? সমস্ত জ্ঞান আর অনুভব কি কেবল বইয়ের পাতায়ই থাকে? আমার তো মনে হয়, জেলখানায় দু' বছরের জীবনে মানব চরিত্র বিষয়ে বিশ্বম্ভরের যে অভিজ্ঞতা হবে, দর্শন আর আইনের পুঁথিপত্তর পড়ে দুশো বছরেও তোমার সে শিক্ষা হবে না। চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তা হলে জেনো দেশের সংগ্রামে মনোবল গঠনের যে উপাদান রয়েছে, নিছক জীবিকার সংগ্রামে তার কিছুই নেই। তুমি অবশ্য বলতে পারো আমার কাছে অন্নচিন্তাই বড়, অন্য কিছু আমার দ্বারা হবে না। সাহস, ধৈর্য, মানসিক দৃঢ়তা, সংগঠন কিছুই আমার নেই, তাহলে অবশ্য মেনে নেবো। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য যে জীবন দেয়, আর যাই হোক তাকে বোকা বললে মেনে নেবো না। বিশ্বম্ভরের কথায় আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দেবার জন্য বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে। জনগণের সামনে দাঁড়াবার আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তি আছে তোমার? যারা তোমাকে পায়ের নিচে পিষছে, যারা তোমাকে কুকুরেরও অধম ভাবছে, তাদেরই গোলামী করার জন্য তুমি ডিগ্রীর পেছনে ছুটছো। তোমার কাছে এটা গৌরবের হতে পারে, কিন্তু আমি তা মনে করি না।

আনন্দ রূপমণির কথায় অস্থির হয়ে উঠলো। বললো—তুমি তো একেবারে বিপ্লবী হয়ে উঠেছো দেখছি।

রূপমণি আবেগমণ্ডিত ভাবে বলে—সত্যি কথায় যদি তুমি বিপ্লবের গন্ধ পাও, আমার কিছু করার নেই।

'আজ নিশ্চয়ই বিশ্বম্ভরের সম্বর্ধনা সভা হবে। তুমি যাবে নাকি?'

দৃপ্তভাবে রূপমণি বললো—নিশ্চয়ই যাব। বস্তুতাও দেব আর কাল রাণীগঞ্জ চলে যাবো। বিশ্বম্ভর আজ যে আলো জ্বালিয়ে গেছে, আমি বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই নিভে যেতে দেবো না।

আনন্দ ডুবন্ত মানুষের মত খড়কুটো আঁকড়ে ধরার শেষ চেষ্টা করলো—তোমার মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করেছো ?

'করবো।'

'ওরা তোমাকে যেতে দেবে ?'

'সিদ্ধান্তটা আমার। এ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তটাই আমার কাছে সব থেকে বড় নির্দেশ।'

'ওঃ, নতুন কথা মনে হচ্ছে।'

বলতে বলতে আনন্দ উঠে পড়লো আর ওর হাতটা একবার না ছুঁয়েই চলে গেল। ওর পা দুটো ভীষণ কাঁপছিল, মনে হচ্ছিলো এখুনি বুঝি পড়ে যাবে।

ভাষান্তর : পার্থ বন্দোপাধ্যায়

সোয়া সের গম

কোন এক গাঁয়ে শংকর নামে এক কুরমী কিষাণ থাকতো। সাদাসিধে গরীব মানুষ, নিজের কাজকম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ও কারুর সাতে-পাঁচেও নেই। প্যাঁচপয়দা জানে না আর ছলচাতুরীও শেখেনি। কাউকে ঠকাতো না, কারুর কাছ থেকে ঠকে যাবার ভয়ও ছিল না। জুটলো তো খেল, নইলে চিড়েমুড়ি চিবিয়েই কাটিয়ে দিলো। তাও যদি না জুটলো তো জল খেয়ে রামনাম ক'রে শুয়ে পড়লো। কিন্তু মাঝে মধ্যে ঘরে কোন অতিথি-টতিথি এলে তাকে তখন নিবৃত্তির রাস্তা ছাড়তেই হ'তো। বিশেষতঃ কোন সাধুসন্ত এলে সাংসারিক ব্যাপারে ভাবতেই হ'তো ওকে। নিজে না খেয়ে কাটিয়ে দেয়া যায়, তা বলে ভগবানের ভক্তদের তো আর উপোস করিয়ে রাখা চলে না।

একদিন সন্ধেবেলা এক মহাত্মা তার দরজায় এসে হাজির। তেজদৃপ্ত মূর্তি, গৈরিক বসন, মাথায় জটা, হাতে পেতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম আর চোখে চশমা। রইস লোকেদের প্রাসাদেটাসাদে বসে যারা জপতপ করে, মোটর চড়ে তীর্থভ্রমণে বেরোয় আর সিদ্ধিলাভের জন্য ভালোমন্দ খায়-দায়—পোশাকে-আশাকে আর চেহারায় অবিকল তাদের মতই। ঘরে যবের আটা আছে—কিন্তু তা কি করে ওনাকে খেতে দেয়। পুরাণে যবের যতই মাহাত্ম্য থাক না কেন, এ যুগের সিদ্ধ-পুরুষদের কাছে তা একেবারে অখাদ্য। বড় চিন্তায় পড়া গেল—মহাত্মাকে কি খাওয়াই। শেষটায় ঠিক করলো গাঁয়ের কারো কাছ থেকে গমের আটা ধার নেবে; কিন্তু সারা গাঁ ঘুরেও গমের আটা মিললো না। গাঁয়ের সবাই ছাপোষা লোক—দেবতাটেবতা তো আর নয়, দেবভোগ্য খাবারই বা পাবে কোত্থেকে? সৌভাগ্যক্রমে ওই গাঁয়েরই এক পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেল। ওনার কাছ থেকে সোয়া সের গম ধার নিয়ে এসে আটা পিষতে বললো বউকে। মহাত্মাজী ভোজন সেরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। ভোরবেলা আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

পুরুত ঠাকুর বছরে দু'বার করে সিধে নিয়ে থাকেন। শংকর মনে মনে ভাবলো, সোয়া সের গম আর কি ফেরৎ দেবো—তার চেয়ে পাঁচ সের সিধের জায়গায় না হয় আরো কিছু বেশি দিয়ে দেবো; উনিও বুঝে নেবেন আর আমার ঋণও শোধ হয়ে যাবে। চৈত্র মাসে যখন পুরুত ঠাকুর সিধে নিতে এলেন, শংকর পাঁচ সেরের জায়গায় সাড়ে সাত সের গম দিলো আর নিজেকেও ঋণমুক্ত

ভাবলো। পুরুত মশাইও এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। শংকরের মত সরল মানুষ কি আর তখন জানতো ওই সোয়া সের গমের ধার মেটাতে তাকে আর একবার জন্ম নিতে হবে পৃথিবীতে।

॥ দুই ॥

সাত বছর পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পুরুত ঠাকুর থেকে মহাজন হয়েছেন বিপ্র মহারাজ আর চাষী শংকর ক্ষেতমজুর বনে গেছে। আলাদা হয়ে গেছে ছোট ভাই মংগল। দু'জন যখন এক সাথে থাকতো তখন ছিল চাষী আর এখন মজুর। হিংসা-টিংসা যাতে আর না বাড়ে সেটাই চাইতো শংকর; কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো শেষটায় ও গুম মেরে গেলো। দু'জনের হাঁড়ি যখন ভাগ হয়ে গেল, সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো শংকর। আজ থেকে ভাই ভাইয়ের শত্রু। একজনের দুঃখে আর একজন হাসবে, এর ঘরে পৌষমাস তো ওর ঘরে সর্বোনাশ; ভালোবাসার বাঁধন, রক্তের টান, একই মায়ের বুকের দুধে যারা বড় হয়েছে আজ আর তাদের কোন সম্পর্ক নেই সব শেষ। ভগীরথের মত কঠিন মেহনত দিয়ে একদিন যে বংশমর্যাদার গাছ পুতেছিল, নিজের রক্তে যাকে সে সিঞ্চন করেছে—আজ শেকড়সুদ্ধ সেই গাছটাকে উপড়ে যেতে দেখে ওর বুকটা খান খান হয়ে গেল। সাতদিন একটা দানাও মুখে তুলেছিলো না শংকর। জষ্টি মাসের রোদ মাথায় করে দিনভর কাজ করে আর রাতে মুখে কুলুপ এঁটে শুয়ে পড়ে। এক ভয়ংকর বেদনা আর দুঃসহ কষ্টে ওর রক্ত জল হয়ে যায়—শুকিয়ে একেবারে হাড্ডি-সার হয়ে গেল। অসুখে ভুগে কমাস বিছানায় পড়ে রইলো শংকর। কিন্তু এখন যে কি করে সংসার চলবে? পাঁচ বিঘে ক্ষেতের অর্ধেকটা আর একটা মোটে বলদ রয়েছে, এতে কি আর ক্ষেতি হয়? শেষটায় যা দাঁড়ালো, তাতে ইজ্জৎ রক্ষার জন্য ক্ষেতি রইলো বটে, তবে পেট চালাতে মজুরীই ভরসা।

এভাবেই সাত বছর কেটে গেল। একদিন মজুরী সেরে ঘরে ফিরছে শংকর। রাস্তায় পুরুত ঠাকুরের সাথে দেখা হতেই বললো - কাল এসে তোর জমা খরচের হিসেবটা একবার দেখে যাস শংকর। সেই কবে থেকে তোর কাছে সাড়ে পাঁচ মন গম পাওনা, ফেরৎ দেবার যে আর নাম করিস না? স্রেফ হজম করে ফেলার ধান্দায় আছিস দেখছি?

শংকর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—আমি আবার তোমার কাছ থেকে কবে গম নিলুম যে সাড়ে পাঁচ মন গম পাবে? ভুল করছো পুরুত ঠাকুর। কারুর কাছে আমি তো এক ছটাক ফসল বা এক পয়সা ধারি না।

পুরুত—এ জন্যেই তোর এমন হাল হয়েছে যে না খেয়ে মরছিস।

এই বলে পুরুতমশাই শঙ্করকে সাত বছর আগে সোয়া সের গম দিয়েছিলেন, সে কথা তুললো। সব শুনে শঙ্কর থ। হায় ভগবান! এ লোকটাকে কতবার আমি সিধে দিয়েছি, কিন্তু ও কি আমার কোন কাজে এসেছে? যখনই পাঁজি-পুথি

পড়তে গেছে কিংবা তিথি-টিথি দেখতে এসেছে, প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু 'দক্ষিণা' নিয়েছে। এত স্বার্থপরতা! সোয়া সের গমের ডিমে তা দিয়ে দিয়ে ও পিশাচ বনেছে; এবার সেই পিশাচটা ওর বুকের ওপর বসে ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। একবার বললেই তো আমি কবে ওর গমের হিসেব চুকিয়ে দিতুম, বদ মতলবটা হাসিল করার জন্যই এ্যাদ্দিন ও চুপ মেরে ছিল। শঙ্কর বললো—মহারাজ, খাতায়-কলমে তোমার ধার মেটাই নি ঠিকই, কিন্তু সিধে দেবার সময় কতবার সের-দু'সের বেশি দিয়েছি, আর আজ সাড়ে পাঁচ মন গম চাইছো! কোত্থেকে দেবো আমি বলো তো?

পুরুত—হিসাব এক জিনিস আর সিঁধে-সিধি ভেট অন্য জিনিস। তুই যা দিয়েছিস বাপু তার তো কোনো হিসেব নেই। হতে পারে পাঁচ সের কেন, তুই বিশ সেরই দিয়েছিস। কিন্তু খাতায় তোর নামে সাড়ে পাঁচ মনই লেখা আছে। ধার শোধ করে দিলেই খাতা থেকে আমি তোর নাম কেটে দেবো, আর নইলে কিন্তু ধার বাড়তেই থাকবে।

শঙ্কর—কেন বাপু গরীবকে মারছো পাঁড়েজী। আমার এদিকে খাওয়ার ঠিক নেই, এত গম আমি কোত্থেকে দেবো?

পুরুত—যে ভাবে পারিস দিবি, আমি এক ছটাকও ছাড়বো না। আমায় না দিলেও ভগবানের কাছে হিসেব তো তোকে একদিন দিতেই হবে। শঙ্কর কেঁপে উঠলো। আমাদের মত লেখাপড়া জানা লোক হ'লে বলতো, ভালো কথা তাহলে ভগবানকেই দেবো। ওখানকার বাটখারা তো আর এখানকার চেয়ে বড় নয়। তা-ছাড়া এর তো কোন প্রমাণ নেই, তবে আর চিন্তা কিসের? কিন্তু শঙ্করের মত মানুষ তো আর এত যুক্তি তর্ক জানে না, এতসব বিষয়বুদ্ধিও নেই। একে তো ধার—তায় আবার বামুনের কাছে। চিত্রগুপ্তের খাতায় যদি নাম উঠে যায় তো সোজা নরকবাস। এটা ভাবতেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। বললো – মহারাজ তোমার যা পাওনা, তাই দেবো। ভগবানের কাছে দিয়ে আর কি লাভ! এ জন্মে তো ঠোক্কর খেয়েই মরছি, আবার পরজন্মের পথেও কাঁটা দেবো। যাক্ সে, কাজটা কিন্তু ন্যায্য হ'ল না। তিলকে তাল করলে; বামুন হয়ে এটা কি খুব উচিত কাজ হ'ল? তখুনই যদি তাগাদা মেরে আদায় করে নিতে তাহলে আজ আমার মাথার ওপর এতটা ঋণের বোঝা চাপতো না। আমি দিয়ে দেবো ঠিকই কিন্তু ভগবানের কাছে এর জন্য জবাব তোমায় দিতেই হবে ঠাকুর।

পুরুত – ওখানকার ভয় তোর থাকবে, আমার ভয়টা কিসের। ওখানে তো সবাই আমার বন্ধু। মুনিঋষিরাও সবাই ব্রাহ্মণ, দেবতারাও সবাই ব্রাহ্মণ; যত ঝনঝাট ঝামেলাই হোক ঠিক সামলে নেবো। তা, কবে শোধ দিচ্ছিস?

শংকর—ঘরে তো আর নেই। চেয়েচিন্তে যোগাড়-টোগাড় করে তবে না দেবো।

পুরুত – তা হবে না বাপু। সাত বছর হয়ে গেছে, আর আমি একদিনও ধানাই-পানাই শুনছি না। গম না দিতে পারিস খত লিখে দে।

শংকর—দিতে তো আমাকে হবেই ; সে গমই নাও আর খতই লেখাও ; তা হিসেবটা কি হবে শুনি ?

পুরুত—বাজারে পাঁচ সের ক'রে, তোর বেলায় না হয় পোনে পাঁচ সেরই দিলুম।

শংকর—দেবো যখন তখন বাজার দরই সই। পোয়াটাক ছাড় নিয়ে আর নিমিত্তের ভাগী হতে যাবো কোন্ দুঃখে ?

হিসেব করে দাঁড়ালো গমের দাম ষাট টাকা। ষাট টাকার দস্তাবেজ লেখা হ'ল। শতকরা তিন টাকা হিসেবে সুদ। এক বছর না দিলে সুদের হার বেড়ে সাড়ে তিন টাকা হবে—স্ট্যাম্প আট আনা ; দস্তাবেজ লেখার খরচ এক টাকাও শংকরকেই দিতে হ'ল।

আড়ালে আবডালে পুরুত ঠাকুরকে সবাই ছি ছি করলো, তবে মুখের ওপর বলার সাহস কারোরই ছিল না। কি করেই বা বলবে—সময় অসময়ে মহাজনের কাছে কাকে না হাত পাততে হয়।

॥ তিন ॥

সারা বছর ধরে কঠিন সাধনা করলো শংকর। প্রতিজ্ঞা ছিল, যে ভাবেই হোক মেয়াদ শেষ হবার আগেই টাকাটা শোধ করে দেবে। এমনিতেই দুপুরের আগে চুলো জ্বালাতো না শংকর, চিঁড়ে মুড়ি চিবিয়েই কাটিয়ে দিতো। দিনে এক পয়-সার তামাক খাবার বিলাসিতাটুকু কোন দিন ছাড়তে পারেনি। কঠিন প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে তাও ছাড়লো। ভেঙে ফেললো হুঁকো কল্কে, তামাকের হাড়িটাও টুকরো টুকরো করে ভাঙলো। পরনের কাপড়চোপড়ের অবস্থা আগেই ত্যাগের প্রায় শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার স্রেফ নেঙ্গুটিতে এসে ঠেকলো। কুয়াশায় হাড়-কাঁপানো শীতে আগুন পুইয়েই রাত কাটিয়ে দিতে লাগলো কোনমতে। এমনি ধ্রুব সংকল্পের ফলও ফললো আশাতীত। বছর শেষ হতে না হতেই ওর হাতে ষাট টাকা জমে গেলো। ভাবলো, পুরুত ঠাকুরকে এই টাকাটা দিয়ে বলবে, বাকিটা শিগ্‌গিরই শোধ দিয়ে দেবো। আর তো মোটে পনেরোটা টাকা। পুরুতমশাই কি আর এটুকু মেনে নেবে না ? ও টাকাটা নিয়ে পণ্ডিতজীর পায়ের কাছে রাখলো। পণ্ডিতজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কারোর কাছ থেকে ধারটার করলি না কি ?

শংকর—না মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে মজুরী এবার ভালোই মিলেছে।

পুরুত—কিন্তু এ তো মোটে ষাট টাকা।

শংকর—হ্যাঁ, মহারাজ। এখন এটা নিন, বাকীটা দু'তিন মাসের মধ্যেই দিয়ে দেবো। আমায় ঋণের দায় থেকে মুক্তি দিন।

পুরুত—আমার পাওনা গণ্ডা পুরো চুকিয়ে দিলে তবে না ঋণমুক্ত হবি। যা আগে আমার আরো পনেরোটা টাকা নিয়ে আয়।

শংকর—মহারাজ, অন্ততঃ একটু দয়া করুন। রাতের রুটিটুকু যে কোত্থেকে জুটবে, তাও জানি না। গাঁয়ে যখন আছি টাকা আপনাকে ঠিকই দিয়ে দেবো।

পুরুত—দ্যাখ্‌, এসব রোগ পোষার স্বভাব আমার নেই। আর বেশি কথা বলা আমার ধাতে পোষায় না। পুরো টাকাটা একসাথে না পেলে আজ থেকে গাড়ে তিন টাকা হারে সুদ চড়াবো। তোর টাকা তুই ঘরেও নিয়ে যেতে পারিস, ইচ্ছে হলে আমার কাছেও রাখতে পারিস।

শংকর—ঠিক আছে, যে টাকাটা এনেছি সেটা তো রাখুন। দেখি, কারো কাছ থেকে যদি পনেরোটা টাকা যোগাড় করতে পারি।

সারা গাঁ চষে ফেললো শংকর কিন্তু কেউই ওকে টাকা দিলো না। লোকেরা ওকে বিশ্বাস করতো না বা তাদের কারোর হাতে কোন টাকা ছিল না, তা নয়। আসলে পণ্ডিতজীর মুখের শিকার ছাড়িয়ে আনতে কেউ সাহস করেনি।

॥ চার ॥

প্রকৃতির নিয়মই এমনি ক্রিয়া থাকলে তার প্রতিক্রিয়াও থাকবে। সারা বছর কঠিন সাধনা করেও শংকর যখন ঋণমুক্ত হতে পারলো না, ওর আর তখন কোন সংযম রইলো না। একদম হতাশ হয়ে পড়লো। ও ভাবলো, এত মেহনত করেও যখন ষাট টাকার বেশি জমাতে পারিনি, এর দ্বিগুণ টাকা আর তাহলে কি করে জমাবো? ঋণের বোঝাই যদি বইতে হয়, তবে এক মনও যা সোয়া মনও তাই। ওর উৎসাহে ভাঁটা পড়লো, ঘেন্না ধরে গেল মেহনতে। আশাই উৎসাহের জননী, আশাই তেজ আর শক্তির উৎস, আশাই জীবন। জীবনের চালিকাশক্তি সেও ঐ আশা। আশাহত শংকর কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেলো। জীবনের যে সব জরুরী প্রয়োজনকে বছরের পর বছর ধরে দূরে সরিয়ে রেখেছিল শংকর, সে সব চাহিদা এবার আর ভিখিরির মত তার দরজায় এসে দাঁড়ায়নি; পিশাচীর মত বুকের ওপর বসে এবার তারা পুরো পাওনা গণ্ডা উশুল করে নিতে এসেছে। কাপড়ে তালি মারারও একটা সীমা আছে। হাতে টাকা এলে শংকর আগের মত জমায় না; কাপড় কেনে, খাবার দাবার নিয়ে আসে। আগে তামাক খেতো—এখন গাঁজা আর চরসের নেশা ধরলো শংকর। ও এখন আর ধারদেনা শোধ করার কথা চিন্তাই করে না। এমনি বেপরোয়া ভাব যেন ও কারো কাছে এক পয়সার ধার ধারে না। প্রথম প্রথম আর যাই হোক কাজে ও বেরোতোই, ইদানিং কাজে না যাবার জন্যেও হাজারটা বাহানা খোঁজে।

তিন বছর ওর এভাবেই কাটলো। এর মধ্যে পুরুত মশাই একবারের জন্যেও তাগাদা লাগায়নি। চতুর শিকারীর মতই সে তার অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ করতে চায়। আগেভাগে শিকারকে সতর্ক ক'রে দেওয়া তার রীতিবিরুদ্ধ।

একদিন শংকরকে ডেকে হিসেব দেখালো পণ্ডিতজী। আগের জমা ষাট টাকা বাদ দিয়েও আরও একশো কুড়ি টাকা পাওনা হয়েছে।

শংকর—এতো টাকা এ জন্মে আমার আর দেওয়া হবে না পণ্ডিতজী—পর-জন্মেই দেবো।

পুরুত—এ জন্মেই আমি আদায় করে ছাড়বো। আসল না দিস, সুদ তোকে দিতেই হবে।

শংকর—একটা বলদ আছে, নিয়ে নাও। ঝুপড়িটা আছে, সেটাও নিতে পারো। ব্যস্, আর আমার কিস্যু নেই।

ঠাকুর—বলদ-টলদ নিয়ে আমি কি করবো? আমায় দেবার মত তোর ঢের জিনিস আছে।

শংকর—আর কি আছে, মহারাজ?

ঠাকুর—কিছুই নেই তো, তুই আছিস। মজুর খেটেই তো পেট চালাস, তা মজুর বাপু আমার দরকার। সুদের টাকাটা গায়ে-গতরে শোধ দিবি তারপর যখন সুবিধে হবে তখন না হয় আসল দিস। নিয়মমাফিক, আমার টাকা শোধ না করে অন্য কোথাও তুই মজুর খাটতে পারিস না। সম্পত্তি বলতে তো আর তোর কিছু নেই, তা এতগুলো টাকা কোন্ ভরসায় ফেলে রাখি বল্। মসে মাসে যে সুদ দিবি তার জন্যেই বা তোর হয়ে জামিন দেবে কে? কাজটাজ করেও তো তুই সুদের টাকা দিতে পারছিস না; আসল যে কবে দিবি কে জানে?

শংকর—মহারাজ, গতরে খেটে সুদ শুধলে খাবো কি?

পুরুত—কেন, তোর ছেলেরা তো আছে—তারা কি সব ঠুঁটো জগন্নাথ নাকি? তোকে না হয় আমি রোজ আধসেরটাক যব দেবো। আর বছরে একটা কম্বল পাবি, একটা করে মেরজাই—আবার কি চাই। অন্য কোথাও খাটলে রোজ তুই ছ'আনা করে পেতে পারিস, তবে আমার তো আর তেমন কোনো গরজ নেই। আমি তোকে রাখছি যাতে তুই শোধ দিতে পারিস, বুঝলি।

কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা ক'রে শংকর বলে, 'মহারাজ এ তো জীবনভোর গোলামী।'

পুরুত—গোলামী ভাবতে পারিস আবার মজদুরীও ভাবতে পারিস। যা তোর ইচ্ছে তাই ভাব। আমার টাকা যতক্ষণ না আদায় হচ্ছে, আমি কিন্তু তোকে ছাড়ছি না। তুই ভাগলে তোর ছেলে সুধবে। আর, যখন কেউ থাকবে না, তখন দেখা যাবে।

এর ওপর আর কোথাও কোন আপীল নেই। মজুরের হয়ে জামিন আর কে দাঁড়াবে, পালিয়েই বা যাবেটা কোথায়। পরের দিন থেকে পুরুত ঠাকুরের ওখানে কাজে লেগে গেল শংকর। সোয়া সের গমের জন্য আজীবন পায়ে গোলামীর বেড়ি পরতে বাধ্য হ'ল। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বেচারা শুধু ভাবে, এ আমার পূর্বজন্মের কর্মফল। সারা জীবন বউটা যা করেনি তেমনি সব কাজ করতে হয় এখন। প্রায়ই ছেলেমেয়েদের পেটে কিছু পড়ে না। চুপচাপ দ্যাখে শুধু শংকর, ওর আর কিছুই করার নেই। গমের প্রতিটি দানা বিধাতার অভিশাপ হয়ে ঞ

জন্মের মত ওর মাথার ওপর চেপে বসেছে।

বিশ বছর ঠাকুরের বাড়ি দুঃসহ গোলামীর পর সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলো শংকর। তখনো ওর মাথার ওপর একশো কুড়ি টাকা ধার। ওই গরীব বেচারাকে ঈশ্বরের দরবারে আর কষ্ট দিতে চাইলেন না পণ্ডিতজী। হাজার হোক, এতবড় অন্যায় তো আর তিনি করতে পারেন না। শংকরের বদলে উনি ওর ছেলের ঘাড়ে চাপলেন। আজো সে পুরুত মশাইয়ের ওখানেই কাজ করে। কবে যে উদ্ধার পাবে, কিংবা হয়তো আদৌ পাবে কি না, সে এক মাত্র ভগাই জানে।

পাঠক! এ কাহিনীকে কপোলকল্পিত ভাববেন না যেন। এটা সত্য ঘটনা। দুনিয়া থেকে এমনি শংকর আর পুরুত ঠাকুরের দল মোটেই শেষ হয়ে যায়নি।

ভাষান্তর: **পার্থ বন্দোপাধ্যায়**

হিংসা পরম ধর্ম

দুনিয়ায় এমন কিছু লোক আছে যারা কারো চাকর না হয়েও সবার চাকর; যারা নিজের কোন কাজ না করলেও মাথা তুলবার ফুরসৎ পর্যন্ত পায় না। জামিদ ঠিক এই ধরনের মানুষ। একদম উড়োনচণ্ডী গোছের, কারোর সাথে বন্ধুত্বও নেই, শত্রুতাও নেই। কেউ একটু হেসে কথা বললো তো, ব্যস্, ও তার বিনে মাইনের গোলাম বনে গেলো। অন্যের কাজ করেই ওর আনন্দ। গাঁয়ে কেউ অসুখে পড়লো তো রোগীর সেবাশুশ্রূষার জন্য ও হাজির। বলুন ওকে, হয়তো মাঝরাতেই হাকিমের ঘরে চলে যাবে। দাওয়াখানা তোলপাড় করে ফেলবে কোন জড়ীবুটীর খোঁজে। তাই বলে ও এমন নয় যে কোন গরীবের ওপর অত্যাচার হচ্ছে দেখে চুপচাপ থাকবে। আর এমনও নয় কেউ যদি ওর গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে ও তাকে ছেড়ে কথা বলবে। আর এরকম ঘটনা ঘটেছেও বহু। কনস্টেবলের সাথে প্রায়ই খুটখাট ঝামেলা হয় ওর। এইজন্য লোকে ওকে ক্ষ্যাপাটে ভাবে। আর সত্যিসত্যিই খানিকটা তো তাই। কোন লোকের বোঝা ভারী দেখলেই সেটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় নিয়ে নেওয়া, কারো ঘরে আগুন লাগলে দৌড়ে যাওয়া, এসব করলে কে ওকে বুঝদার বলবে। সংক্ষেপে, অন্যেরা ওর এই ভালোমানুষী থেকে যা ইচ্ছে ফয়দা লোটে, নিজের কিছু উপকারে আসে না। সামান্য রুটি রুজির জন্যও ওকে অন্যের ওপর ভরসা করে থাকতে হয়। ও তো মস্তপুরুষ; আর ওর গম খায় অন্যে।

॥ দুই ॥

শেষে লোকেরা যখন ওকে বলতে শুরু করলো—'কেন তুমি নিজের জীবন নষ্ট করছো? পরের জন্য জান দিচ্ছো, আর ভুলেও কেউ কি তোমার কথা জিজ্ঞেস করে? অসুখ-বিসুখ হোক দেখবে কেউ এক গণ্ডূষ জল এগিয়ে দেবে না; যতদিন অন্যের সেবা করবে লোকে দানখয়রাত ভেবে দুটো খেতে হয়তো দেবে ঠিকই কিন্তু কাজ বন্ধ করলেই মুখ বেঁকিয়ে কথা বলবে। শুনে শুনে জামিদের চোখ খুললো। বাসনপত্র কিছু ছিলো না। একদিন ওখানকার পাট চুকিয়ে রাস্তা ধরলো। দুদিন পর পেঁছলো এক শহরে। খুব বড়ো শহর। উঁচু উঁচু বাড়ী-গুলো আসমানের সাথে কথা বলে। চওড়া চওড়া পরিষ্কার রাস্তা। গমগমে বাজার। মন্দির আর মসজিদের সংখ্যা বাড়ির সংখ্যার চেয়ে বেশী হয়তো হবে না;

তবে কমও নয়। ওদের গাঁয়ে না ছিলো কোন মসজিদ, না কোন মন্দির। মুসলমান লোকেরা ওখানে একটা উঁচু চাতাল মতো জায়গায় নামাজ পড়ে নেয়। হিন্দুরা একটা গাছের গোড়ায় জল ঢালে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। নগরে ধর্মের এত ঘটা দেখে বড়ো কৌতূহল আর আনন্দ হয় জামিদের। ধর্মের মতো সম্মান ও কোনো জাগতিক বস্তুকেই করে না। ও ভাবতে লাগে—এই শহরের লোকগুলো আহা, কি ধর্মপ্রাণ, কত সত্যবাদী! এদের দয়া, বিবেক, সহানুভূতি সবই আছে। এই জন্যই বুঝি খোদাও এদের মানে। ও আসা-যাওয়ার পথের সমস্ত লোকেদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে আর বিনয়ে মাথা নোয়ায়। সবাইকেই ওর দেবতার মতো মনে হয়।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধে হয়ে গেলো। একটা মন্দিরের চাতালে গিয়ে ও বসলো জিরিয়ে নেবার জন্য। খুব একটা বড়ো মন্দির। চুড়োয় সোনার কলস চকচক করছে। মন্দিরের বারান্দায় কারুকার্য করা শ্বেতপাথরের তৈরী বসার জায়গা কিন্তু উঠোনে এখানে সেখানে গোবর আর টুকরোটাকরা জঞ্জালে ভর্তি। নোংরা একদম দেখতে পারে না জামিদ। মন্দিরের এই দশা দেখে ওর দুঃখ হোলো। এধার ওধার তাকিয়ে দেখলো কোথাও কোন ঝাড়ুটাড়ু পাওয়া যায় কিনা তাহলে নিজেই সাফ করে দিতো জায়াগাটা। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। হতাশ হয়ে নিজের কাঁধের গামছাটা দিয়েই জায়গাটা পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলো।

একটু পর থেকেই ভক্তদের আসা শুরু হোলো। জামিদকে উঠোনটা সাফ করতে দেখে ওরা নিজেদের ভেতর আলোচনা করতে লাগলো—

'মুসলমান মনে হচ্ছে।'

'মেথর হবে হয়তো।'

'না, মেথর নিজের গামছা দিয়ে কখনো সাফ করে না। হয়তো কোন পাগল-টাগল হতে পারে।'

'ওদের গুপ্তচর নয়তো!'

'না, চেহারায় তো খুব গরীব মনে হচ্ছে।'

'হসন নিজামীর আত্মীয় হয়তো।'

'আরে গোবরের লোভে পরিষ্কার করছে। কোন ভবঘুরে হবে। (জামিদকে) অ্যাই, গোবর নিবি না, বুঝলি? কোথায় থাকিস্?'

'ভিনদেশী মুসাফির সাহেব। গোবর নিয়ে কি করবো? ঠাকুরের মন্দির দেখে দু'দণ্ড বসবো বলে এলাম। নোংরা পড়েছিলো। ভাবলাম মহাত্মারা সব আসবে, তাই পরিষ্কার করছিলাম।'

'তুমি তো মুসলমান, না?'

'ঠাকুর তো সবারই—কি হিন্দু, কি মুসলমান।'

'তুমি ঠাকুরকে মানো?'

'ঠাকুরকে আবার কে মানে না সাহেব ? যিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন তাঁকে মানবো না তো কাকে মানবো ?'

ভক্তদের মধ্যে শলাপরামর্শ চললো—

'ব্যাটা দেহাতী।'

'এখানেই রাখতে হবে, কোথাও যেন না যায়।'

॥ তিন ॥

জামিদ ওখানেই রয়ে গেলো। আদর যত্ন তার বাড়তে লাগলো দিন দিন। বেশ বড়োসড়ো খোলামেলা ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা হোলো। ভালো ভালো খাবারও পেতে লাগলো দুবেলা। সব সময়ই দু'চারজন লোক ওকে ঘিরে থাকে। খুব ভালো ভজন গাইতে পারত জামিদ। গলাও খুব সুন্দর। মন্দিরে এসে রোজ কীর্তন গাইতে শুরু করলো। ভক্তির সাথে সুর-মাধুর্যে ভরে উঠতো ওর গান। আর কি চাই! ওর কীর্তনে ওখানকার লোকজনের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেলো। বেশ কিছু লোক ওর গানের জন্যেই মন্দিরে আসতে শুরু করলো। সবাই বিশ্বাস করলো, ভগবানই এই লোকটাকে পাঠিয়েছে।

একদিন মন্দিরে খুব ভীড়। উঠোনে ফরাস পেতে দেওয়া হয়েছে। জামিদের মাথা ন্যাড়া। ওরা ওকে নতুন কাপড় পরিয়েছে। যজ্ঞ হচ্ছে। প্রসাদ বিলোচ্ছে জামিদ। আশ্রয়দাতাদের এ উদারতা আর ধর্মনিষ্ঠা দেখে ও অভিভূত। এই লোকেরা অসাধারণ সজ্জন নাহলে কি আমার মতো একজন পরদেশী কাঙালকে এতো খাতির করে! একেই বলে সাচ্চা ধর্ম। জামিদ জীবনে কখনো এতো সম্মান পায়-নি। ও তো ছিলো ভোলেভালা হাসিখুশী যুবক, লোকে পাগল বলতো। আর আজ, ভক্তদের মাথার মণি হয়ে উঠেছে ও। শয়ে শয়ে লোকে শুধু ওকে দেখতেই আসে। ওর বিশাল পান্ডিত্য নিয়ে কতো কথাই না ছড়িয়েছে। কাগজে খবর বেরিয়েছে যে এক মস্ত গুণী মৌলবী সাহেবের শুদ্ধি হয়েছে। সিধেসাধা জামিদ এতো সম্মানের রহস্য বুঝে উঠতে পারেনি। এইসব ধর্মপ্রাণ সহৃদয় লোকেদের জন্য ও কি না করতে পারে? ও রোজ পুজো করে, ভজন গায়। আর এসব তো ওর কাছে নতুন কিছুই নয়। নিজের গাঁয়েও বসে বসে ও বরাবর সত্যনারায়ণের কথা শুনতো। ভজন কীর্তন করতো। তফাৎ ছিলো ওখানে ওর কোনো কদর ছিলো না। এখানে সবাই ওর ভক্ত।

একদিন কয়েকজন ভক্তের সাথে বসে পুরাণ পড়ছিলো জামিদ। হঠাৎ সামনের রাস্তায় দেখলো এক জোয়ান যুবককে কপালে তিলক কাটা, গলায় পৈতে। এক জন হাড় জিরজিরে বুড়োকে ধরে পেটাচ্ছে লোকটা। বুড়োটা কাঁদছে, মাটিতে পড়ে গিয়ে লোকটার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে বলছে—মহারাজ, এবারের মতো মাফ করো। কিন্তু তিলকধারী যুবকের মধ্যে এতেও বিন্দুমাত্র দয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। জামিদের মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। এরকম দৃশ্য দেখে

শান্ত হয়ে বসে থাকা যায় না। উঠে দৌড়ে বাইরে সে যুবকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো—বুড়োটাকে মারছো কেন ভাই ? একে দেখে কোন দয়া হচ্ছে না তোমার ?

যুবক—মারতে মারতে এর হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবো।

জামিদ—আরে ও কী করেছে ? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবক—এর মুরগী আমার ঘরে ঢুকে সারা ঘর নোংরা করেছে।

জামিদ—ও কি মুরগীকে শিখিয়ে দিয়েছিলো তোমার ঘর নোংরা করার জন্য।

বুড়ো—খুদাবন্দ্, আমি তো বরাবর ওটাকে খাঁচায় পুরে রাখি। আজ গলতি হয়ে গেছে। বলছি তো মহারাজ, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করে দাও। কিন্তু উনি কিছু শুনছেন না। হুজুর, মারতে মারতে একেবারে আধমরা করে দিয়েছে।

যুবক—এখনো তো মারিনি, এবার মারবো—জ্যান্ত কবর দেবো।

জামিদ—ভাই সাহেব, জ্যান্ত কবর দিলে তোমাকেও আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বুঝলে ? আর একবার গায়ে হাত ওঠালে ভাল হবে না।

যুবকের নিজের শক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস। আবার বুড়োর গায়ে হাত তুললো। কিন্তু গায়ে হাত পড়ার আগেই ওর ঘাড় চেপে ধরলো জামিদ। শুরু হয়ে গেলো দুজনের মল্লযুদ্ধ। জামিদ বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান। যুবককে এক ঝটকায় মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিলো। যুবক পড়ে যাওয়া মাত্র সমস্ত ভক্তরা যারা এতক্ষণ মন্দিরের ভেতর বসে তামাশা দেখছিলো তারা দৌড়ে এলো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জামিদের ওপর। চারধার থেকে শুরু হোলো মার। জামিদ বুঝতে পারলো না লোকগুলো কেন ওকে মারছে। কেউই তো কিছু জিজ্ঞেসও করছে না। তিলকধারী যুবককে কেউ কিছু বলছে না, যেই আসছে, ব্যস্ হাতের সুখ করে নিচ্ছে ওর ওপর। এরপর আর না থাকতে পেরে ও পড়ে গেলো। তখন লোকজনেরা কথা বলতে শুরু করলো।

'বিশ্বাসঘাতক !'

'বেইমানের জাত্! কোন মুসলমানের কাছ থেকে কিছু ভালো আশা কোরো না। কাক মিশতে পারে কাকের সাথেই। নীচ নীচই। কেউ ওকে পাত্তা দেয়নি। মন্দিরে ঝাড় দিচ্ছিলো। গায়ে এক টুকরো কাপড়ও ছিলো না। সম্মান করলাম, পশু থেকে মানুষ বানালাম, তবুও আপন হোলো না।'

'এদের ধর্মের মূল কথাই তো তাই।'

জামিদ সারারাত ধরে রাস্তার ধারে যন্ত্রণায় কাতরালো। মার খাওয়ার দুঃখ ওর ছিলো না। এ ধরনের যন্ত্রণা ও বহুবার ভোগ করেছে। ও দুঃখ পেয়েছে আর আশ্চর্য হয়েছে এই ভেবে যে এই লোকগুলো কেন ওকে এতো সম্মান করেছে আর কেনই বা আজ অকারণে ওর এই হেনস্থাটা করলো। ওদের সেই ভালমানুষী আজ কোথায় গেলো। আমি তো সেই একই লোক। দোষের তো কিছু করিনি। যা করেছি এই অবস্থায় পড়লে সবারই তা করা উচিত। তাহলে এই লোকগুলো কেন তার ওপর এই অত্যাচার চালালো ? দেবতা কি রাক্ষস হয়ে গেলো ?

এই ভাবনা চিন্তাতেই সারারাত কাটালো। ভোরবেলা উঠে আবার নিজের রাস্তা ধরলো জামিদ।

কিছুটা দূর যাওয়া মাত্র ঐ বুড়োটার সাথে দেখা হয়ে গেলো। জামিদকে দেখেই ও বলে উঠলো—খুদা কসম্, তুমি কাল আমার জান বাঁচিয়েছো। শুনলাম ওই শয়তানগুলো তোমাকে বেধড়ক মেরেছে। একটু সুযোগ পেয়েই তো আমি পালিয়ে এলাম। কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? এখানকার লোকেরা তোমার সাথে দেখা করার জন্য ঠায় বসে ছিলো রাতে। কাজী সাহেব রাতেই তোমার তল্লাসে বেরিয়েছেন কিন্তু তোমাকে পাওয়া যায়নি। কাল দুজনে একলা পড়ে গিয়েছিলাম, দুশমনেরা আমাদের পিটিয়েছে। নমাজের সময় সব লোক মসজিদে ছিলো। নইলে খবরটা যদি কোনরকমে পেঁাছতো তো এক হাজার লেঠেল ওখানে হাজির হোতো সাথে সাথে। তখন ব্যাটারা বুঝতো মার কাকে বলে। খুদা কসম্, আজ থেকে তিন কুঁড়ি মুরগী পুষবো। এবার দেখবো পন্ডিতজী মহারাজ কি করে। ফের যদি ঐ ছোকরা কিছু গরম দেখায় তো কাজী সাহেব বলেছেন ওকে সাথে সাথেই জানাতে। বলেছেন, ঘরদোর কাচ্চাবাচ্চা ছেড়ে হয়তো ভাগতে হবে কিন্তু ওর হাড়মাস গুঁড়ো করে রেখে যাবো।

বুড়োটা জামিদকে সাথে করে কাজী জোরাবর হুসেনের দরজায় পেঁাছলো। কাজীসাহেব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। জামিদকে দেখেই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন—আল্লাহ্! তোমাকেই তো খুঁজছি। তুমি একা ওই বিধর্মীগুলোকে হয়রান করেছো। করবে নাই বা কেন, শরীরে মহম্মদের রক্ত বইছে। ওগুলোর খবর কী? শুনলাম সব কটা নাকি তোমার শুদ্ধি করানোর চেষ্টা করছিলো। তুমি ওদের সমস্ত ছক ওলট-পালট করে দিয়েছো। তোমার মতো ইমানদারদেরই তো ইসলামের আজ প্রয়োজন। তোমার মতো লোকেদের জন্যই তো ইসলাম নামের এত চাকচিক্য। কিন্তু মুশকিল হলো, গত এক মাস তুমি কোনো নিয়মকানুন মানোনি। বিয়ে হলেই মজা বুঝবে। এখন চাই একটা সুন্দরী বিবি আর ফোকটে কিছু পয়সাকড়ি, তাই না? আল্লাহ্! তোমার ভালো করুন।

সারাদিন ধরে মুসলমান মুরীদরা লাইন দিয়ে ওকে দেখে গেলো। জামিদকে একনজর দেখেই সবাই দুঃখ পেলো। সবাই ওর সাহস, গায়ের জোর আর ধর্মানুরাগের প্রশংসা করলো।

॥ চার ॥

বেশ রাত হয়েছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল কমে এসেছে। জামিদ কাজী সাহেবের ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করেছে। নিজের পাশের ঘরটাই ওকে ছেড়ে দিয়েছেন কাজী। কাজী সাহেবের কাছ থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা শুনে এসে শুতে যাবে ঠিক সে সময়েই দরজায় একটা টাংগা থামার আওয়াজ শুনতে পেলো ও। কাজী সাহেবের এক আত্মীয়ের আসার কথা। জামিদ ভাবলো সেই এসেছে হয়তো।

নীচে এসে দেখলো—একজন স্ত্রীলোক টাঙ্গা থেকে নেমে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আর টাঙ্গাওয়ালা ওর জিনিসপত্তর নামাচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি বাড়ির এধার ওধার দেখে বললো—না তো, আমার খুব ভালো ভাবে মনে আছে এটা ওনার বাড়ি নয়। মনে হচ্ছে তোমার ভুল হয়েছে।

টাঙ্গাওয়ালা—মেমসায়েবের বিশ্বাস হচ্ছে না। বললাম তো বাবুসাহেব বাড়ি পালটেছেন। উপরে চলুন না।

মহিলাটি একটু ভয় পেয়ে বললো—ডাকছোনা কেন? ডাকো।

টাঙ্গাওয়ালা—আসুন না মেমসায়েব। ডাকতে হবে কেন? আমি তো জানি এটাই সাহেবের বাড়ি। শুধু শুধু চিল্লিয়ে কি লাভ? বাবু হয়তো আরাম করছেন। আরামে ব্যাঘাত ঘটবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আসুন না, উপরে আসুন।

মহিলাটি উপরে চললো। পেছন পেছন উঠছে টাঙ্গাওয়ালা। হাতে জিনিস-পত্তর। জামিদ নিচে একটা আড়াল থেকে সবই দেখলো। এই রহস্য ওর মাথায় ঢুকছে না।

টাঙ্গাওয়ালার আওয়াজ শুনেই ছাদে বেরিয়ে এসেছেন কাজী সাহেব। আর সঙ্গে একজন মেয়েকে দেখেই ঘরের জানালাগুলো চারদিক থেকে বন্ধ করে খুঁটিতে ঝোলানো তরোয়ালটা নামিয়ে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

মহিলাটি সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠেই কাজী সাহেবকে দেখে ভয় পেয়ে গেলো। সে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে নামতে যাবে কিন্তু কাজী সাহেব লাফিয়ে তার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। এই ফাঁকে জামিদ আর টাঙ্গা-ওয়ালা দুজনেই উঠে এলো ওপরে। এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে জামিদ। রহস্যটা আরও রহস্যময় হয়ে গেলো ওর কাছে। এই বিদ্যার সাগর, ন্যায়ের ভাণ্ডার, নীতি, ধর্ম আর দর্শনের আধার কাজী সাহেব তখন এক অপরিচিত মহিলার ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। টাঙ্গাওয়ালার সাথে সেও কাজী সাহেবের ঘরে ঢুকে গেলো। কাজী সাহেব মহিলার দুটো হাতই ধরে রেখেছেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলো টাঙ্গাওয়ালা।

টাঙ্গাওয়ালার দিকে রক্তচোখে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি বললো—কেন তুই আমাকে এখানে এনেছিস?

কাজী সাহেব তরোয়ালটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—আগে বসো, আরাম করো, তারপর সব জানতে পারবে।

মহিলা—তোমাকে দেখে তো কোন মৌলভী বলে মনে হচ্ছে। অন্যের মেয়ে-বৌকে জবরদস্তি ঘরে বন্ধ করে তার সতীত্ব নষ্ট করতে তোমার খোদা তোমাকে শিখিয়েছে নাকি?

কাজী—হ্যাঁ। খোদার হুকুম, বিধর্মীদের ইসলামের রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে। আর নিজের ইচ্ছেয় না এলে, জবরদস্তিতে।

মহিলা—ঠিক এভাবে যদি তোমার বৌ-মেয়েকে ধরে নিয়ে অন্যেরা সতীত্ব নষ্ট করে, তবে ?

কাজী—এ তো আকছার হচ্ছে। তোমরা আমাদের সাথে যা করবে আমরাও ঠিক সেভাবে তার বদলা নেবো। আর আমি তো তোমার সতীত্ব নষ্টও করছি না, শুধু তোমাকে আমাদের ধর্মমতে নিয়ে আসবো। ইসলাম ধর্ম নিলে তো সতীত্ব বাড়ে, কমে না। হিন্দুরা তো জোর করে আমাদের ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এই মুলুকে আমাদের নিশান মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে ওরা। লোভ দেখিয়ে, চাতুরী আর জবরদস্তিতে মুসলমানদের ওরা দিন দিন ভিখিরি বানাচ্ছে আর এসব দেখেও মুসলমানেরা চুপচাপ বসে থাকবে ?

মহিলা—হিন্দু কখনো এরকম অত্যাচার করতে পারে না। হয়তো তোমাদের এই অত্যাচার দেখে অশিক্ষিত কিছু লোক এরকম বদলা নিতে শুরু করেছে ; কিন্তু কোন সাচ্চা হিন্দু এসব পছন্দ করে না।

কাজী সাহেব কিছু একটা ভেবে বললেন—প্রথম প্রথম বদ মুসলমানেরা এ ধরনের কাজকর্ম করতো। কিন্তু ভালো মুসলমানরা এ ধরনের কাজকর্মকে নিন্দেই করতো। তারা চেষ্টা করতো এগুলো রুখতে। শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির সাথে সাথে ঐ ধরনের গুণ্ডামী নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যেতো কিন্তু এরপরে সারা হিন্দু জাতটাই তো আমাদের শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তখন এছাড়া আমাদের সামনে আর কোন রাস্তা ছিল কি ? আমরা কমজোরী, সেজন্য নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই নীচ কাজকর্ম করতে শুরু করলাম। কিন্তু তুমি এতো ভয় পাচ্ছ কেন ? তোমার কোন রকম কষ্ট হবে না এখানে। ইসলাম মেয়েদের যা সম্মান করে তা অন্য কোন ধর্ম করে না। আর মুসলমান পুরুষ তো নিজের বিবির জন্য জান দিতে পারে। আমার এই নওজোয়ান বন্ধুর (জামিদ) সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো। ব্যস, সুখে শান্তিতে জীবন কাটাবে।

মহিলা—তোমাকে আর তোমার ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। কুত্তার জাত। এ-ধরনের নোংরা কাজ ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না তোমরা। আমাকে ছেড়ে দাও; নইলে এক্ষুণি চ্যাঁচাব। তোমার মৌলভীপনা ঘুচবে তখন।

কাজী—যদি মুখ খোলো তবে তোমার জান নিয়ে নেবো আমি। এবার যা ভালো বোঝো করো।

মহিলা—জীবনের চেয়েও সতীত্ব রক্ষা বড়ো জিনিস। তুমি আমার জান নিতে পারো কিন্তু আমাকে ছুঁতে পারবে না।

কাজী—অহেতুক জিদ করছো কেন ?

মহিলা দরজার কাছে গিয়ে বললো—ভালো চাও তো দরজা খোলো বলছি।

জামিদ এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। মহিলা দরজার দিকে যাচ্ছে দেখে কাজী সাহেব উঠে ওর হাত ধরে টানলো নিজের দিকে। জামিদ চকিতে দরজা খুলে কাজী সাহেবকে বললে—ওঁকে ছেড়ে দিন।

কাজী—কি বলছো তুমি ?

জামিদ—কিছু না। বলছি ওকে ছেড়ে দিন।

তবুও মহিলার হাত ছাড়লেন না কাজী সাহেব। আর টাঙ্গাওয়ালাও এগিয়ে গেলো মহিলাকে ধরার জন্য। নিমেষে কাজী সাহেবকে জোরে একটা ধাক্কা মেরে মহিলাটির হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলো জামিদ। টাঙ্গাওয়ালা পিছু নিয়েছিলো কিন্তু জামিদ ওকে এতো জোরে ধাক্কা মারলো যে ও মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। আর চোখের পলক ফেলার আগেই দুজনে, জামিদ আর মহিলাটি নেমে এলো রাস্তায়।

জামিদ—আপনার বাড়ি কোন মহল্লায় ?

মহিলা—আহিয়াগঞ্জে।

জামিদ—চলুন, আমি আপনাকে পেঁাছে দিচ্ছি।

মহিলা—খুব ভালো হয়, এর থেকে আর কি ভালো হতে পারে। আমি জীবনে আপনার এই উপকার ভুলবো না। আপনি আমার সতীত্ব রক্ষা করেছেন, নাহলে আজ আমার কি দশাই না হতো। আজ বুঝতে পারছি ভালো মন্দ সব জায়গাতেই আছে। আমার শ্বশুরের নাম পণ্ডিত রাজকুমার।

সে সময়েই রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গাকে আসতে দেখা গেলো। জামিদ মহিলাকে টাঙ্গাতে উঠিয়ে নিজে ঠিক যখন উঠতে যাবে তখনই কাজী সাহেব ওপর থেকে একটা লাঠি ছুঁড়লো ওকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ওটা টাঙ্গার গায়ে লেগে মাটিতে পড়লো। জামিদ টাঙ্গায় উঠে বসামাত্রই টাঙ্গা ছেড়ে দিলো।

আহিয়াগঞ্জে পণ্ডিত রাজকুমারের বাড় খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। জামিদ বাইরে থেকে ডাকতেই ভয়ার্তভাবে তিনি বেরিয়ে এলেন। মহিলাকে দেখে বললো—কোথায় ছিলে ইন্দিরা ? স্টেশনে তো কোথাও তোমাকে দেখলাম না। আমার অবশ্য যেতে কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিলো। তোমার এত দেরী হোলো কেন।

ইন্দিরা ঘরে পা দিয়ে বললো—সে অনেক অনেক কথা। একটু জিরিয়ে নি, বলবো, সব বলবো। শুধু এটুকু শুনে রাখুন যে এই মুসলমান ভদ্রলোক না থাকলে আজ আমাকে কেউ বাঁচাতে পারতো না।

পণ্ডিতজী সমস্তটা শুনবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। ইন্দিরাকে সাথে নিয়ে অন্দরে ঢুকে গেলেন। পরে মিনিট খানেক বাদেই বাহিরে এসে জামিদকে বললেন—ভাই সাহেব, আপনাকে দেখে আমি বুঝতে পারিনি। এখন আপনাকে দেখে আমি যেন আমার ইষ্ট দেবতাকেই দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানানো ধৃষ্টতামাত্র। আসুন না, ভেতরে বসুন।

জামিদ—না পণ্ডিতজী, বসবো না, এবার আমাকে যেতে অনুমতি দিন।

পণ্ডিত—আপনার এই মহান উপকারের বিনিময়ে আপনাকে কি দিতে পারি আমি ?

জামিদ—আপনি শুধু এটুকুই করতে পারেন যে এই নোংরা ঘটনাটার বদলা অন্য কোন গরীব মুসলমানের ওপর নেবেন না। এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

এই বলে জামিদ বিদায় নিলো। তারপর সেই অন্ধকার রাতে শহর ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেলো জামিদ। শহরের বিষাক্ত বাতাসে ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। যত তাড়াতাড়ি পারে শহর ছাড়িয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরতে চাইছিলো জামিদ যেখানে এখনো ধর্ম মানে—সহানুভূতি, প্রেম আর সৌহার্দ্য। এখানকার ধর্ম আর ধার্মিক লোকজনের ওপর ঘেন্না এসে গেছে তার।

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

ইস্তফা

আপিস-বাবু এক আজব জীব। ধরুন, কোন মজদুরকে চোখ রাঙালেন, সে চোখ পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ; কুলীর ওপর মেজাজ দেখালেন, মাথা থেকে জিনিস-পত্তর ফেলে দিয়ে উল্টে চোটপাট করবে ; কোন ভিখিরিকে ধমক দিলেন, সে গালাগাল দিতে দিতে চলে যাবে। এমন কি গাধাকে বেশী খাটালে সেও দু'পা ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু বেচারী আপিসের বাবুকে আপনি ধমকান, চোখ রাঙান, অপমান করুন, মারধোর করুন, টু শব্দটি ও করবে না। নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর এদের কী ভীষণ নিয়ন্ত্রণ ! কোন সংযমী সাধুর পক্ষেও বোধহয় এতোটা সম্ভব নয়। আত্মতৃপ্তির এক শরীরী মূর্তি, ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা, খাঁটি আজ্ঞাবহ দাস—আসলে মানুষের সমস্ত ভালো গুণই এদের ভেতরে মজুদ। কখনো সখনো পোড়ো মন্দিরের ভাগ্যও খোলে। দেওয়ালীর দিন ওখানেও আলো জ্বলে। বরষা-বাদলার দিনে মধুর হয়ে ওঠে ঐ চত্বরটা। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ উপভোগে সেও ভাগ বসায়। কিন্তু এই গরীব বাবুর নসীবের কোন বদল হয় না। এদের অন্ধকার জীবনে এক ঝলক আলোও কখনো চমকায় না। এদের রোগা করুণ মুখে হাসির দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। এদের জন্য বারোমাস মরা শ্রাবণ, টইটুম্বুর ভাদ্র আসে না। ঠিক এই ধরনেরই আজব জীব লালা ফতহচন্দ।

কথায় বলে, নামের প্রভাব চরিত্রের ওপরেও পড়ে। কিন্তু ফতহচন্দের বেলায় একথা একদম অচল। 'ফতহচন্দ' কথার অর্থ 'চন্দ্র বিজয়ী'। কিন্তু ওকে যদি 'হার চন্দ' বলা হয় তবে বোধহয় ঠিক বলা হবে। আপিসে হার, জীবনে হার, বন্ধুদের কাছে হার—জীবনে শুধু পরাজয় আর পরাজয়। তিনটে মেয়ে, কোন ছেলে নেই। ভাই একটাও বেঁচে নেই। দু-দুটো ভাইবো বেঁচে আছে। গাঁটে কড়ি নেই অথচ দয়া ভালবাসার অন্ত নেই। আসল বন্ধু কেউ নেই—যার সাথে বন্ধুত্ব হয় সেই ধোঁকা দেয়। স্বাস্থ্যও ভালো নয়, বত্রিশ বছর বয়সেই চুল পাকতে শুরু করেছে। চোখে কম দেখে, হজমের গণ্ডগোল, তোবড়ানো গাল, শরীরটা কুঁজো হয়ে গেছে। না আছে মনে সাহস, না শরীরে জোর। ঠিক নটায় আপিসে যায়, সন্ধ্যে ছটায় ফেরে। তারপর আর ঘর থেকে বেরোনোর শক্তি থাকে না। দুনিয়ায় কি ঘটছে তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ওর ইহলোক পরলোক সব কিছুই আপিস। আপিস-বাড়ি করেই দিন কাটে। ধর্মকর্মে কোন আসক্তি নেই। নেই কোন ধরনের মনোরঞ্জনে ঝোঁক, না আছে কোন খেলাধুলায়। শেষবার তাস খেলেছিলো সেও এক যুগ আগে।

॥ দুই ॥

শীতের দিন। মেঘলা আকাশ। ফতহচন্দ সাড়ে পাঁচটায় আপিস থেকে ফেরার আগেই বাতি জবলে উঠেছে। আপিস থেকে ফিরে ও কারোর সাথে কথা বলে না। চুপচাপ খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। তারপর পনেরো-বিশ মিনিট মড়ার মতো পড়ে থাকার পর ওর মুখ দিয়ে প্রথম আওয়াজ বেরোয়। অন্যদিনের মতো আজও ওরকম শুয়েছিলো কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই বাইরে থেকে কে ডাকলো। ছোটো মেয়েটা গিয়ে দেখলো আপিস থেকে চাপরাশী এসেছে। স্বামীর মুখহাত ধোওয়ার লোটা-গ্লাস মাঝছিলো সারদা। বললো—জিজ্ঞেস করে আয় তো, কি ব্যাপার। এইতো সবে ঘরে ফিরলো। এখনই আবার ডাকাডাকি কিসের ?

চাপরাশী জানালো—সাহেব ডেকেছেন, এখুনি যেতে হবে। খুব জরুরী কাজ।

আরাম করা ঘুচলো ফতহচন্দের। মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে ?

সারদা—কিছু না, আপিসের চাপরাশী এসেছে।

একটু ভয় পেয়ে গেছে ফতহচন্দ। বললো—আপিসের চাপরাশী ! কি, সাহেব ডেকেছে নাকি ?

সারদা—হ্যাঁ। ডাকলেই হলো আর কি ? কি ধরনের সাহেব তোমার ? যখন তখন এসে বলবে, সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। ভোরবেলা বেরিয়ে এইমাত্র ফিরলো, আবার ডাকতে চলে এসেছে।

একটু ভেবে ফতহচন্দ বললো—একটু জিজ্ঞেস করো না কিসের জন্য ডেকেছে। সব কাজ শেষ করেই তো ফিরলাম। দেখি···

সারদা—না, অন্তত জলখাবারটা খেয়ে যাও। নইলে চাপরাশীর সাথে কথা বলতে বলতে খাওয়ার কথাও ভুলে যাবে।

এরপর একটা ডিসে করে কিছু ডালমুট আর ভুজিয়া নিয়ে আসে সারদা। ফতহচন্দ উঠে পড়ছিলো কিন্তু খাবারের ডিস আর চা দেখে বসে পড়লো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো—মেয়েদের কিছু দিয়েছো তো ?

রেগে জবাব দিলো সারদা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়েছি, তুমি এবার খাও তো।

ছোট মেয়েটা হঠাৎ কোত্থেকে এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। সারদা আরও রাগে—'অ্যাই, কোত্থেকে জুটলি এসে ? যা, বাইরে খেল্‌গে যা।'

ফতহচন্দ—আহা, থাকুক না, বকছো কেন ? এদিকে আয় চুন্নী, নে, ডালমুট খা।

চুন্নী মার দিকে তাকিয়ে ভয়ে বাইরে ছুটে পালালো।

ফতহচন্দ—কেন ওকে ভাগিয়ে দিলে ? অল্প একটু হাতে দিলেই তো খুশী হয়ে চলে যেতো।

সারদা—এইটুকু তো খাবার, তাও তুমি বিলোবে নাকি ? ওকে দিলে আবার বাকী দুটোও তো এসে ছুঁক ছুঁক করবে। তখন কাকে দেবে ?

চাপরাশী বাইরে থেকে তাড়া দেয়—বাবুজী, বড়ো দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সারদা—বলে দাও না তুমি এখন যেতে পারবে না।

ফতহচন্দ—কি করে বলি। রুজি রোজগারের ব্যাপার।

সারদা—তা বলে জান দিয়ে দেবে নাকি? আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতে পাও না? দেখে মনে হচ্ছে ছ'মাসের এক রুগী।

ডালমুট দু-তিন মুঠ মুখে পুরে গোগ্রাসে খেলো। ঢকঢক করে জল গিললো এক গ্লাস। তারপর বাইরে দৌড়ে এলো। সারদা পান বানিয়ে দেবার সময় পেলো না।

তাকে দেখে চাপরাশী বলে ওঠে—বাবুজী! বড়ো দেরী করে ফেললেন। একটু পা চালিয়ে চলুন নয়তো গেলেই সাহেব একচোট নেবে।

দু'কদম দৌড়েই ফতহচন্দ বললো—যাব তো ভাই কিন্তু আমি মানুষ তো। রাগলে, দাঁত খিঁচোলে কি করা যাবে। দৌড়োতে পারবো না, সাহেব তো এখন বাংলোতে, না?

চাপরাশী—আচ্ছা তো! আপিসে থাকবেন কিসের জন্যে!

চাপরাশীর হাঁটার অভ্যেস আছে। আর বেচারী বাবু ফতহচন্দ জোরে হাঁটতে পারে না। তাল রাখতে গিয়ে একটু দূর গিয়েই হাঁফিয়ে উঠলো। ও নিজেও তো পুরুষমানুষ তাই কি করে বলবে ভাই একটু আস্তে চলো। হিম্মত দেখিয়ে চলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে আর আদ্দেক রাস্তাতেই ওর পা যেন আর চলে না। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। মাথা ঘুরছে। চোখে ধাঁধা দেখছে।

হেঁকে বললো চাপরাশী—একটু জোরে পা চালান, বাবুজী।

হাঁফাতে হাঁফাতে ফতহচন্দ উত্তর দিলো—তুমি যাও, আমি আসছি। তারপর আর না পেরে রাস্তার ধারের রেলিং-এ ধপাস করে বসে পড়লো। দু হাতে মাথা চেপে ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলো ফতহচন্দ। তার এই অবস্থা দেখে চাপরাশী আর দেরী করলো না, হনহন করে হেঁটে চললো। ফতহচন্দের ভয় হোল শয়তানটা গিয়ে সাহেবকে কি না কি লাগায়—তাহলেই তো গণ্ডগোল। হাতে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো। হাঁফ উঠে গেছে। এসময় একটা শিশু এসেও ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে দিতে পারবে। যা হোক, কোন মতে টেনে হিঁচড়ে সাহেবের বাংলোয় পেঁছুল ফতহচন্দ। সাহেব বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। গেটের দিকে বারবার তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে রাগে ফুঁসছিলেন।

চাপরাশীকে দেখে গর্জে উঠলেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

চাপরাশী সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললো—হুজুর! উনি না আসলে আমি কি করে আসি। আমি তো দৌড়ে চলে এসেছি।

সাহেব আবার ধমকে উঠলেন—বাবু কি বলেছে?

চাপরাশী—আসছে হুজুর, বাড়ি থেকে বেরোলই তো ঘণ্টা খানেক বাদে।

ততক্ষণে ফতহচন্দ ওখানে পেঁাছেছে। এসেই মাথা নুইয়ে সেলাম জানায় সাহেবকে।

একটু তেতেই সাহেব বললো—এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

সাহেবের এই চেহারা দেখে রক্ত শুকিয়ে গেলো ফতহচন্দের। বললো—হুজুর, এইমাত্র তো আপিস থেকে ফিরেছি। চাপরাশী গিয়ে ডাকামাত্রই আমি বেরিয়ে এসেছি।

সাহেব—মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা বলছো তুমি। আমি এক ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়ে।

ফতহচন্দ—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলি না। আসতে যা দেরী হয়েছে। কিন্তু ঘর থেকে আমি সাথে সাথেই বেরিয়েছি।

হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে সাহেব বললেন—চোপ্ রও, শুয়োরের বাচ্চা। আমি এক ঘণ্টার ওপর এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কান ধরো।

অপমানটা সহ্য করলো ফতহচন্দ! বললো—হুজুর দশ বছর আমি কাজ করছি। কখনও……।

সাহেব—চোপ্, শুয়োরের বাচ্চা! বলছি না কান ধরতে।

ফতহচন্দ—হুজুর, আমি কি অন্যায়টা করলাম ?

সাহেব—চাপরাশী! এই শুয়োরটার কান দুটো মলে দাও তো।

বিনীত কন্ঠে চাপরাশী জবাব দেয়—হুজুর, উনি তো আমার অফিসার, ওঁর কান ধরি কি করে!

সাহেব—আমি বলছি এর কান ধরো, নাহলে চাবুক পড়বে তোমার পিঠে।

চাপরাশী—হুজুর, আমি এখানে চাকরী করতে এসেছি, মার খেতে নয়। আমারও ইজ্জত আছে। জানি, আপনি আমার চাকরী খেতে পারেন। আপনার সমস্ত হুকুম মানতে রাজী আছি কিন্তু কারো ইজ্জত নিতে পারবো না। চাকরী-তো চার দিনের। চার দিনের জন্যে জীবনভর একজনের শত্রু হয়ে থাকবো ?

রাগে দিশেহারা হয়ে গেলো সাহেব। চাবুকটা নিয়ে দৌড়ে এলো। বেগতিক দেখে চাপরাশী ওখান থেকে সরে গেলো। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ফতহচন্দ। চাপরাশীকে না পেয়ে ওর কাছে এসে কান দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো সাহেব। বললো—অ্যাই, শুয়োরের বাচ্চা! বেয়াদবী হচ্ছে, না ? এখুনি অফিস থেকে ফাইলটা নিয়ে এসো। যাও!

কানে হাত বোলাতে বোলাতে ফতহচন্দ বললো—ফাইল, কিসের ফাইল হুজুর ?

সাহেব—ফাইল! কিসের ফাইল ? ন্যাকামী হচ্ছে ? কালা নাকি ? ফাইল চাচ্ছি শুনতে পাচ্ছো না ?

এতক্ষণে একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়েই ফতহচন্দ বললো—কোন ফাইলটা চাই-ছেন আপনি ?

সাহেব—সেই ফাইলটা যেটা আমি চাচ্ছি। ওই ফাইলটাই আনো। এখুনি আনো।

বেচারী ফতহচন্দের আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হোলো না। এমনিতেই বদমেজাজী সাহেব, হুকুম চালানোই অভ্যেস, এরপর তো মদের নেশা আছেই। চাবুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বেচারী কি করবে ? আস্তে আস্তে আপিসের দিকেই রওনা হয় সে।

সাহেব ধমকে ওঠে—যাও, দৌড়ে যাও।

ফতহচন্দ—হুজুর, দৌড়তে পারছি না।

সাহেব—আচ্ছা, বড়ো আলসে হয়ে গেছো না ? দৌড়োও, (পেছন থেকে ধাক্কা মেরে) তাও দৌড়বে না তুমি ?

বলেই চাবুকটা আনতে চলে গেলো সাহেব। আপিসের বাবু হলেও ফতহচন্দ মানুষ তো। শরীরে তাকত থাকলে বদমাশটার রক্ত খেতো ও। হাতে কোন হাতিয়ার থাকলে সাথে সাথে তা চালিয়ে দিতো। কিন্তু এ অবস্থায় মার খাওয়াই ওর কপালে লেখা। ও পিছুপানে হটতে হটতে ফটকের বাইরে সড়কের ওপর চলে এলো

॥ তিন ॥

আপিসে গেলো না ফতহচন্দ। গিয়ে কিই বা করবে সে ! সাহেব ফাইলের নামটা বলেনি। নেশায় সব ভুলে গেছে। আস্তে আস্তে বাড়ির দিকেই হাঁটতে থাকে কিন্তু এই বেইজ্জতী ওর পায়ে যেন শেকল পরিয়ে দিয়েছে। না হয় সাহেবের মতো ওর গায়ে জোর নেই, হাতেও তার না হয় কোন কিছু ছিলো না, তাই বলে কি কথাগুলোর জবাবও দিতে পারতো না ? পায়ে তো জুতো জোড়াও ছিলো। ওই জুতো দিয়েই তো জবাব দিতে পারতো। এই অপমানটা ওকে কেন করলো ?

কিন্তু কিইবা করতো ও ? সাহেব যদি রেগেমেগে ওর ওপর বন্দুকচালাতো কি অঘটনই না ঘটতো। সাহেবের হয়তো দু'এক মাসের জেল হোতো বা দু'চারশো টাকা জরিমানা। কিন্তু ফতহচন্দের পরিবারটা তো মাটিতে মিশে যেতো। তার বৌ বাচ্চার দেখাশোনা করার মতো দুনিয়ায় আর কে আছে ? কার দরজায় গিয়ে ওরা দাঁড়াবে ? কিছুদিনের সংসার চালানোর টাকাও যদি ওর হাতে থাকতো তবে এই অপমান ও কিছুতেই সইতো না। না হয় মরেই যেতো, তবু ঐ শয়তানটার কিছু সাজা তো হোতোই। নিজের জন্য ওর কোন ভয় নেই। নিজের সুখ ইচ্ছাও কোন প্রশ্ন নয়। ওর শুধু ভয়, ও গেলে পরিবারটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

নিজের কমজোরী শরীরটার দিকে তাকিয়ে দুঃখ হোল ফতহচন্দের। এত দুঃখ আর কখনো পায়নি। শুরুতেই ও যদি শরীরটার দিকে নজর দিতো, লকড়ী চালাতে শিখতো, ব্যায়াম করতো, তবে এই শয়তানটার হিম্মত হতো ওর কান ধরবার ! ওর চোখ উপড়ে নিতো না ও ? কমসে-কম ঘর থেকে একটা ছুরি সঙ্গে নিয়ে রাখা দরকার। আর না হলে দু-চারটে ঘুষি তো মেরে দাও, পরে দেখা যাবে। বড়ো জোর জেলে দেবে, এর বেশী আর কি !

একটু একটু করে যত এগোয় তত নিজের ভীরুতা আর মূর্খামির জন্য রাগে শরীরটা চিড়বিড় করে ওঠে। ভাবে, হঠাৎ করে যদি দু-চারটে থাপ্পড় কষিয়ে দিতো, কি হোত। সাহেবের বেয়ারা খানসামারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদম পিটতো। বাচ্চাগুলোর যা হবার হোত, ব্যস্। সাহেব তবু এটুকু তো বুঝতে পারতো যে গরীবের ওপর অত্যাচার করা ঠিক নয়। আজ যদি আমি মরে যাই তো কি হবে? তখন কে আমার বাচচাদের দেখবে? তাহলে ওদের যা কিছু বিপত্তি তা আজই না হয় হোত, কি ক্ষতি ছিলো।

শেষের এই বিশ্লেষণ ফতহচন্দের মনে এতো আনন্দ এনে দিলো যে বদলা নেবার জন্য সাহেবের বাংলোর দিকে ও ফিরে চললো। কিন্তু হঠাৎ মনে হোল যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কে জানে, সাহেব হয়তো বাংলো থেকে ক্লাবে চলে গেছে। ঠিক তখুনি মনে পড়লো সারদা আর মেয়েদের কথা। ঘরের দিকে ফিরে চললো ফতহচন্দ।

॥ চার ॥

ঘরে ঢুকতেই সারদা জিজ্ঞেস করলো—কেন ডেকেছিলো? বড়ো দেরী করলে।

খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বললো ফতহচন্দ—মদ খেয়ে মাতলামো করছিলো, আর কি। শয়তানটা আমাকে গালাগাল দিলো, অপমান করলো। বার-বার ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন, কেন দেরী হলো? শয়তানটা চাপরাশীকে দিয়ে আমার কান ধরাতে চেয়েছিলো।

রেগে উঠলো সারদা—তুমি জুতো খুলে মারোনি কুকুরটাকে?

ফতহচন্দ—চাপরাশীটা ভালো লোক। সাফ সাফ জবাব দিয়ে দিলো—হুজুর, আমার দ্বারা ওকাজ হবে না। ভদ্রলোকের ইজ্জত কাড়বার জন্য আমি চাকরী করি না। তখুনি সেলাম জানিয়ে চলে গেলো।

সারদা—ঠিক করেছে। তুমি ওই সাহেবটাকে কথা শোনালে না?

ফতহচন্দ—শোনাইনি মানে—একটু বেশীই শুনিয়েছি। তাই ব্যাটা ছড়ি উঁচিয়ে দৌড়ে এলো—আমিও জুতো তুললাম। ও ছড়ি দিয়ে মারলো আমাকে, আমিও জুতো কষিয়েছি।

খুশী হয়ে সারদা বললো—সত্যি? ওর মুখটা বোধহয় এ্যাত্তোটুকু হয়ে গিয়ে-ছিলো।

ফতহচন্দ—চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো কেউ ঝাঁটা পেটা করেছে।

সারদা—খুব ভালো কাজ করেছো। আরও মারা উচিত ছিলো। আমি হলে জান না নিয়ে ছাড়তাম না।

ফতহচন্দ—মেরে না হয় ফেললাম কিন্তু তারপর পরিণাম কি হবে ভেবেছো? এতেই দ্যাখো কপালে কি জোটে! চাকরী তো যাবেই, হয়তো জেলও খাটতে হতে পারে।

সারদা—কেন জেল হবে শুনি ? দুনিয়ায় কি ভালোমানুষ কেউ নেই নাকি ? ও কেন গালি দিলো, ছড়ি দিয়ে মারলো ?

ফতহচন্দ—কে আমার কথা শুনবে ? আদালত তো ওর পক্ষেই কথা বলবে।

সারদা—সাজা হবে তো হোক। কিন্তু দেখো আর কোন সাহেবের এরপর আর সাহস হবে না কোন বাবুকে গালাগাল দেয়। তোমার উচিত ছিলো, যখনই ওর মুখ দিয়ে গালাগাল বেরিয়েছে তখুনি জুতো মেরে হিসেব চুকিয়ে দেওয়া।

ফতহচন্দ—তাহলে এ যাত্রায় জান নিয়ে ফিরে আসতে হোত না। নির্ঘাৎ গুলি করে দিতো।

সারদা—দেখা যেতো।

একটু হেসে বললো ফতহচন্দ—তখন তোমরা কোথায় যেতে ?

সারদা—যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছে। মানুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিস ইজ্জত। ইজ্জত না থাকলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায় না। ওই শয়তানটাকে মেরে এসেছো শুনে আমি গর্বে ফুলে উঠেছি। মার খেয়ে আসলে তোমার ছায়াকেও ঘেন্না করতাম। হয়তো মুখে কিছু বলতাম না কিন্তু মনে মনে তোমার ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলতাম। এখন মাথার ওপর যা খুশি আসুক না কেন, হাসিমুখে মেনে নেব··· । কোথায় যাচ্ছো, আরে শোন, শোন, কোথায় যাচ্ছো ?

পাগলের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ফতহচন্দ। সারদা চ্যাঁচাতে লাগলো। ও আবার সাহেবের বাংলোর দিকে যাচ্ছে। ভয়ে নয়, মাথা উঁচু করে। চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট। পায়ের সেই যন্ত্রণা বা চোখের ঝাপসা ভাব এখন আর নেই। সারা চেহারা পাল্টে গেছে। সেই রোগা পাতলা শরীর, তোবড়ানো মুখের আপিসের বাবুর এখন অন্য চেহারা—পুরুষালী ভাব এসেছে, সাহস আর ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। প্রথমে এক বন্ধুর ঘরে গিয়ে একটা ডাণ্ডা চেয়ে নিলো, তারপর সোজা সাহেবের বাংলোর পথ ধরলো।

এখন নটা বাজে। সাহেব খাওয়ার টেবিলে। আজ কিন্তু সাহেবের সামনে সোজা চলে যেতে কোন অনুমতি নিতে হয়নি ফতহচন্দের। খানসামা ঘরের বাইরে গেলে চিক উঠিয়ে ও ভেতরে ঢুকে গেলো। ঘরদোর পরিষ্কার, ঝিকমিক করছে। মেঝেতে গালচে পাতা। এতো দামী গালচে ফতহচন্দের বিয়ের সময়েও পাতা হয়নি। ওকে দেখে সাহেব বেশ রেগেমেগেই বললো—এখানে কেন এলে ? বাইরে যাও, না বলে ভেতরে ঢুকে পড়লে কেন ?

ফতহচন্দ ডান্ডাটা দোলাতে দোলাতে বললো—তুমি ফাইল চেয়েছিলে না ? ওটাই নিয়ে এসেছি। খেয়ে নাও, তারপরে দেখাবো'খন। ততক্ষণ আমি বসে আছি। ভালো করে খাও বাছাধন—শেষ খাওয়া খেয়ে নাও। পেট ভরে খেয়ে নাও।

সাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ভয়ে আর রাগে ফতহচন্দের দিকে তাকিয়ে ও কেঁপে উঠলো। ফতহচন্দের চেহারায় শপথের আগুন ঝলসাচ্ছে। সাহেব বুঝলো

লোকটা এসপার-ওসপার করার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছে। শক্তিতে ফতহচন্দ ওর কাছে নস্যি। কিন্তু সাহেব স্থির নিশ্চিত যে ও ইঁটের জবাব পাথর দিয়ে নয় লোহা দিয়ে দেবার জন্য তৈরী। ফতহচন্দকে ভালো মন্দ যদি কিছু বলেই থাকে তাই বলে কি ও ডাণ্ডা নিয়ে আসবে ? আশ্চর্য ! লড়াই হলে ডাণ্ডাধারীই জিতবে। বসে বসে মার খাওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কুকুরকে আপনি ডাণ্ডা দিয়ে মারুন, ঠোকর দিন, যা খুশি করুন ; কিন্তু করতে পারেন ততক্ষণই যতক্ষণ না ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। একবার উল্টো তাড়া করলে আপনার সাহস কোথায় পালায়, দেখবেন ! সাহেব বাহাদুরের হালও তো প্রায় তাই। যতক্ষণ অব্দি ধারণা ছিলো ফতহচন্দকে গালাগাল দিলে চড় থাপ্পড় মারলে, চাবুক চালালে, লাথি মারলেও ও হাসিমুখে মেনে নেবে, ততক্ষণ নিজে শের ; কিন্তু ও এখন পা ঠুকে, ডাণ্ডা নিয়ে, বেড়ালের মতো ঘাড় ফুলিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। মুখ দিয়ে একটা খারাপ শব্দ বেরোলেই ডাণ্ডা চালিয়ে দেবে। বরখাস্ত করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে সাহেব ? মারতে গেলে উল্টে মার খাওয়ারও ভয় আছে। এরপর ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার আশঙ্কা—হয়তো নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে ফতহচন্দকে জেলে পুরে দেবে ; কিন্তু ঝামেলা আর বদনামের হাত থেকে তো বাঁচাতে পারবে না। বুদ্ধিমান ধুরন্ধর লোকের মতো সাহেব ফতহচন্দকে বললো—ওহো ! বাবুজী বুঝেছি আমি কেন আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি এমন কি আপনাকে বলেছি ? আপনি আমার ওপর রেগে গেছেন কেন বুঝতে পারছি না তো ?

ক্রুদ্ধ ফতহচন্দ বললো—তুমি মাত্র আধ ঘন্টা আগে আমার কান মলেছো, অশ্রাব্য গালাগাল দিয়েছো। কি হে সাহেব, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে ?

সাহেব—আমি আপনার কান মলেছি। বলেন কি ! হা-হা-হা···। আমি আপনার কান মলেছি ? হা-হা-হা···। কি মস্করা করছেন বাবুজী ! আমি কি পাগল হয়েছি নাকি ?

ফতহচন্দ—তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি ? চাপরাশী সাক্ষী। আপনার চাকরবাকরেরাও দেখেছে।

সাহেব—আজকের ঘটনার কথা বলছেন ?

ফতহচন্দ—এইতো কিছুক্ষণ আগে। আধ ঘন্টাও হয়নি। আমাকে ডেকে পাঠালেন তারপর বিনা কারণে কান মলে দিলেন, ধাক্কা মারলেন।

সাহেব—আ বাবুজী, তখন আমি নেশাতে ছিলাম। বেয়ারাটা অনেকটা ঢেলে দিয়েছিলো। আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। মাই গড্, কি সব যাচ্ছেতাই হয়ে গেলো। কিছুই খেয়াল করতে পারছি না।

ফতহচন্দ—মাতাল অবস্থায় তুমি যদি আমার ওপর গুলি চালাতে, তাহলে কি বলছো আমি মরতাম না ? তুমি যদি নেশার ঝোঁকে এসব করো আর মনে করো নেশায় ছিলে বলে সব মাফ হয়ে যাবে তবে এখন আমারও নেশা চড়ে গেছে।

এবার যা বলছি শোনো, নিজের কান ধরে ক্ষমা চাও যে আর কখনও কোন ভালো মানুষের সঙ্গে এরকম অসভ্য ব্যবহার করবে না। ধরবে, না আমি গিয়ে মলে দেবো ? মাথায় ঢুকছে না ? এদিক ওদিক তাকিয়ে লাভ নেই। জায়গা থেকে নড়লেই ডাণ্ডা চালাবো। যদি মাথা ফাটে আমার দোষ নয়। যা বলছি তাই করো, ধরো, কান ধরো !

হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সাহেব বললো—তুমি বেশ মজা করছো বাপু ! যদি খারাপ কিছু আমি বলে থাকি তোমার কাছে মাফ চাইছি।

ফতহচন্দ—(ডান্ডা তুলে) ওসব ছাড়ো ! কান ধরো ! এত সহজে এই অপমান মেনে নেব না সাহেব। চেয়ার থেকে চকিতে উঠে ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিতে চাইলো কিন্তু ফতহচন্দ বেশী সতর্ক ছিলো। যেই সাহেব টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তক্ষুণি ডাণ্ডাটা চালিয়ে দেয় ফতহচন্দ। সাহেবের মাথায় টুপি ছিলো না। আঘাতটা মাথাতেই লাগে। মিনিট খানেক হাত দিয়ে মাথাটা চেপে রাখার পর বললো—তোমাকে বরখাস্ত করবো।

ফতহচন্দ—চাকরির পরোয়া করি না আমি। কিন্তু আজ তোমাকে কান না ধরিয়ে নড়বো না। কান ধরো, বলো আর কখনো কোনো ভালো লোকের সাথে বেয়াদবী করবে না। নইলে আবার মারবো আমি।

বলেই ডাণ্ডাটা তুললো ফতহচন্দ। প্রথম চোটটাই সাহেব ভুলতে পারছে না। কানে হাত রেখে বললো—এবার আপনি খুশি তো ?

'আর কখনো কাউকে গালাগাল দেবে না তো ?'

'না, কখনো না।'

'আর যদি কখনো এরকম করো, মনে রাখবে, আমি আশেপাশেই আছি।'

'আর কাউকে গালাগাল দেবো না।'

'বেশ ভালো কথা। যাচ্ছি আমি। আজ থেকে তোমার কাজে আমি ইস্তফা দিলাম। কালকেই ইস্তফা জানিয়ে লিখে পাঠাবো। কারণ হিসেবে থাকবে—তুমি আমাকে গালাগাল দিয়েছো, এইজন্য চাকরী করতে চাই না। বুঝেছো ?'

সাহেব—কেন চাকরি ছাড়ছেন ? আমি তো কাউকে বরখাস্ত করি না।

ফতহচন্দ—তোমার মতো বদমাইশ লোকের গোলামী করবো না।

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ফতহচন্দ। আজ সে মুক্ত। মনের আনন্দে ঘরে ফিরছে সে। সাচ্চা জয়ের স্বাদ পেলো এতদিন বাদে। এত আনন্দ আর কখনো পায়নি সে। এটাই ওর জীবনের প্রথম জয়।

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

জ্যোতি

বিধবা হবার ঠিক পর থেকেই বুটির স্বভাবটা কেমন যেন একটু খিট্‌খিটে হয়ে গেছলো। বুকটা যখন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায় বুটি তখন ওর মৃত স্বামীকে শাপশাপান্ত করতে থাকে—নিজে তো সরে পড়লে আর দুনিয়ার যত জঞ্জাল রেখে গেলে আমার জন্যে। এতই যদি যাবার তাড়া ছিল, বিয়ে করতে গেছলে কেন ? ঘরে তো কানাকড়িও ছিল না, তার আবার বিয়ে করার সখ। চাইলে, সে কি আর একটা বিয়ে করতে পারতো না। আহিরদের মধ্যে তেমন রেওয়াজ আছে। দেখতে শুনতে আমিও খুব একটা খারাপ ছিলুম না। দু'একজন তৈরীও ছিল। কিন্তু পতিব্রতা দেখাবার মোহটা ছাড়তে পারেনি বুটি। আর ওর সব রাগটা গিয়ে পড়তো বড় ছেলে মোহনের ওপর। বছর ষোলো বয়স হবে ওর। সোহনটা এখনও ছোট আর ময়না মেয়ে। ওরা দু'জন তো এখনো লায়েক হয়ে ওঠেনি। ওরা তিনজন না থাকলে আর বুটিকে এত ঝন্‌ঝাট পোয়াতে হোতো না। যার ওখানেই কাজ করুক, ভাত-কাপড় ঠিকই জুটে যেতো। ইচ্ছে করলে কাউকে জুটিয়েও নিতে পারতো। এখন আর তা হয় না ; লোকেই বা কি বলবে, তিন তিনটে বাচ্চা হবার পরও মেয়েটার এ কি আক্কেল !

দিনরাত মা'র কাজকম্মের ভারটা হাল্কা করার চেষ্টা করতো মোহন। গরু-মোষকে খেতে দেওয়া, স্নান করানো, দোয়ানো সব একাই করে ও। কিন্তু বুটির মুখ-ঝামটার আর কামাই নেই। রোজই সে একটা না একটা ছুতোয় খিটিমিটি লাগিয়ে দিতো, শেষটায় ওর কথাবার্তা আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না মোহন। কেন যে তার স্বামী এই ঘর-গেরস্থালির পুরো দায়টা বুটির ওপর চাপিয়ে সরে পড়লো, এই ভাবনাটা সারাক্ষণ ওকে কুরে খাচ্ছিলো। বেচারীর একেবারে সব্বো-নাশ করে ছেড়েছে। না জুটলো খাওয়া-দাওয়ার সুখ, না ভালো কাপড়-জামা পরার সাধ—না অন্য কিছু। এ ঘরে আসাও যা, রাস্তায় পড়ে থাকাও তাই। ওর বৈধ্যব্যের সাধনা আর অতৃপ্ত ভোগলালসার দ্বন্দ্বে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো বুটি আর সেই আগুনে ওর হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা পুড়ে একেবারে ভস্ম হয়ে গেছ্‌লো। স্বামী মারা যাবার পর আর কিছু থাক আর না থাক চার-পাঁচশো টাকার গয়না অন্তত ছিল, একটা একটা ক'রে সে সবও গেছে।

মহল্লায়, ওদের জাতের ভেতর কতজন ওর জেঠিখুড়ি হয়েও সারা গায়ে গয়না পরে, চোখে কাজল লাগায়, সিঁথেয় চওড়া ক'রে সিঁদুর দেয়—ওদের দেখে

আরো জবলতে থাকে ব্ড়ি। তাই ওদের ভেতর কেউ বিধবা হলে মনে মনে খুশি হতো বুড়ি, আর ওর সব রাগটা গিয়ে পড়তো ছেলেদের ওপর, বিশেষ করে মোহনের ওপর। বুড়ি চাইতো, দুনিয়ার সব স্ত্রীদেরই ওর মত দশা হোক। লোকের কেচ্ছা করতে পারলে ওর দারুণ ফুর্তি। ওর অতৃপ্ত, বঞ্চিত লালসা এভাবেই বিকৃতির ভেতর তৃপ্তি পেতো। কাজেই, মোহনের বিষয় কিছু একটা শোনার পরও পেটে পেটে চেপে রাখা ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। দুধ বেচে সন্ধেয় মোহন ঘরে ফিরতে না ফিরতেই বুড়ি বললো, 'হু, তুই দেখছি ষাঁড় হবার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছিস।'

মোহন অবাক হয়ে জিগেস করে—কিসের ষাড়! কি ব্যাপার?

'রুপিয়ার সাথে লুকিয়ে চুরিয়ে ফষ্টিনষ্টি করিস না তুই? আবার জিগেস করছিস, কিসের ষাঁড়! বলতে তোর লজ্জা করে না! ঘরে তো একটা আধলাও নেই, উনি ওদিকে তার জন্য পান কিনছেন, কাপড় রাঙিয়ে দিচ্ছেন।'

কিছুটা উদ্ধতভাবে জবাব দেয় মোহন, 'ও আমার কাছে চার পয়সার পান চাইলে, কি করার আছে! বললাম—পয়সা দাও নিয়ে আসি। আর কাপড়টা রাঙাতে দিয়েছিলো, তার জন্যে রং করাবার পয়সা চাইলো।'

'মহল্লার ভেতর দেখছি তুই-ই একেবারে শেঠ বনে গেছিস। বলি, ও আর কারো কাছে চায়নি কেন?'

'সে, ও বলতে পারে, আমি তার কি জানি?'

'তোর দেখছি খুব বড়মানুষির সখ চেপেছে। কই, ঘরে তো কখনো কারও জন্যে কোনদিন এক পয়সার পান আনতে দেখিনি।'

'ঘরে কার জন্যে পান আনবো?'

'কেন, ঘরে কি সব মরেছে?'

'আমি কি করে জানবো তুমি পান খাবে।'

'দুনিয়ায় তোর এক রুপিয়া ছাড়া কি আর কেউ পান খেতে পারে না?'

'সাধ-আহ্লাদ মেটাবারও তো একটা বয়েস আছে।'

গা-পিত্তি জবলে যায় বুড়ির। ওকে বুড়ি বলা মানেই ওর এ্যাদ্দিনের সাধনাকে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দেওয়া। বুড়ি হয়ে গেলে আবার সাধনার মহত্ত্ব কি? যে ত্যাগ-তিতিক্ষার গৌরবে আর পাঁচজন মেয়েদের সামনে ও মাথা উঁচু ক'রে চলে, —এ তো তাকে একেবারে বাতিল করে দেয়া। আর এই ছেলেদের জন্যেই সে কিনা সারাটা জীবন মাটি করেছে। স্বামী মরেছে আজ পাঁচ বছর। তখন তো ও ভরা যুবতী। ভগবান তিন তিনটে বাচ্চাকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, নইলে আজ ওর কিসের দায় ছিল। চাইলে বুড়িও ঠোঁট লাল ক'রে, পায়ে আলতা মেখে, গয়নাগাটি পরে ঘুরে বেড়াতে পারতো। ছেলেদের জন্যে ও সব কিছু ছেড়েছে আর আজ মোহন বলে কিনা ও বুড়ি। রুপিয়াকে এখনো ওর সামনে দাঁড় করালে চিমসে দেখাবে। আর সে কিনা যুবতী—বুড়ি কিনা বুড়ি।

বুটি বললো, 'তা তো বটেই। আমার তো এখন ছেঁড়া ফাটা জামাকাপড় পরেই দিন কাটাতে হবে। তোর বাপ যখন মারা যায় তখন আমি রূপিয়ার চেয়ে দু'পাঁচ বছরের বড়। তখন যদি কারো কাছে চলে যেতুম কোথায় থাকতিস তোরা। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খেতে হ'তো। খবর্দার বলছি, আর যদি কোনদিন তুই রূপিয়াকে ডেকে আনিস, হয় আমি থাকবো, নয় তুই থাকবি।'

ভয়ে ভয়ে মোহন বললো, 'মা, আমি যে ওকে কথা দিয়েছি।'

'কিসের কথা ?'

'বিয়ে করবো।'

'রূপিয়া এ ঘরে এলে ঝাড়ু মেরে ওকে বিদায় করবো বলে রাখছি। এসব ওর মা'র যাদু। ও কুটনীটাই ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। ও মাগী বেশ্যারও অধম। ইচ্ছে করছে সতীন হয়ে ও মাগীর বুকের ওপর চেপে বসি।'

খুব খারাপ লাগে মোহনের। ও বললো, 'ভগবানের দোহাই, একটু চুপ করো মা। কেন শুধু শুধু কান্নাকাটি করছো। ভাবলাম, কদিন পর বিয়ে হয়ে ময়নাটা তো স্বামীর ঘরে চলে যাবে, তুমি একেবারে একলা হয়ে পড়বে। তাই ভাবছিলাম ওকে নিয়ে আসবো। তা, তোমার যদি পছন্দ না হয়, আনবো না।'

'তুই আজ থেকে এখানেই শুবি।'

'আর গরু-মোষ সব বাইরে পড়ে থাকবে ?'

'থাক, কেউ ডাকাতি করতে আসবে না।'

'আমাকে তোমার এত সন্দেহ ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এ ঘরে শোবো না।'

'তা'হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।'

'বেশ তুমি যদি তাই চাও, চলে যাবো।'

ময়না খেতে ডাকলো। মোহন বললো, 'আমার ক্ষিদে নেই।' বুটি ওকে একবারও সাধলো না। মোহনের তরুণ হৃদয় মায়ের এই কঠোর শাসনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না। তোমার ঘর, বেশ তাই হবে। নিজের জন্যে ও না হয় আর কোনো আশ্রয় খুঁজে নেবে। ওর রুক্ষ জীবনটায় স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে রূপিয়া। ও যখন একটা অব্যক্ত কামনায় চঞ্চল, জীবনটাকে মনে হ'তো বড় শুকনো, ঠিক সেসময় রূপিয়াই নব বসন্তের সৌরভ এনে পল্লবিত করেছে ওকে। জীবনের একটা মধুর স্বাদ পাচ্ছিলো মোহন। যত কাজকর্মই থাক না কেন, সারাক্ষণ মনটা পড়ে থাকতো রূপিয়ার জন্যে। কি দিয়ে যে ওকে খুশী করবে, তাই ভাবতো। এখন কোন্ মুখে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ? ওকে গিয়ে বলবে নাকি, মা আমাকে তোমার সাথে মিশতে মানা করেছে। কালই তো বটগাছের নীচে বসে কত কথা হয়েছে দু'জনে। মোহন বলেছিলো, রূপা তুমি

এত সুন্দর, তোমার জন্যে সবাই পাগল। আমার ঘরে আর তোমার জন্যে আছেই বা কি ? তার উত্তরে রূপিয়া ওকে যা বলেছিলো সে কথাগুলো ওর প্রাণের ভেতর গানের মতন বাজছেঃ মোহন আমি তোমাকে চাই, শুধু তোমাকেই। পরগণার চৌধুরী হলেও মোহন, আর যদি মজুরী খাটো তাহলেও মোহন। আর এখন সে কিনা রূপিয়াকে গিয়ে বলবে, তোমার সাথে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।

না, এ হতে পারে না। বাড়ির জন্যও পরোয়া করে না। রূপিয়াকে নিয়ে মার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যদি এখানে না হয়, অন্য কোন মহল্লাই সই। হয়তো রূপিয়া এখনো ওর জন্যে পথ চেয়ে রয়েছে। কি খাসা পান সাজে। মা যদি টের পায় ও এত রাতে রূপিয়ার ওখানে গেছে, হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবে। মরে মরুক। অমন দেবীর মত বৌ মিলবে, সে কি ওর কম সৌভাগ্য। কেন যে মা রূপিয়াকে দু'চোখে দেখতে পারে না। ও একটু পান খেতে ভালোবাসে, শাড়ি রাঙিয়ে পরে, ব্যস্ এইতো।

চুড়ির আওয়াজ। তার মানে রূপিয়া আসছে। হ্যাঁ, ও-ই আসছে।

রূপিয়া ওর মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়, 'শুয়ে আছো যে ? কতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে বসেছিলাম। এলে না কেন ?'

ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকে মোহন।

রূপিয়া ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'মোহন, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?'

ওর কোমল আঙুলের স্পর্শে কি যাদু ছিল কে জানে। মোহনের সমস্ত হৃদয় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ওর প্রাণটা যেন ছিটকে রূপিয়ার পায়ে এসে নিজেকে সঁপে দিতে পারলে বাঁচে। ওর মনে হোলো শরীর যেন লুপ্ত হয়ে গেছে; শুধু একটা মধুর স্বরের সৌরভে পৃথিবীর বাহুবন্ধে জড়িয়ে গিয়ে তার সাথে নাচছে ও।

রূপিয়া আবার বলে, 'এখুনিই শুয়ে পড়ছো কেন ?'

মোহন বললো, 'হ্যাঁ, কেমন যেন ঘুম এসে গেছ্‌লো রূপা। তুমি এখানে এলে কেন ? মা যদি দেখতে পায়, আমায় পিটবে।'

'তুমি আজ এলে না কেন ?'

'মার সাথে আজ ঝগড়া হয়ে গেছে।'

'কি বলেছিলে ?'

'বলে কি জানো, তোমায় যদি কিছু বলি তো মা আত্মহত্যা করবে।'

'আচ্ছা, আমার ওপর এত রাগ কেন, সেটা জিগেস করেছো ?'

'মার কথা আর কি বলবো রূপা। কেউ খেয়ে-পরে সুখে থাকলেই ওর আর সহ্য হয় না। তোমার কাছ থেকে এখন আমাকে দূরে দূরে থাকতে হবে।'

'আমার মন মানবে না গো।'

'ওভাবে বললে তোমায় নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবো।'

'তুমি রোজ একবার করে আমার কাছে এসো। ব্যস্, আর কিছুই আমি চাই না।'

'তাতে মা যে বিগড়ে যাবে।'

'বুঝেছি। তুমি আমায় মোটেই ভালোবাসো না।'

'ক্ষমতা থাকলে তোমায় আমি বুকে করে রেখে দিতুম।'

ঠিক তখুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। পালালো রুপিয়া।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালে উঠে ওর মনটা কেমন যেন খুশির জোয়ারে উছলে উঠলো। সোহনকে খুব বকাঝকা করতো মোহন। সোহনটা একেবারে কুঁড়ের বাদশা, ঘরের কাজকর্মে একদম মন নেই। আজও, উঠোনের একধারে বসে সাবান দিয়ে নিজের ধুতি সাফ করছিলো। মোহনকে দেখেই সাবানটা লুকিয়ে ভেগে পড়ার চেষ্টা কচ্ছিলো।

হাসতে হাসতে মোহন বললো, 'সোহন তোর ধুতিটা খুব ময়লা হয়ে গেছে নারে? তা, ধোপার কাছে দিস না কেন?'

এমনি কথাবার্তায় সোহন যেন স্নেহের আস্বাদ পায়।

'ধোপানী তো পয়সা চায়।'

'তা, মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিস না কেন?'

'মা আবার কবে পয়সা দেয়।'

'তো, আমার কাছ থেকে নে।'

এই বলে ও সোহনকে এক আনা ছুঁড়ে দিল। সোহন তো মহা খুশি। এ যাবৎ মা-দাদা সবাই ওকে শুধু বকাঝকাই করে এসেছে। অনেকদিন পর ও যেন আজ মধুর স্নেহের স্বাদ পাচ্ছিলো। এক আনিটা তুলে নিয়ে ধুতিটাকে ওখানে রেখেই গরুগুলোকে খুলে দিতে চললো।

মোহন বললো, 'ছেড়ে দে, আমি খুলে দেবো'খন।'

গরু বাঁধার দড়িটা দাদাকে ছুঁড়ে দিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার জন্যে ছিলিম সাজবো দাদা?'

জীবনে এই প্রথম ও দাদার ওপর এতটা সদ্‌ভাব দেখালো। মোহন এ সবের কোনো রহস্য বুঝতে পারে না। বলে, 'আগুন থাকলে দে।'

আঙিনায় চুল খুলে ময়না তখন পুতুলের খেলাঘর বানাতে ব্যস্ত। মোহনকে দেখেই ও চুলটা টেনেটুনে পুতুলের খেলাঘর বানানো ছেড়ে রসুইঘর থেকে বাসন-কোসন আনতে চললো।

মোহন জিজ্ঞেস করলো, 'কি খেলছিলি ময়না?'

ভয়ে ভয়ে ময়না বলে, 'না, কিছু না।'

'তুই তো দারুণ খেলাঘর বানাস। বানা তো, দেখি।'

ময়নার মলিন মুখে খুশির ঝিলিক খেলে গেলো। ভালোবাসার কথায় যে কি যাদু! মুখ থেকে বেরোলেই চারদিকে যেন সুগন্ধ ছড়ায়। যেই শোনে, তারই

মনটা যেন নেচে ওঠে। ভয়ের বদলে জেগে ওঠে বিশ্বাস। রুক্ষতার বদলে ভালো-বাসা ছলকে ওঠে। খুশির আমেজে চারদিক ভরে যায়। কোথাও আলস্য নেই, কোথাও কোন ক্ষিপ্ততা নেই। মোহনের মনটা স্নেহ-ভালোবাসায় ভরপুর। সেখান থেকে আজ যেন সুবাস ছড়াচ্ছে।

ময়না খেলাঘর বানাতে বসে যায়।

মোহন ওর খোলা চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলে, 'তোর পুতুলের বিয়ে কবে? নেমোন্তন্নো করিস, খুব মিষ্টি খাওয়া যাবে।'

ময়নার মনটা আকাশে উড়তে লাগলো। দাদা যদি এখন জল চায়, ও এখুনি লোটাভরা জল এনে দেবে দাদাকে।

'মা পয়সা দেয় না। বর তো কবে থেকে ঠিক হয়ে আছে। পাকা দেখা হবে কি করে, কি দিয়েই বা আশীর্বাদ করবো।'

'ক'পয়সা চাই?'

'এক পয়সার বাতাসা আর এক পয়সার রঙ। বর-কনের কাপড় রাঙাতে হবে না?'

'দু'পয়সায় তোর হয়ে যাবে?'

'দাও না দাদা। তা'লে খুব ধুমধামসে আমার পুতুলের বিয়ে হয়ে যাবে।'

মোহন দু'পয়সা হাতে নিয়ে ময়নাকে দেখালো আর যেই ময়না ছুটে এলো মোহন দু'পয়সা সুদ্ধু ওর হাতটা ওপরে তুললো; মোহনের হাতটা টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা কচ্ছিলো ময়না। মোহন ওকে কোলে তুলে নিলো। ময়না পয়সাটা নিয়েই কোল থেকে নেমে নাচতে লাগলো।

এখুনি ওর সহেলিকে বিয়ের খবরটা দিতে হবে।

ঠিক তখুনি ঝুড়িসুদ্ধ গোবর নিয়ে বুটি হাজির। মোহনকে দেখে রেগেমেগে বললো, 'বসে বসে কি গুলতানি হচ্ছে শুনি? মোষটার দুধ দোয়াবি কখন?' আজ আর বুটিকে কোনো কড়া জবাব দিলো না মোহন। ওর মনটা যেন আজ মাধুর্যে ভরে রয়েছে। মাকে গোবরের বোঝাটা নিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ও মাথা থেকে ঝুড়িটা নামালো।

বুটি বলে, 'থাক্, থাক্। গিয়ে মোষটাকে দোয়া, গোবর আমি আনছি।'

'এত ভারি বোঝাটা টানার কি দরকার মা, তুমি আমায় ডাকতে পারো না?'

মায়ের মনটা বাৎসল্যে ভরে উঠলো।

'যা, যা। তুই তোর নিজের কাজ কর্। আমারটা আর তোকে দেখতে হবে না।'

'গোবর আনাটা তো আমারই কাজ।'

'আর দুধটা কে দোয়াবে?'

'ওটাও আমিই করবো।'

'তুই তো দেখছি মস্ত পালোয়ান, একাই সব করবি।'

'ঠিক আছে, যা বলবে ততটা করবো।'

'তার আমি কি বলবো ?'

'ছেলেদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে ; ব্যস্, এটাই তোমার কাজ।'

'হু, আমার কথা কে আর কানে নিচ্ছে ?'

' বাজারে দুধ পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আজ মোহন পান, খয়ের, সুপুরি, একটা ছোট্ট পানদান আর মিষ্টি কিনে নিয়ে এলো। বুটি চটে আগুন, 'বলি, আজ কি ফোকোটে পয়সা জুটেছে নাকি ? এভাবে পয়সা ওড়ালে দু'দিনেই সব ফুঁকে দিবি।'

'নিজের জন্যে তো একটাও পয়সা ওড়াইনি মা। আগে ভাবতাম তুমি পান-টান খাও না।'

'তা, এখন থেকে কি আমি পান খাবো নাকি ?'

'হ্যাঁ, খাবে। দু'দুটো জোয়ান ছেলে থাকতে এটুকু আয়েস করবে না ?'

বুটির শুকনো নিষ্করুণ হৃদয়ে কোত্থেকে যেন জীবনের সবুজাভা ছড়িয়ে গেল। এই তো সামান্য বেঁচে থাকা, তারই ভেতর জীবনের কত রস, কত রূপ। ময়না আর সোহনকে একটা করে মেঠাই দিয়ে ও মোহনকেও একটা দিল।

'মেঠাই তো বাচ্চাদের জন্যে, মা।'

'আর, তুই যেন একেবারে বুড়ো হয়ে গেছিস, না ?'

'ওদের তুলনায় বুড়োই তো মা।'

'কিন্তু, আমার কাছে তুই তো এখনো সেই খোকাই।'

মোহন মেঠাই নিলো। ময়না মেঠাইটা নিয়েই গপ ক'রে মুখে পুরে দিয়েছিলো ; মেঠাই-এর স্বাদটা জিভে লাগতে না লাগতেই কখন যে গায়েব হয়ে গেছে। লোভীর মত ও মোহনের মিষ্টিটার দিকে তাকিয়েছিলো। লাড্ডুর আধখানা ভেঙে ও ময়নাকে দিলো। একটা বেশি হ'ল। বুটি ওটা মোহনের দিকে বাড়িয়ে বললো, 'এত মিষ্টির কি দরকার ছিলো বাপু, নে, ধর্।'

মোহন আদ্ধেকটা লাড্ডু মুখে পুরে বললো, 'বাকিটা তোমার জন্যে।'

'তোদের খেতে দেখলেই আমার আনন্দ রে, মিষ্টির চেয়ে তার স্বাদ ঢের বেশি।'

বাকিটা বুটি দু'ভাইকে ভাগ করে দিলো। তারপর নিজে পানদানটা খুলে দেখতে লাগলো। জীবনে এই প্রথম ওর এমনি সৌভাগ্য। সত্যিই, ভাগ্যের কি অদ্ভুত খেলা ! স্বামীর আমলে যে সব জিনিসে ওর লোভ ছিল, আজ ছেলেদের দৌলতে তাই জুটছে। পানদানের ভেতর ছোট ছোট ডিবে, দুটো ছোট চামচেও আছে, ওপরে কেমন হাতল লাগানো। ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি সংগে করে নিয়ে যাওয়া যায়। ওপরের বাটাটায় পানও রাখা যাবে।

মোহন বেরিয়ে যাবার সংগে সংগেই বুটি পানদানটাকে ঘষে মেজে তার ভেতর চুন, খয়ের রাখলো ; সুপুরি কাটলো আর পানগুলোকে ভিজিয়ে বাটার ওপর

সাজালো। তারপর এক খিলি পান বানিয়ে খেলো। পানের রস যেন ওর বৈধব্যের রুক্ষতাকে স্নিগ্ধ ক'রে দিচ্ছে। মনটা প্রসন্ন থাকলে ব্যবহারেও উদারতা এসে যায়। এখন আর ওর ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ওর মনটা তো আর এত ছোট নয় যে এতবড় একটা আনন্দে ও গুম মেরে বসে থাকবে। ঘরে একটা পুরোনো আয়না ছিল, তাতে নিজের মুখ দেখলো বুটি। ঠোঁটটা কেমন লাল দেখাচ্ছে। আর নিজের ঠোঁট লাল করার জন্যেই তো এক খিলি পান খেয়েছে বুটি।

ধনিয়া এসে বললো, 'কাকী, আমার রশিটা ছিঁড়ে গেল, একটা রশি দাও তো।'

কাল হ'লে বুটি বলতো, আমার রশি তো আর গা-ভর বিলোবার জন্যে নয়। আজ কিন্তু খুশি মনেই রশি দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'ধনিয়া, ছেলের পায়খানা বন্ধ হয়েছে রে?'

ধনিয়া উদাসভাবে বললো, 'না কাকী, সারাদিন পায়খানা করছে। একদম কাহিল হয়ে গেছে ছেলেটা।'

'দাঁড়া, জলটা ভরে নিয়ে চট করে একবার দেখে আসি। শরীর খারাপ হ'ল, না কি আবার অন্য কোন ফ্যাসাদ। হ্যাঁরে, কারো নজর-টজর লাগেনি তো।'

'কি করে বলি কাকী, কে জানে কারো নজর লাগলো কি না?'

'বাচ্চাদের নজর লেগে যাবার ভয় তো থাকেই।'

'যেই কেউ আদর করে ডাকবে, ওমনি তার কোলে চড়ে বসবে। কি যে হাসে, সে তোমায় কি বলবো কাকী।'

'কখনো সখনো মাদেরও নজর লেগে যায়।'

'সে কি কাকী, কোন ভালোমানুষের মেয়ে আবার নিজের ছেলেকে নজর দেয় নাকি!'

'সে তুই বুঝবি না। নজর আপনা-আপনিই লেগে যায়।'

ধনিয়ার জল তোলা শেষ হলে বুটি ওর সাথে বাচ্চাটাকে দেখতে চললো।

'তুই একা মানুষ। ঘর-গেরস্থালির কাজে তোর এখন খুব ধকল যাচ্ছে।'

'না, কাকী। রুপিয়াটা আসে, ঘরের কাজ-টাজ ও-ই ক'রে দেয়, নইলে তো একা আমি মরেই যেতাম।'

বুটি অবাক হয়ে যায়। ও ভাবতো মেয়েটা একেবারে ছেনাল।

'রুপিয়া!'

'হ্যাঁ, কাকী; মেয়েটা বড় ভালো। ঘরদোর ঝাট দিচ্ছে, বাসন মাজছে আবার এরই মধ্যে ছেলেটাকে সামলাচ্ছে। দিন কাল খারাপ গেলে কে কার খবর নেয় বলো, কাকী!'

'ও তো সারাদিন মিশি আর কাজল লাগাতেই ব্যস্ত।'

'সে—যার যেমন রুচি। মিশি আর কাজল যাই লাগাক না কাকী, ও আমার জন্যে যা করেছে সতী-সাধ্বীরাও তেমন কেউ করেনি। বেচারী সারা রাত জেগে

থাকে। আমি তো ওকে কিছুই দিইনি। যদ্দিন নিজে বেঁচে থাকবো আর কিছু না হোক অন্তত ওর প্রশংসা করে যাবো।'

'ওর গুণপনা কিছুই জানিস না ধনিয়া। ওর পান খাবার পয়সাটা আসে কোত্থেকে শুনি? পাড়লাগানো শাড়িই বা আসে কোত্থেকে?'

'ওসব কথায় আমার কাজ নেই কাকী। সাধ-আহ্লাদ কার না থাকে বলো? খাওয়া-পরার এই তো বয়েস।'

ধনিয়ার ঘরে পেঁাছে যায় ওরা। আঙিনায় বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে রূপিয়া ওকে চাপড়াচ্ছে। আর বাচ্চাটাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধনিয়া জলচৌকিতে শুইয়ে দেয় বাচ্চাটাকে। বুটি বাচ্চাটার কপালে হাত রেখে দেখে তারপর পেটের কাছটা আঙুল দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করলো। বললো, 'নাভীতে হিং বাটা লেপতে হবে।' রূপিয়া তখন ওর চুলটা ঠিকঠাক করছিলো।

বুটি বলে, 'আয় খোঁপাটা বেঁধে দি।'

'কেন, আমি বাঁধলে কি খোঁপা ছোট হবে?'

'সারাদিন তো এখানেই কাজকম্ম নিয়ে আছিস। হাঁপিয়ে পড়েছিস নিশ্চয়ই।'

'তুমি এত ভালো আর সবাই বলে কিনা গালমন্দ না করে তুমি নাকি কথাই বলো না। তাই, ভয়ে তোমার কাছে যাই না।'

বুটি হাসে।

'ঠিকই বলে সবাই।'

'নিজের চোখকে বিশ্বাস করবো, না পরের মুখে ঝাল খাবো?'

রূপিয়া আজো চোখে কাজল টেনেছে, পান খেয়েছে, পরনে রঙীন শাড়ি। কিন্তু আজই প্রথম যেন বুটি বুঝতে পারে, এ ফুলে শুধু রঙ নেই—সুগন্ধও আছে। রূপিয়াকে মনে মনে ঘেন্না করতো বুটি, আজ যেন কোন মন্ত্রবলে সব ধুয়ে-মুছে একাকার। কত সুশীলা, কত লাজুক মেয়ে। কথা বলার ঢংটাও কি মিঠে। আজকালকার মেয়েরা নিজের বাচ্চার কথাই তেমন ভাবে না, তায় আবার পরের ছেলেমেয়ে নিয়ে কে মাথা ঘামায়। আর সারারাত ধনিয়ার বাচ্চাটার জন্যেও জেগে থাকে ও। কালকের কথাগুলো মোহন নিশ্চয়ই ওকে বলে দিয়েছে। অন্য কোন মেয়ে হলে কথাই বলতো না; উল্টে ঠেস দিয়ে কথা বলতে ছাড়তো না। মনে হয় যেন কিছুই জানে না। মোহন হয়তো কিছুই বলেনি। নিশ্চয়ই তাই।

রূপিয়াকে আজ ভারি সুন্দর লাগছে বুটির। ঠিকই তো, এ বয়েসেই যদি সাধ আহ্লাদ না করবে তো কবে করবে? আসলে সাধ-আহ্লাদ মেটাবার ব্যাপারটা খারাপ লাগে, কেননা ওসব মেয়েরা শুধু নিজের নিজের ভোগবিলাস নিয়েই মত্ত। কারো ঘরে আগুন লাগলেও ওদের কোন হুঁশ হয় না। অন্যদের বিরক্ত করা ছাড়া আর যেন ওদের কোন কাজ নেই। যেন, রূপের পশরা সাজিয়ে রাস্তার লোকগুলোকে ডেকে ডেকে বলে, একবার অন্তত ঘুরে যাও। কিন্তু রূপিয়ার মত উপকারী ভালোমানুষদের একটু আধটু বিলাসিতা খারাপ লাগে না বরং ভালোই

লাগে। এ থেকেই বোঝা যায়, ওকে দেখতেও যেমন সুন্দর, মনটাও তেমনি। তাছাড়া রূপের প্রশংসা কে-ই বা না চায় ? অন্যদের চোখে সুন্দর হয়ে উঠতে কার না ইচ্ছে করে ? বুটির যৌবন তো সেই কবে শেষ হয়ে গেছে, তবুও কি এসব ইচ্ছে-টিচ্ছে ওর মনে একেবারে নেই ! তেমন ভাবে কেউ তাকালে, ও কি আর খুশি হয় না ! দেমাকে তখন মাটিতে পা পড়তে চায় না। আর রূপা তো যুবতী।

সেদিন থেকে রূপা রোজই দু-একবার বুটির ওখানে যায়। মোহনকে বলে ওর জন্য রঙীন শাড়ি আনিয়ে দিয়েছে বুটি। এক একদিন রূপা চোখে কাজল-টাজল না লাগিয়ে যোগিনীদের মতো ঘুরে বেড়ালে বুটি বলে, বৌ-মেয়েদের এমন বৈরাগীদের মত পোশাক-আষাক বাপু আমার ভালো লাগে না। ওসব আমাদের মত বুড়িদের মানায়।

একদিন রূপা বললো, 'তুমি আবার বুড়ি হলে কবে মা। ইশারা করলেই তো লোকজন একেবারে ভোমরার মত দরজায় ভন ভন করতে শুরু করবে।'

মৃদু তিরস্কার করে বুটি বলে, 'চল্, আমি তোর মা'র সতীন হবো গে।'

'মা তো বুড়ি হয়ে গেছে।'

'আর তোর বাপ বুঝি খুব জোয়ান আছে ?'

'বাবার শরীরটা এখনো খুব মজবুত।'

প্রসন্ন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বুটি বললো, 'মোহনের সাথে তোর বিয়ে হলে কেমন হবে ?'

রূপা লজ্জা পায়। ওর সারা মুখে গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়ে।

দুধ বেচে মোহন ফিরে এলে বুটি বললো, 'কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা কর্, রূপার সাথে তোর বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেলেছি।'

ভাষান্তর : **পার্থ বন্দোপাধ্যায়**

জনগণের সেবক

জনগণের সেবক বললেন ঃ 'জাতির উদ্ধারের একটাই পথ, আর তা হলো পতিতদের ভাই বলে বুকে টেনে নেওয়া ; অচ্ছুৎদের সমমর্যাদা দেওয়া। পৃথিবীতে সবাই ভাই ভাই। কেউ কারো চেয়ে উঁচুও নয়, নীচুও নয়।'

সারা দুনিয়া জয়গান গেয়ে উঠলো। 'কি সহৃদয়তা, কি মহান দর্শন!'

তাঁর সুন্দরী মেয়ে ইন্দিরা সব শুনে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো।

জনগণের সেবক একজন নীচুজাতের লোককে আলিঙ্গন করলেন।

দুনিয়ার লোক বললো, 'উনি দেবদূত, একজন সাচ্চা ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ্য কাণ্ডারী।'

ইন্দিরা দেখলো আর ওর দু'চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

জনগণের সেবক সেই ছোটজাতের যুবকটিকে নিয়ে মন্দিরের ভেতর বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ; তারপর বললেন, 'আমাদের ভগবান শোচনীয় দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য আর অবমাননার মধ্যে রয়েছেন।'

দুনিয়াসুদ্ধ সবাই বললো, 'মনের দিক থেকে একেবারে খাঁটি লোক! কি বুদ্ধিমত্তা!'

ইন্দিরা দেখলো আর হাসলো।

ইন্দিরা জনগণের সেবকের কাছে গিয়ে বললো, 'পিতাজী, আমি মোহনকে বিয়ে করতে চাই।'

জনগণের সেবক স্নেহের চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে মোহন?'

ইন্দিরা উৎফুল্ল হয়ে বললো, 'সৎ, সাহসী আর ভালোমানুষ সেই ছেলেটি, আপনি যাকে জড়িয়ে ধরলেন, মন্দিরে নিয়ে এলেন, ওই তো হলো মোহন।'

জনগণের সেবক কঠিন ভ্রূভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

ভাষান্তর : **পার্থ বন্দোপাধ্যায়**

কাপুরুষ

ছেলেটির নাম কেশব আর মেয়েটির নাম প্রেমা। এক কলেজে একই ক্লাসে পড়তো ওরা। নব্যপথের পথিক কেশব জাতপাতের নিয়মে বিশ্বাস করতো না। এদিকে সংস্কার আর বংশমর্যাদায় দারুণ বিশ্বাস ছিল প্রেমার। তা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা জন্মেছিল আর কলেজের সবাই সেটা জানতো। ব্রাহ্মণ হয়েও বেণের মেয়ে প্রেমাকে বিয়ে করে নিজের জীবন সার্থক করতে চায় কেশব। সে তার মা-বাবাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করতো না। তার কাছে, যদি কিছু সত্য হয়, সে প্রেমা। কিন্তু মা-বাবা আর পরিবারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক পা এগিয়ে যাওয়াও প্রেমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্ধেবেলা। ভিক্টোরিয়া পার্কের এক নির্জন কোণে ঘাসের ওপর ওরা মুখো-মুখি বসে ছিল। হুল্লোড়ে লোকজনরা একে একে সবাই চলে গেছে ; কিন্তু ওরা দু'জন তখনো বসে। এমন একটা আলোচনা ওরা শুরু করেছিল, যা কোনমতেই শেষ করা যায় না।

রেগেমেগে কেশব বলে—তার মানে তুমি আমার ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাতে চাও না।

প্রেমা ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিল। 'তুমি আমার ওপর অন্যায় করছো কেশব। আমি ভাবতেই পারছি না, মা-বাবার কাছে কথাটা তুলবো কি করে। ওরা পুরোনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী। আমার কাছ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনলে ওদের অবস্থাটা যে কি হবে, কল্পনা করতে পারছো ?'

কেশব উগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো—তার মানে ? তুমিও কি পুরোনো নিয়ম-কানুনের গোলামী মেনে নিচ্ছো না ?

প্রেমা তার দীঘল চোখের ছলছল দৃষ্টি নিয়ে বললো—না, আমি এসবের দাসত্ব মানি না। কিন্তু মা-বাবার ইচ্ছেটা অন্য সব কিছুর চেয়েও আমার কাছে ঢের বড়।

'তোমার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব নেই ?'

'তুমি যদি তাই ভাবো, তবে তাই।'

'আমি ভাবতাম ওসব সংস্কার মূর্খরাই মানে। কিন্তু এখনতো দেখছি তোমার মত বিদুষীরাও সংস্কারে বিশ্বাসী। তোমার জন্য আমি দুনিয়ার সব কিছু ছাড়তে রাজি, ভেবেছিলাম তুমিও তাই পারবে।'

মনে মনে প্রেমা ভাবলো, এই শরীরটার ওপর তার কতটুকু নিজস্ব অধিকার ! যে মা-বাবা তাদের রক্তে মাংসে তাকে গড়ে তুলেছে, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে—তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কিছুতেই যেতে পারবে না।

নরম গলায় ও কেশবকে বলে—ভালোবাসা কি শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়, বন্ধুত্বের ভেতর হয় না ? ভালোবাসা বলতে আমি বুঝি আত্মার বন্ধন।

রূঢ়ভাবে কেশব বললো—তোমার যুক্তির ঠেলায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার দশা। মনে রেখো, আমি তোমাকে না পেলে কিছুতেই বাঁচবো না। আমি বস্তুবাদী, আমার পক্ষে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কল্পিত কোন ভালোবাসা নিয়ে সুখী হওয়া সম্ভব নয়।

প্রেমার হাত ধরে ও তাকে কাছে টানতে চাইলো। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রেমা বললো, 'তোমাকে তো আমি বলেছি, নিজের ইচ্ছে মতো চলার অধিকার আমার নেই। অসম্ভব কিছু করতে বলো না আমাকে, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রেমা যদি রূঢ়ভাবে কথাটা বলতো তাহলে সে এতোটা আঘাত পেত না। এক মুহূর্তে ও নিজেকে সংযত করলো ; উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যা তোমার খুশি।' তারপর আস্তে আস্তে হেটে চলে গেল ও ! চোখের জল নিয়ে প্রেমা ওখানেই বসে রইলো।

॥ দুই ॥

রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে প্রেমা যখন ওর মার সাথে শুতে এল, তখন ওর ঘুম আসছিল না। কেশবের কথাগুলো প্রেমাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যেন চঞ্চল জলে প্রতি মুহূর্তে ছায়া পড়ছে, বদলে যাচ্ছে তার রূপ, আর ও তাদের কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না। মাকে এসব কথা কি করে বলবে ও ? লজ্জা ওর মুখের সব ভাষা কেড়ে নিয়েছে। ও ভাবছিল, কেশবের সাথেই যদি আমার বিয়ে না হয় তাহলে আর বেঁচে থেকে কি লাভ ? কিন্তু উপায়ই বা কি ? এসব কথা বার বার ভাবতে ভাবতে ও একটা সিদ্ধান্তে পেঁছিলো ; যদি ও কেশবকে বিয়ে না করে, তাহলে আর কাউকেই সে বিয়ে করবে না।

ওর মা বললো—এখনো ঘুমোসনি তুই ? কদ্দিন তোকে বলেছি না ঘর-গেরস্থালির কাজে বাপু একটু হাত লাগা। কিন্তু তোর আর বই থেকে মুখ তোলার সময় হয় না। ক'দিন বাদে পরের বাড়ি যাবি, কে জানে বাপু সে ঘর কেমন ধারা হবে ? কাজকম্ম কিছু না শিখলে তুই যে কি দিয়ে কি করবি ?

প্রেমা সরল ভাবে বললো—পরের বাড়ি যাবো কেন ?

মা হেসে বলে—এই তো মেয়েদের চরম দুর্ভাগ্য মা। বাপ মায়ের স্নেহ-ভালোবাসায় একদিন বড় হয়ে উঠলো, তারপর পরের ঘরে যেতে হলো। মানুষটা ভালো হলে সুখশান্তি জুটলো আর নইলে সারা জীবন কাঁদতে হবে। সবই ভাগ্য। আমাদের জাতের ভেতর কোন ঘরই আমার পছন্দ নয়। মেয়েদের সেখানে কোন

আদর নেই—কিন্তু নিজেদের জাতের মধ্যেই তো থাকতে হবে। এই জাতপাতের নিয়ম যে কবে ঘুচবে, কে জানে ?

ভয়ে ভয়ে প্রেমা বলে, 'কোথাও কোথাও জাতপাতের বাইরেও তো বিয়ে হচ্ছে মা আজকাল।'

কথার পিঠে কথা হিসেবে বললেও ওর বুকটা দুরদুর করতে লাগলো, মা যদি কিছু বুঝে ফেলে !

অবাক হয়ে ওর মা জিজ্ঞেস করলো—হিন্দুদের ভেতর এ রকম হচ্ছে না কি ?

তারপর নিজের প্রশ্নের জবাব যেন নিজেই দিলেন—আর যদি দু'চারটে হয়েই থাকে, তাতেই বা কি ?

প্রেমা কোন উত্তর দিল না। ওর ভয় হচ্ছিল, মা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে। ওর ভবিষ্যৎ একটা হাঁ-মুখ অন্ধকারের মত ওকে যেন গিলতে আসছে।

কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়লো, টের পেল না।

॥ তিন ॥

ভোরবেলা, ঘুম থেকে উঠে ওর মন এক বিচিত্র সাহসে জেগে উঠলো। সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এমনি হঠাৎ-ই আসে, যেন একটা অলৌকিক শক্তি সে দিকেই টেনে নিয়ে যায়। প্রেমারও ঠিক তাই হলো। কাল পর্যন্ত মা-বাপের সিদ্ধান্তটাই ছিল ওর কাছে অলংঘনীয়। কিন্তু সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ওর ভেতর যেন এমন একটা ঝোড়ো বাতাসের সূচনা হলো যা পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। ওই বাতাস পাহাড়-চূড়া ছুঁয়ে ফেলে আর তা পেরিয়ে চলে যায়। প্রেমা মনে মনে ভাবছিল, শরীরটা না হয় বাবা মায়েরই দেওয়া, কিন্তু আমার নিজের আত্মার যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, সে তো এই দেহের মধ্যেই। এখন এসব ব্যাপারে সংকোচ করাটা শুধু অনুচিত নয়, রীতিমতো বিশ্বাসঘাতকতা। একটা মিথ্যে সম্মানের জন্য নিজের জীবনকে বলি দিতে হবে ? ও ভাবছিল, বিয়ে যদি ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করেই না হবে, তাহলে তো সেটা দেহবিক্রিরই সামিল। এ তো আত্মসমর্পণ, এর মধ্যে ভালোবাসা কোথায়। একটা অপরিচিত ছেলের সাথে বিয়ে···ভাবতেই ওর মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো।

জলখাবার খেয়ে পড়াশুনো করতে যাচ্ছিল প্রেমা ; ওর বাবা ওকে আদর করে কাছে ডাকলেন—কাল তোদের প্রিন্সিপালের ওখানে গিয়েছিলুম। উনি তোর খুব প্রশংসা করলেন।

সরলভাবে প্রেমা বললো—আপনি তো সব সময় তাই বলেন।

'না, না। সত্যি বলছি।'

কথা বলতে বলতে উনি তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুলে মখমলের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি দেখিয়ে বললেন—ছেলেটি আই.সি.এস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। ওর কথা নিশ্চয়ই শুনেছিস।

বাবা এমন ভাবে কথাটা পাড়লেন প্রেমা যাতে কিছু বুঝতে না পারে ; কিন্তু তীর যেমন লক্ষ্যভেদ করে, তেমনি ঠিকই বুঝতে পারলো প্রেমা। ছবিটা না দেখেই প্রেমা বললো—না, আমি ওর নাম শুনিনি !

খুব আশ্চর্য হয়ে ওর বাবা বললেন—সে কি ? তুই ওর নাম শুনিসনি ? আজকের খবরের কাগজে ওর ছবি আর সংক্ষিপ্ত জীবনী বেরিয়েছে।

প্রেমা একটু রূঢ়ভাবে বললো—হবে ; কিন্তু এসব আমি খুব বড় বলে মনে করি না। আমার তো মনে হয় এ পরীক্ষা যারা দেয়, তারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। শেষ পর্যন্ত এরা কি করে, নিজের দেশের গরীব-গুরবো হত-ভাগ্য অত্যাচারিত ভাইদের শাসন করে আর টাকা জমায়। এটা জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্যই নয়।

ওর কথাবার্তার ভেতর জ্বালা ছিল, রুক্ষতা ছিল, নিষ্ঠুরতাও ছিল।

ওর বাবার ধারণা ছিল এসব শুনে প্রেমা একেবারে গলে যাবে। মেয়ের কথা-বার্তা শুনে একটু কড়াভাবেই বললেন—এমন ভাবে কথা বলছো যেন টাকা পয়সা, ক্ষমতা এসব কোন ব্যাপারই নয়।

প্রেমা দৃঢ়ভাবে বললো—হ্যাঁ, এসব আমি খুব মূল্যবান বলে মনে করি না। মানুষের মধ্যে ত্যাগই তো হ'ল বড় জিনিস। আমি এমন ছেলেদের জানি, যাদের জোর করে আই-সি-এস.-এর চাকরিতে বসিয়ে দিলেও তারা তা নেবে না।

ওর বাবা একটু বিদ্রূপ করে বললেন—হুঁ, আজ অনেক কিছু নতুন শুনলাম। ছোটখাটো চাকরির জন্যেই বলে লোকেরা হামলে পড়ছে। আমি তো তাই দেখে আসছি। যারা এসব ত্যাগ-ট্যাগ করতে পারে তেমন একজনের মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি বাপু তাকে পুজো করবো।

অন্য সময় হলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যেত প্রেমার। কিন্তু একটা অন্ধকার টানেলের সামনে পড়ে যাওয়া সৈনিকের মতোই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। নিজেকে কোনমতে সংযত করে ওর নিষ্প্রভ চোখে বিদ্রোহের ঝিলিক খেলে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে কেশবের অনেকগুলো ছবির ভেতর থেকে সব থেকে খারাপ ছবিটা এনে বাবার সামনে রাখলো। কিছুটা উপে-ক্ষার ভঙ্গীতে ছবিটা তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু একবার তাকিয়েই ছবিটার প্রতি আকৃষ্ট হলেন ; কেশব লম্বা আর একটু রোগা হলেও ওর ছবিটাতে স্বাস্থ্য, সংযম আর শৃঙ্খলার ছাপ ছিল। মুখে প্রতিভার দীপ্তি ছিল না ঠিকই, কিন্তু এমন একটা বুদ্ধিমত্তা ফুটে উঠেছিল, যার উপর আস্থা রাখা যায়।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে ওর বাবা জিজ্ঞেস করলো—ছবিটা কার ?

লজ্জায় মাথা নিচু করে প্রেমা বললো—ও আমাদের ক্লাসে পড়ে।

'আমাদের জাতের ছেলে ?'

প্রেমার মুখটা মেঘলা হয়ে আসে। এই প্রশ্নের উত্তরটার ওপর ওর ভবিষ্যৎ ঝুলছে। শুধু শুধু ছবিটা নিয়ে আসার জন্য এখন ওর অনুশোচনা হচ্ছিল।

এই সরল প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর সব দৃঢ়তা যেন আলগা হয়ে গেল নিচু গলায় ও বললো—না, ওরা ব্রাহ্মণ। কথাটা বলেই ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল প্রেমা। ঘরের ভেতর ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। বাইরের দেয়ালটা ধরে দাঁড়িয়ে ও কেঁদে ফেললো।

লালাজী প্রথমটায় এমন রেগে গিয়েছিলেন, ভাবলেন মেয়েকে ডেকে সোজা-সুজি বলে দেন, এটা অসম্ভব। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন; কিন্তু প্রেমাকে কাঁদতে দেখে মনটা কেমন নরম হয়ে গেল।

এই যুবকটির বিষয়ে মেয়ের মনোভাব ওঁর কাছে আর গোপন রইলো না। উনি মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার পক্ষে। কিন্তু সেই সাথে বংশমর্যাদাও রক্ষা করতে চান। নিজের জাতের ভেতর থেকে সু-পাত্র পাবার জন্য উনি সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু তার বাইরে যোগ্য পাত্রের কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এর চেয়ে বড় কলংকের কথা উনি ভাবতেই পারেন না।

গম্ভীরভাবে উনি বললেন—আজ থেকে তোমার আর কলেজ যাবার দরকার নেই। শিক্ষাদীক্ষা যদি বংশমর্যাদা উপেক্ষা করতেই শেখায়, তবে তেমন শিক্ষায় কাজ নেই।

প্রেমা ছলছল চোখে বললো—সামনেই তো পরীক্ষা।

লালাজী জোর দিয়ে বললেন—থাকে, থাকুক।

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন।

॥ চার ॥

ছ মাস পার হয়ে গেছে।

একান্তে কিছু বলার জন্য স্ত্রীকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—যদ্দুর জেনেছি তাতে তো কেশবকে ভালো ছেলেই মনে হচ্ছে আর বুদ্ধিমানও বটে। ভয় হচ্ছে শোকে দুঃখে প্রেমা না কিছু করে বসে। তুমি আমি কত বোঝালাম আর পাঁচজনে বোঝালো, কিন্তু কোন ফল হলো বলে তো মনে হচ্ছে না। এখন কি করি বলো তো?

ওর স্ত্রী চিন্তিত হয়ে বললো—সবই বুঝলুম, কিন্তু এরপর মুখ দেখাবো কি করে? জানি না বাপু এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে কি করে পেটে ধরেছিলুম!

লালাজী অসন্তুষ্ট হলেন। একটু রেগেই বললেন—ও সব তো হাজার বার শুনেছি; কিন্তু বংশমর্যাদা নিয়ে আর কত ঘ্যানঘ্যান করবো। পায়ের শেকল খুলে দেবার পর পাখীটা আবার তোমার উঠোনে এসেই বসবে এমনটা ভাবলে ভুল করবে। ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভেবে দেখেছি আমি। কোন উপায় নেই, এ অবস্থায় অনেক কিছু মেনে নিতে হবে। বংশমর্যাদার দোহাই দিয়ে তো আর মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারি না। সবাই হাসবে, হাসুক। দিন আসছে, যখন আর এই সব জাতপাতের সংস্কার থাকবে না। আজকাল জাতপাতের বাইরেও অনেক বিয়ে

হচ্ছে। বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য যদি সুখে-শান্তিতে জীবন কাটানো হয়, তাহলে প্রেমার ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৃদ্ধা ক্ষুব্ধভাবে বলল—তোমার যদি তাই মনে হয়, তা'হলে আর আমায় জিজ্ঞেস করছো কেন ? আর এ বিয়েতে আমার কোন সায় থাকছে না। আমি ও মেয়ের মুখদর্শনও করবো না। আমাদের তো ছেলে নেই, ধরে নেবো প্রেমাও তেমনি মারা গেছে।

'তা তুমি কি করতে চাও বলো ?'

'ওই ছেলেটির সাথে বিয়ে দিচ্ছো না কেন, তাতে ক্ষতিটা কি হবে ? ও তো দু'বছরের মধ্যেই পাস করে ফিরবে। আর কেশবের বড় জোর কোথাও একটা কেরানীর কাজ-টাজই শুধু জুটবে।'

'কিন্তু প্রেমা যদি আত্মহত্যা-টত্যা করে বসে ?'

'করে করবে। তুমিই ওকে বেশি আস্কারা দিয়েছো। ও যখন আমাদের কোন পরোয়াই করে না, ওর জন্যই বা আমরা বংশমর্যাদা খোয়াতে যাব কেন ? আর আত্মহত্যা-টত্যা করা তো আর ছেলেখেলা নয়। আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। মনটা হলো ঘোড়ার মতো, লাগাম ছাড়লে তাকে বাঁধবে কি দিয়ে। আর তাছাড়া যে মেয়ের এতই জেদ সারা জীবন সে কেশবের সাথে ঘর করতে পারবে, তাই বা কে বলতে পারে ? আজ কেশবকে নিয়ে ও যেমন গদগদ, কাল অন্য কাউকে নিয়েও তো তেমন হতে পারে। আর এর জন্য তুমি দেখো নিজেদের বংশমর্যাদা ও নির্ঘাৎ খোয়াবে !'

স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে লালাজী বললেন—আর ও যদি কাল গিয়ে কেশবকে বিয়ে করে বসে, কি করবে ? তাতে তোমার মান থাকবে ? লজ্জা-সংকোচে কিংবা আমাদের কথা ভেবেই ও হয়তো কিছু করছে না। কিন্তু কাল যদি জেদ ধরে বসে, তুমি আমি কিছুই করতে পারবো না।

সমস্যার পরিণতি যে এত ভয়ানক হতে পারে বৃদ্ধা তা কল্পনাই করতে পারেননি। কথাটা গোলার মত তার মাথায় এসে ঘা মারলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ও'র মাথায় যেন কিছুই ঢুকছিল না। শেষটায় হার স্বীকার করে বললেন, 'তোমার সব উদ্ভট কথাবার্ত্তা। আজ পর্যন্ত কোন কুলীনের মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করেছে বলে আমি তো বাপু শুনিনি।

'বেশ, তুমি শোনোনি কিন্তু আমি শুনেছি এবং দেখেছিও। এরকম হতেই পারে।'

'যেদিন তেমন ঘটবে, সেদিনটাই হবে আমার জীবনের শেষ দিন।'

'বলছি না এমনটা হবেই, তবে হতেও তো পারে।'

'হতে যখন পারে, তখন সব ব্যবস্থা করলেই হয়। নাচতে যখন হবেই তখন আর ঘোমটা টেনে লাভ কি ! তুমি কালই কেশবকে ডেকে পাঠাও, দ্যাখো কি বলে।'

॥ পাঁচ ॥

সরকারী পেনসনে দিন কাটছিলো কেশবের বাবার। খিটখিটে স্বভাবের লোক আর অসম্ভব কঞ্জুস। শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তিনি যা কিছুটা শান্তি পান। ধারণা বোধের ভীষণ অভাব, অন্য কারো ভাবনাচিন্তার প্রতি ও'র কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। লোকটি তার বাল্য কৈশোরের ধ্যানধারণার মধ্যেই আটকে পড়ে আছে। নবযুগের প্রগতিকে ভাবতো মস্ত বড় সর্বনাশ, হাত পা গুটিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে থেকে বেচারী সব কিছুর আঁচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতো। এজন্যে প্রেমার বাবা যখন একদিন এসে কেশবের সাথে প্রেমার বিয়ের প্রস্তাব রাখলো, বুড়ো পণ্ডিতজী আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—ভাঙ-ফাঙ খেয়েছেন নাকি? এ ধরনের সম্বন্ধে আর যাই হোক বিয়ে হয় না। মনে হয় মশায়ের গায়েও নবযুগের হাওয়া লেগেছে।

নম্রভাবে প্রেমার বাবা বললো—আমি নিজেও এধরনের সম্বন্ধ পছন্দ করি না। এ ব্যাপারে আপনার যা মত আমারও তাই। কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমাকে অনন্যোপায় হয়েই আপনার কাছে আসতে হলো। আপনি তো জানেনই আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। আমাদের মত বয়স্ক লোকদের নিজেদের সিদ্ধান্ত বজায় রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার ভয়টা কি জানেন, নিরাশ হয়ে এরা আবার আত্মহত্যা-টত্যা না করে বসে। বুড়ো পণ্ডিতজী মেঝের ওপর পা ঠুকে চিৎকার করে উঠলেন—কি বলছেন মশাই! আপনার লজ্জা করে না? ব্রাহ্মণরা আর যাই করুক তা বলে বেণের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে? কুলীন বামুনের ঘরে মেয়ের অভাব ঘটলে না হয় এমন সমস্যা-টমস্যা হতে পারে। আমাকে এ ধরনের কথা বলার মত সাহস আপনার কোত্থেকে হলো বলুন তো?

বৃদ্ধ যতই নম্রভাবে কথা বলছিল পণ্ডিতজী ততই যেন বিগড়ে যাচ্ছিলেন। শেষটায় লালাজী আর অপমান সহ্য করতে না পেরে নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ফিরে এলেন।

এমনি সময় কলেজ থেকে ফিরলো কেশব। পণ্ডিতজী সংগে সংগে ওকে ডেকে রুক্ষভাবে বললেন—শুনছি, তুমি নাকি কোন্ এক বেণের মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছ। খবরটা কতদূর সত্যি?

কেশব কিছুই না জানার ভান করে সরলভাবে বললো—এসব আপনাকে কে বললো?

'যেই বলুক। আমি জানতে চাই কথাটা ঠিক কি না? যদি সত্যি হয়, ইতি-মধ্যেই যদি নিজের সর্বস্ব খুইয়ে থাকো তা'হলে জেনে রাখো এ বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবে না। আমার টাকা পয়সার এক কানাকড়িও তুমি পাবে না। এ বাড়ির যা কিছু, সব আমার নিজের রোজগারে। যাকে খুশি সব আমি দিয়ে যেতে

পারি, এটুকু অধিকার আমার আছে। এমনি অন্যায় করে এ বাড়িতে তোমার আর কোন জায়গা নেই।'

বাপের স্বভাব জানতো কেশব। প্রেমাকে সে ভালবাসে। গোপনে গোপনে প্রেমাকে সে বিয়ে করবে ভেবেছিল। বাপ তো আর চিরকাল থাকবে না। মার স্নেহ ভালোবাসার ওপর ওর ভরসা ছিল। প্রেমের জোয়ারে সব দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করতে রাজী ছিল কেশব। কিন্তু কাপুরুষ সৈনিক যেমন বন্দুকের মুখোমুখি হয়ে সমস্ত সাহস হারিয়ে পেছু হঠতে থাকে ওর অবস্থাও তেমনি হলো। আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতই নিজের সিদ্ধান্ত অটুট রাখার জন্য বিস্তর তর্ক করতে পারতো কেশব, এবং কথার তোড়ে নিজের মতামত জাহিরও করতে পারতো। কিন্তু সেজন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যদি জেদ ধরে বসে ও, আর বাবাও যদি তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল না সরে, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। ওর জীবনটাই যে বরবাদ হয়ে যাবে।

নিচু গলায় ও বললো—এ সব আপনাকে যেই বলুক, পুরোপুরি মিথ্যে কথা বলেছে।

পণ্ডিতজী এ কথায় কঠোর ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে এসব বাজে কথা ?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। একদম বাজে কথা।'

'তাহলে আজই এখুনি এই বেণেকে একটা চিঠি লিখে দাও। আর এ ধরনের কথাবার্তা যদি ভবিষ্যতে কখনো ওঠে, জেনে রেখো আমিই তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবো। ব্যস্, যাও।'

কেশব কোন কথাই বলতে পারলো না। ও চলে গেল। দেখে মনে হচ্ছিলো ও যেন আর নিজেকে টানতে পারছে না।

পরের দিন প্রেমা কেশবকে একটা চিঠি লিখলো।

প্রিয় কেশব,

তোমার শ্রদ্ধেয় পিতাজী আমার বাবা লালাজীর সাথে যে অশিষ্ট আর অপমানজনক ব্যবহার করেছেন, তা শুনে আমার খুবই ভয় হচ্ছে। হয়তো তোমাকেও ওভাবেই শাসিয়েছেন। এ অবস্থায় আমি তোমার মতামত জানার জন্য খুবই অধীর। তোমার জন্যে সবরকম কষ্ট স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত। তোমার বাবার বিষয়সম্পত্তিতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি তোমার ভালোবাসাই চাই আর তা নিয়েই খুশি হতে চাই। আজ সন্ধেয় আমাদের এখানে এসে খাবে। আমার বাবা-মা তোমার সংগে আলাপ করার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব। একদিন আমরা দু'জন সেই সূত্রে বাধা পড়বো যা কোনদিন ছেঁড়ে না—এই স্বপ্নেই আমি মশগুল। যতই বাধা আসুক সম্পর্কটা অটুট থাকবে।

তোমারই

প্রেমা।

সন্ধে হয়ে গেল কিন্তু চিঠির কোন উত্তর এল না। ওর মা বার বার জিজ্ঞেস করছে—কেশব এসেছে ? বুড়ো লালাজী দরজার দিকে চোখ রেখে বসে আছেন। ন'টা বেজে গেল ; কিন্তু না এল কেশব না ওর কোন চিঠি।

আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে লাগলো প্রেমা। হয়তো চিঠি লেখার কোন সময়ই পায়নি কেশব ; হয়তো আজ আসতে পারছে না, কাল নিশ্চয়ই আসবে। কেশব এর আগে ওকে যত চিঠিপত্র লিখেছিল, বারবার সেগুলো পড়তে লাগলো প্রেমা। এক একটা শব্দে কত অনুরাগ, কত কম্পন, কত সংশয় আর কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এমনকি ওর সামনে কতবার কেশব কেঁদেওছে। হাতের কাছে এত সব প্রমাণ স্মারক থাকতে নিরাশ হবার কোন কারণই নেই। তা সত্ত্বেও, সারাটা রাত ও যেন একটা মুলের ওপর ঝুলে রইলো।

সকাল বেলা কেশবের জবাব এল। কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি খুলে পড়লো প্রেমা। ওর হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। ওর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। লেখা ছিল, আমি নিজে খুবই সংকটে পড়েছি, তোমাকে আর কি জবাব দেবো। সমস্যাটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেচি, বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে বাবার আজ্ঞা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আমাকে কাপুরুষ ভেবো না। আমি স্বার্থপরও নই ; কিন্তু আমার সামনে যে বাধাটা এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে জয় করবার শক্তি আমার নেই। পুরোনো কথা ভুলে যেও। সেদিন আমি এরকম বাধার কথা কল্পনাও করিনি।'

দীর্ঘ, গভীর আর অশান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল প্রেমা। ওর দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল। যে কেশবকে মনে মনে ও স্বামী হিসেবে বরণ করে এসেছে, সে যে এতটা নিঠুর হতে পারে কল্পনাই করতে পারেনি প্রেমা। মনে হচ্ছিল, এতদিন ও যেন একটা রঙিন স্বপ্ন দেখছিল ; কিন্তু চোখ খুললেই সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জীবনের সব আশা লুপ্ত হয়ে গেলে, অন্ধকার ছাড়া আর কি-ই বা থাকে। হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে ও একটা নৌকো বানিয়েছিল, এখন সে নৌকো জলমগ্ন। এখন সে আর অন্য নৌকো কোথায় পাবে ? নৌকো যদি ডোবেই তো তার সাথে সেও ডুববে।

মা জিজ্ঞেস করলো—কেশবের চিঠি ?

মাটির দিকে চোখ রেখে প্রেমা বললো—হ্যাঁ, ওর শরীর ভালো নেই।

এছাড়া আর কি-ই বা বলবে। কেশবের শঠতা নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিয়ে লজ্জিত হবার মত সাহস আর ওর নেই।

সারাদিন ঘরের কাজকর্ম নিয়ে রইলো প্রেমা যেন ওর কোন ভাবনাই নেই। রাতে সবাইকে খেতে দিল, নিজেও খেল আর অনেক রাত পর্যন্ত হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলো।

সকাল বেলা, ঘরের ভেতর পড়ে ছিলো ওর প্রাণহীন দেহ। ভোরের সোনালী রোদ ওর ফর্সা মুখের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল জীবনের অন্য এক আভা।

ভাষান্তর : পার্থ বন্দোপাধ্যায়

মা

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরছে আজ। একদিন আগেই ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে করুণা। গত তিন বছর ধরে কঠিন পরিশ্রমে তিল তিল করে যে পাঁচ-দশটা টাকা জমিয়েছিলো তার সবটাই সে স্বামীর আপ্যায়ন আর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেই খরচ করে ফেলেছে। একজোড়া নতুন ধুতি কিনেছে স্বামীর জন্য, একটা নয়া কুর্তা বানিয়েছে আর ছেলেটাকে দিয়েছে নতুন কোট আর টুপি। বারবার ছেলেটাকে ওগুলো পরিয়ে আনন্দে ভরে উঠেছে ওর মন। সূর্য-কিরণের মতো বাচ্চাটা ওর এই অন্ধকার জীবনে এসে আলো না ছড়ালে এতদিনে আঘাতে আঘাতে শেষ হয়ে যেতো ও। স্বামীর জেল হবার তিন মাস পরে বাচ্চাটার জন্ম। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে এই তিন বছর কাটিয়েছে করুণা। ও ভাবতো—যখন এই বাচ্চাটা ওঁর সামনে নিয়ে যাবো কি খুশিই না হবেন উনি। প্রথমে তো আশ্চর্যই হয়ে যাবেন ওকে দেখে। তারপর কোলে তুলে নিয়ে হয়তো বলবেন—করুণা, এই রত্নটি দিয়ে আমার ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করেছো। জেলের যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা শিশুটার আধো আধো মিষ্টি বুলি শুনে ভুলে যাবো। ওর সরল, নিষ্পাপ, মোহময় চাউনিতে ধুয়ে যাবে ভেতরকার সমস্ত ব্যথা।…এসব কল্পনায় খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে করুণা। ও ভাবতে থাকে—আদিত্যর সাথে হয়তো অনেক লোকজন আসবে। ওরা যখন দরজার গোড়ায় পেঁছুবে 'জয়জয়-কার' আওয়াজে ছেয়ে যাবে আকাশ-বাতাস। কি স্বর্গীয় দৃশ্যই না হবে সেটা। ওইসব লোকেরা বসবে বলে ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে ও পান বানিয়ে রেখেছে আর আশায় আশায় বারবার তাকাচ্ছে দরজার বাইরে। স্বামীর ওই বলিষ্ঠ, উদার, তেজোদীপ্ত চেহারা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, বারবার মনে পড়ছে ওঁর যাবার সময় বলে যাওয়া কথাগুলো; ওঁর সেই ধৈর্য, সেই মনের জোর যা পুলিসের মারের মুখেও অবিচল রেখেছিলো ওকে; সেই গরিমা যা ওই মুহূর্তেও উজ্জ্বল রেখেছিলো ওঁর মুখচোখ; সেসব কি কোনদিনও ভুলতে পারবে করুণা? সেসব মনে পড়লেই করুণার ভেঙে পড়া মুখে আত্মগৌরবের ছোঁয়া লাগে। সেসবই তো ওর অবলম্বন, গত তিন বছর ধরে ঘোর দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ওগুলোই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অভাবে কতো রাত ও না খেয়ে কাটিয়েছে, কতো সন্ধেয় ঘরে বাতি জ্বালাতে পারেনি; তবু ওর চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখেনি কেউ। আজ ওর সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে। স্বামীর উষ্ণ আলিঙ্গনে সবকিছু হাসতে

হাসতে ভুলে যাবে। ওই হারানো সম্পদকে ফিরে পেলে আর কি চাই !

আকাশচারী পাখিরা নীড়ে ফিরছে বিশ্রামের জন্যে ; সন্ধ্যা সোনালী গালিচা বিছিয়ে, উজ্জ্বল ফুলের শয্যা সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। সেই সন্ধ্যার আবছা আলোতেই একজন লোককে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আসতে দেখলো করুণা। লাঠির শব্দ তো নয় যেন কোন ভাঙাচোরা মানুষ জীবন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে খক্ খক্ কাশছে। মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না করুণা। কিন্তু চালচলন দেখে বুড়োমানুষ বলেই ঠাওর হচ্ছে। একটু বাদেই আরো কাছে আসতেই করুণা চিনতে পারলো। উনিই তো ওর সেই ভালো-বাসার মানুষ। কিন্তু হায় ! ওর একি চেহারা ! সেই যৌবন, সেই তেজ, সেই চপ-লতা, সেই স্বাস্থ্য কোথায় পালিয়ে গেলো। পড়ে আছে শুধু হাড্ডিসার লিকলিকে একটা শরীর। সাথে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী, না আছে কোন পরিচিত বন্ধু। চিনতে পেরেই বাইরে বেরিয়ে এলো করুণা। ওর আলিংগনের ইচ্ছেটা দমন করলো মনে মনে। কল্পনার মস্ত প্রাসাদটাই ধুলোয় মিশে গেলো ; মনের যাবতীয় উল্লাস চোখের জলে ভেসে গেলো, হারিয়ে গেলো।

ঘরে পা দিয়েই একটু হেসে করুণার দিকে তাকালো আদিত্য। কিন্তু ওর চাউনিতেই ধরা আছে দুঃখময় এক সংসারের প্রতিচ্ছবি। সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেমন শিথিল হয়ে আসছে করুণার, বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসছে। ও নিষ্কম্প দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন চোখের সামনে যা দেখছে তা সত্যি নয়। ওঁকে ঘরে ডেকে আনলো ; কিন্তু দুঃখ শোকের একটা টুঁ শব্দও ওর মুখ দিয়ে বেরোলো না। ওর কোলে বসে বাচ্চাটাও কেমন ভয়ের দৃষ্টিতে এই কঙ্কালসার বুড়োকে দেখছিলো আর বারবার জাপটে ধরছিলো মাকে।

তবুও শেষমেশ ক্ষীণ গলায় বললো করুণা—তোমার একি দশা হয়েছে ? একদম চেনাই যায় না।

স্ত্রীর দুর্ভাবনাকে কমানোর জন্য একটু হাসবার চেষ্টা করে আদিত্য ; বললো —কই কিছু না তো। একটু রোগা হয়ে গেছি। তোমার হাতে খাওয়াদাওয়া করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

করুণা—ইস্। বুক পিঠ এক হয়ে গেছে তোমার। কেন, ওখানে কি ভর-পেট খাওয়াও পেতে না ? তুমি তো বলতে, রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে ওরা খুব ভালো ব্যবহার করে। আর তোমার সেইসব বন্ধুবান্ধবই বা কোথায় যারা তোমাকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রাখতো—তোমার ঘামের বদলায় যারা নিজেদের রক্ত ঢালবার জন্য তৈরী ছিলো ?

রেগে উঠলো আদিত্য। বললো—সে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা করুণা। আমি বুঝতে পারিনি আমার জেল হলে লোকে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কোন কথাবার্তা বলবে না। রাষ্ট্রের নামে জীবন দিতে যারা তৈরী তাদের জন্য এ পুরস্কারই প্রাপ্য, তা আমার জানা ছিলো না। জনতা তার সেবককে তাড়াতাড়ি

ভুলে যায় এটা আমি জানতাম। কিন্তু নিজের সাথী সহযোগীরা এরকম বিশ্বাস-ঘাতক হয় সেটা এই প্রথমবার বুঝলাম। কারো ওপর রাগ নেই আমার। সেবা নিজেই নিজের পুরস্কার। আমার ভুল হয়েছিলো; সেবার বিনিময়ে আমি যশ আর নামের জন্য কাঙাল হয়েছিলাম।

করুণা—তাহলে ওখানে তুমি খেতে পেতে না?

আদিত্য—ওসব জিজ্ঞেস করো না করুণা, বড় কষ্ট হয়। বেঁচে ফিরে এসেছি এই আমাদের সৌভাগ্য ভাবতে হবে। তোমাকে দেখব সেই আশাতেই হয়তো বেঁচে আছি নইলে এতো কষ্টভোগের পরেও মরে গেলাম না কেন? একটু শোব। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। সারাদিন ধরে এতোটা পথ হেঁটে এসেছি।

করুণা—তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেবে চলো। তারপর আরাম করে শুয়ে পড়ো। (ছেলেটাকে ওর কোলে তুলে দিয়ে) এই তোর বাবা বাছা, তোর বাবা। ওঁর কোলে যা, তোকে আদর করবে।

জলভরা চোখে ছেলেকে দেখলো আদিত্য। শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ যেন ওকে এখন তিরস্কার করছে। নিজের চরম দুরবস্থায়ও এতো কষ্ট পায়নি ও। ঈশ্বরের দয়ায় যদি কখনো ওর এই দুরবস্থার অবসান হয়, তবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দিকে পা বাড়াবার নামও আর নেবে না। ফুলের মতো এই শিশুকে সংসারে এনে এখন ওকে দারিদ্র্যের আগুনে আহুতি দেওয়ার কি অধিকার আছে ওর? ও এখন লক্ষ্মীর উপাসনা করবে আর বাচ্চাটার দেখাশোনা করে জীবন কাটাবে। ওর হঠাৎ মনে হলো বাচ্চাটা যেন ওর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন বলছে—আমার প্রতি কোন কর্তব্য পালন করেছেন কি আপনি? ছেলেটাকে আদর করার জন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলো ও, কিন্তু হাত বাড়াতে পারলো না। হাতে যেন কোন চেতনা নেই, শক্তি নেই।

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলো করুণা। একটু বাদে থালা করে খাবার নিয়ে ফিরে এলো। হাভাতে দৃষ্টি নিয়ে থালাটাকে দেখলো আদিত্য—যেন বহুদিন বাদে কোন খাবার জিনিস ওর সামনে আনা হয়েছে। ও জানতো দীর্ঘ উপবাসের পর এই হতশ্রী চেহারায় জিভকে বশে রাখা উচিত। কিন্তু সবুর করতে পারলো না সে, থালার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো আর দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেলো থালা। শঙ্কিত হয়ে উঠলো করুণা। দ্বিতীয়বার কিছু চাইলো না ও। থালা উঠিয়ে নিয়ে যেতে যেতে করুণার মন বলতে থাকলো—ওকে তো কোনদিন এতো খেতে দেখিনি।

করুণা তখন বাচ্চাকে কিছু যেন খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো কে যেন ডাকছে—করুণা!

ঘরে এসে করুণা জিজ্ঞেস করলো—কি, তুমি আমাকে ডাকছো?

কি রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আদিত্যর মুখ চোখ। জোরে জোরে শ্বাস টানছে। হাতে মাথা রেখে ঐ মাদুরের ওপরেই শুয়ে পড়েছে। ওঁর এই হাল

দেখে ঘাবড়ে গেলো করুণা। বললো—কোন বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসবো ?

হাতের ইশারায় বারণ করে আদিত্য বললো—বৃথা চেষ্টা কোরো না, করুণা। তোমার কাছে লুকিয়ে আর লাভ কী। আমার যক্ষ্মা হয়েছে। এর আগেই মরতে মরতে বেঁচেছি। তোমাদের দেখার ইচ্ছে ছিলো, সেজন্যেই হয়তো এতোদিন মরিনি। দ্যাখো, কেঁদো না, কেঁদে কোন লাভ হবে না।

ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা কান্না চাপতে চাপতে করুণা বললো—আমি এখুনি বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসছি।

আবার মাথা নাড়লো আদিত্য—না করুণা, শুধু আমার পাশে বসে থাকো। আর কেউই কিছু করতে পারবে না। ডাক্তার অনেকদিন আগেই জবাব দিয়েছে। আমার আশ্চর্য লাগছে এ্যাদ্দুর আমি এলাম কি করে। না জানি কোন দেবী আমাকে এ শক্তি যুগিয়েছে। হয়তো বা প্রদীপ নিভে যাবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে উঠেছে। আহ্ ! তোমার প্রতি বড় অন্যায় করেছি আমি। এই দুঃখ রয়ে গেলো। কোন সুখই তো দিতে পারলাম না তোমাকে। কিছুই করতে পারলাম না তোমার জন্য। শুধুমাত্র নিরালম্ব ভালবাসা জানিয়ে আর একটা বাচ্চাকে পালন করার দায়িত্ব দিয়ে চলে যাচ্ছি। আহ্ !

মনটাকে শক্ত করে করুণা বললো—তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ? আগুন সাজিয়ে আনি ? কিছু বলছো না কেন ?

পাশ ফিরে আদিত্য বললো—কিছুই করার দরকার নেই গো। কোন কষ্ট নেই। মনে হচ্ছে মনটা কোন অতলে হারিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে জলের অতলে ডুবে যাচ্ছি। জীবনের সমস্ত খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আলো নিভে আসছে। জানি না কখন কথা বন্ধ হয়ে যাবে। যা কিছু বলার, যা জানানোর সব এখনই বলে যাই। এই আশা অপূর্ণ রেখে মরবো কী করে ? আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ; জিজ্ঞেস করবো ?

করুণার মনের সমস্ত দুর্বলতা, দুঃখ, বেদনা যেন দূর হয়ে গেলো, আর কোথা থেকে সেই শক্তি এলো যা মৃত্যুর মুখে হাসতে শেখায়, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করতে শেখায়। রত্নখচিত খাপে যেমন তলোয়ার ঢাকা থাকে, জলের ধীর গতির মধ্যেও যেমন অসম্ভব শক্তি লুকিয়ে থাকে তেমনি সাহস আর ধৈর্য তার কোমল হৃদয়ে লুকিয়ে রয়েছে এই রমণী। ক্রোধ যেমন তলোয়ারকে বাইরে বের করে আনে, বিজ্ঞান যেমন জল থেকে জলশক্তির উদ্ভাবন ঘটায় তেমনি প্রেম এই রমণীর সাহস আর ধৈর্যকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

স্বামীর মাথায় নিজের হাত রেখে করুণা বললো—ওগো জিজ্ঞেস করছো না কেন তুমি ?

করুণার হাতের কোমল ছোঁয়া অনুভব করতে করতে আদিত্য বললো—তুমি আমার জীবনটাকে কিভাবে বিচার করেছো ? তা কি ক্ষমা করা যায় ? দ্যাখো, তুমি কখনো রেখে-ঢেকে কোনদিন কিছু বলোনি। এখনো স্পষ্ট কথাই বলবে। তোমার

বিচারে জীবনের এই শেষ মাথায় পেঁাছে হাসতে হাসতে মরা উচিত না কাঁদতে কাঁদতে ?

করুণা মুখে আনন্দের দ্যুতি এনে বললো—ওগো এসব প্রশ্ন কেন জিজ্ঞেস করছো ? আমি কি কখনো তোমাকে উপেক্ষা করেছি ? তোমার জীবন দেবতার মতো—নিঃস্বার্থ, নির্লিপ্ত আর আদর্শে উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে রাগ হয় তোমাকে সংসারে টেনে আনার চেষ্টা করেছি বলে ; কিন্তু তখন কি ছাই আমি জানতাম কী উঁচু আসন থেকে তোমাকে নামাচ্ছি। তখন যদি সংসারের মায়াজালে জড়িয়ে যেতে তবে হয়তো খুশীই হতাম আমি। কিন্তু এখন যেমন হচ্ছে, এই গর্ব আর উল্লাস তখন কি আর এমন হোতো ? আমি যদি কাউকে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ করি তাহলে বলবো,—তার জীবন যেন তোমার মতো হয়।

বলতে বলতে করুণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আদিত্য সগর্বে করুণাকে দেখে বললো—ব্যস্ আমি সব বুঝেছি করুণা, আনন্দে ভরে উঠেছে আমার মন। এই বাচ্চাটার ব্যাপারে আমার আর কোন ভয় নেই। ছেলেকে এর চেয়ে যোগ্য কারো হাতে তুলে দেবার কথা আমি ভাবতে পারি না। জীবনের এই উঁচু পবিত্র আদর্শ তোমার সামনে বরাবর থাকবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি এবার মরার জন্য তৈরী।

॥ দুই ॥

সাত বছর কেটে গেছে।

প্রকাশ আজ দশ বছরের কিশোর। সুশ্রী, হাসিখুশি, বলিষ্ঠ, তেজী, সাহসী আর প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। ভয়ডর কি জিনিস তা ও জানে না। করুণার সন্ত্রস্ত মন ওকে দেখে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দুনিয়া করুণাকে অভাগিনী আর দুঃখী বলে জানে। কিন্তু করুণা নিজে কখনো ভাগ্যের দোষ দেয় না। স্বামী বেঁচে থাকতে যা ওর জীবনে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল সেই গয়নাপত্তরগুলো সব বেচে দিলো। ঐ টাকা দিয়ে কিনলো কিছু গরু মোষ। নিজে চাষীর মেয়ে। গরু মোষ দেখাশোনা করা ওর কাছে কিছুও নতুন নয়। এটাই ওর জীবিকার রাস্তা হলো এখন। খাঁটি দুধ কী যেখানে সেখানে মেলে ? হাতে হাতে সব দুধ বিক্রী হয়ে যেতো। রাত থাকতে উঠে সন্ধে পর্যন্ত টানা কাজ করতো করুণা, কিন্তু তাতে ওর কোনরকম দুঃখ ছিলো না। বরং সাহস আর সংকল্পে অটল মুখ, দুঃখ হতাশা কোন ছাপ ফেলতে পারেনি সেখানে। আত্ম-গরিমার জ্যোতি শরীরের প্রত্যেকটা অংগে ফুটে বেরোচ্ছে ; চোখে উজ্জ্বলতার আভাস, গম্ভীর, গভীর আর অসীমে বিস্তৃত। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বৈধব্যের শোক আর ভাগ্যের পরিহাস—ওর এই ভাব-গম্ভীর মূর্তির কাছে হার মেনে ফিরে গেছে। প্রকাশের জন্য কি খাটুনিই না ও খাটে। ওর সমস্ত আনন্দ, সাধ আহ্লাদ, ওর নিজস্ব দুনিয়া, ওর স্বর্গ সবই প্রকাশ। কিন্তু তাই বলে করুণা এমনও নয় যে প্রকাশ কোন দুষ্টুমি কি বদমাইশী করলে তা

থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকবে। না, বড় কঠোরতার সাথেই সে ওকে শাসন করে। ও তো শুধু প্রকাশের মা'ই নয়, একসাথে মা-বাপ দুই-ই। ওর পুত্রস্নেহে মার মমতার সাথে বাবার কঠোরতা মিলে মিশে থাকে। স্বামীর মরবার আগের কথাগুলো এখনও ওর কানে বাজে গুণগুণ করে। মরবার আগে ও'র চেহারার সেই উজ্জ্বলতা সেই আভা যা ছেয়ে গিয়েছিলো স্বামীর সারা মুখে চোখে তা এখনও চোখের সামনে ভাসে করুণার। সারাক্ষণ স্বামী-চিন্তার ফলে আদিত্যকে যেন সব সময় চোখের সামনেই দেখতে পায়, সারাক্ষণ ও'র উপস্থিতি অনুভব করতে পারে করুণা আর মনে হয় আদিত্যর আত্মা সব সময় নানা বিপদ-আপদ থেকে ওকে রক্ষা করছে। ওর মনের একান্ত ইচ্ছে বড় হয়ে প্রকাশ যেন বাবার পথেই যায়।

সন্ধে হয়েছে। একজন ভিখারিণী দরজায় ভিক্ষে চাইছে। করুণা সে সময় গরুগুলোকে জাবর খাওয়াচ্ছিলো। প্রকাশ খেলছিলো বাইরে। হঠাৎ এদিকে ওর চোখ পড়লো। সাথে সাথে মাথায় চাগাড় দিলো শয়তানী বুদ্ধি। ঘরে গিয়ে ফেলে দেওয়া আনাজের শেকড়ের দিকের মাটি লাগা টুকরো-টাকরাগুলো একটা পাত্রে ভরে নিয়ে এলো। ভিখারিণী তখন নিজের ঝুলিটা ফাঁক করলো। ওগুলোই ঐ ঝুলিতে ঢেলে দিতে দিতে দূরে সরে গেলো প্রকাশ।

রেগে আগুন হয়ে ভিখারিণী বললো—বাহ্, চাঁদু বাহ্! হুঁ, আবার হাসছে দ্যাখো। মা-বাপ এই শিখিয়েছে! তবে তো ভালই, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবি!

করুণা ওর চ্যাঁচামেচি শুনে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে মা? কাকে বলছো ওসব?

ভিখারিণী প্রকাশকে দেখিয়ে বললো—ওই ছেলেটি তোমার না? দ্যাখো ঝুলিতে কেমন জঞ্জাল ঢেলে দিয়েছে। আটা ছিলো ভেতরে, এখন ওটাও নষ্ট হয়ে গেলো। গরীব দুঃখীর সাথে কেউ এরকম ব্যবহার করে? সবার দিন এক রকম থাকে না। দেমাকের এতো গরম ভালো না।

কঠোর গলায় ডাকলো করুণা—প্রকাশ!

প্রকাশ কিন্তু একফোঁটাও লজ্জিত নয়। মাথা উঁচু করেই এসে বললো—আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে আসে কেন? কোন কাজ করতে পারে না?

করুণা ধমকে বোঝানোর চেষ্টা করলো—তোমার লজ্জা করছে না? উল্টে আবার মুখের ওপর কথা বলছো?

প্রকাশ—লজ্জার কি আছে? ও রোজ রোজ ভিক্ষে চাইতে আসবে কেন? আমাদের কি সবকিছু মাগনায় আসে!

করুণা—তোমার যদি কিছু না দেয়ার থাকে তো বলে দেবে, তা বলে এরকম অসভ্যতা করেছো কেন?

প্রকাশ—এমন না করলে ওদের শিক্ষা হয় না।

রেগে উঠলো করুণা—এবার কিন্তু মারবো তোমাকে।

প্রকাশ—কেন, মারবে কেন? জবরদস্তি মারলেই হলো? অন্য সব জায়-

গায় ভিক্ষে করলে এখন জেল হয়ে যায়, জানো ? আর এখানে ভিক্ষে তো করবেই, আবার উল্টে চোখও রাঙাবে।

করুণা—যে পঙ্গু সে কাজ করবে কি করে ?

প্রকাশ—তাহলে গিয়ে ডুবে মরুক ; বেঁচে থেকে কি লাভ ?

করুণা চুপ হয়ে গেলো। বুড়িটাকে আটা-ডাল দিয়ে বিদায় করলো কিন্তু প্রকাশের মুখের জবাবগুলো শুনে ভেতরটা যেন জ্বলতে লাগলো। কোত্থেকে শিখলো এই অসভ্যতা, এই ঔদ্ধত্য। রাতে এসব চিন্তাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে প্রকাশ দেখে লন্ঠন জ্বলছে। লন্ঠনের সামনে বসে করুণা। উঠে বসে ডাকলো—মা, তুমি এখনো শোওনি ?

মুখ ঘুরিয়ে বললো করুণা—ঘুম পাচ্ছে না। তুমি জেগে উঠলে কি করে ? তেষ্টা পেয়েছে !

প্রকাশ—না মা, কি জানি কেন ঘুম ভেঙে গেলো—আমি আজ খুব খারাপ কাজ করেছি মা—

গভীর মমতায় ওর মুখের দিকে তাকালো করুণা।

প্রকাশ—বুড়িটার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তুমি ক্ষমা করো। আর কক্ষণো এ রকম দুষ্টুমি করবো না।

এই বলে কাঁদতে লাগলো। করুণা উঠে ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বললো—বাবা, আমাকে খুশী করার জন্য এসব বলছো না সত্যি সত্যিই তুমি বুঝেছো যে কাজটা খারাপ ?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে প্রকাশ বললো—না মা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আবার যখন ঐ বুড়িটা আসবে আমি তখন অনেক অনেক পয়সা দেবো ওকে।

করুণার মন এতে গললো। মনে হলো, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে আশীর্বাদ করছে আর বলছে, করুণা, দুঃখ পেয়ো না, প্রকাশ ওর বাবার নাম উজ্জ্বল করবে। তোমার সব মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

॥ তিন ॥

কিন্তু প্রকাশের কথায় আর কাজে কোন মিল দেখা গেলো না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রে কাজের দিকটাই আসল হয়ে উঠলো। কিছু বিষয়-সম্পত্তি, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি, তাছাড়া করুণাও যথাসাধ্য করে ওর জন্যে ; কিন্তু তবু কখনো ওর পয়সায় কুলোয় না। মিতব্যয়িতা এবং সাধারণ জীবন যাপনের নীতি-আদর্শের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য রাখতে পারে কিন্তু নয়া নয়া ফ্যাশনের প্রতি ওর দুর্বলতাও কিছুমাত্র কম নয়। নতুন ডিজাইনের পোশাক-আশাকের ওপর ওর বেশ লোভ। ওর ভেতরে মন আর বুদ্ধিতে সব সময়েই দ্বন্দ্ব। মন ওর জাতির কল্যাণে আর বুদ্ধি এই ধরনের জীবন যাপনের দিকে। অবশ্য বুদ্ধি প্রায় সব

সময়েই মনকে দাবিয়ে রাখে। আর জাতিসেবা তো অনুর্বর জমি, ওখান থেকে বড়জোর গৌরব আর যশের ফসল উপহার পাওয়া যেতে পারে। আর তাও স্থায়ী নয়, লাভের ঘরে বিশেষ কিছুই যোগ হয় না। মন ওর অনিবার্য নিয়মেই বিলাসবহুল জীবনের দিকে ক্রমশ ঝুঁকতে থাকে। ত্যাগ আর সেবাকেও সে ঘৃণা করতে শুরু করে আস্তে আস্তে। গরীবী আর দুরবস্থাকে মেনে নিতে পারে না কিছুতেই। হৃদয়ে ওর আস্থা নেই, কল্পনাতেও নেই কোনো বিশ্বাস ওর আছে শুধু বাস্তব চিন্তার জগৎ। সেখানে দুঃখের জায়গা কোথায়, দয়ারই বা জায়গা কোথায়? সেখানে বাসা বেঁধে আছে আত্মমুখী যুক্তি, সাহস আর দৃঢ় সংকল্প।

সিন্ধে বন্যা হলো। প্রাণ হারালো হাজার হাজার মানুষ। কলেজ থেকে একটা সেবা সমিতি পাঠানো হবে। প্রকাশের মন দো-টানায় দুলতে লাগলো—যাবো কি যাবো না। একটু আগে থেকেই পড়াশুনা শুরু করলে প্রথম শ্রেণীতে পাস করতে পারবে। সিন্ধে যাওয়ার সময় ও জ্বরের ভান করলো। করুণা লিখলো—তুমি সিন্ধে যাওনি এতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। জ্বর নিয়েও তো তুমি যেতে পারতে। সমিতিতে নিশ্চয়ই ডাক্তার ছিলো। করুণার সে চিঠির কোন উত্তর দেয়নি প্রকাশ।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ। মাছির মতো লোক মরছে সেখানে। কংগ্রেস পীড়িতদের জন্যে এক মিশন পাঠাচ্ছে। ঠিক সে সময়েই কলেজ থেকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাব্য ইতিহাসের ছাত্রদের লংকায় পাঠানো হচ্ছে। করুণা প্রকাশকে লিখলো—তুমি উড়িষ্যায় যাও। কিন্তু প্রকাশের নিজের ইচ্ছে লংকায় যাওয়ার। কিছুদিন দোটানায় ভুগলো প্রকাশ। শেষমেষ শ্রীলঙ্কাই জিতলো। এবার কিন্তু আর কিছু লিখলো না করুণা। চুপচাপ কাঁদলো একা একা।

শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরে ছুটিতে ঘরে ফিরেছে প্রকাশ। করুণা একটু রাগ-রাগ ভাব করে থাকলো। মনে মনে লজ্জিত হয়ে প্রকাশ ঠিক করলো এরপর যদি কোন সুযোগ আসে তো মাকে খুশি করবেই। এবং সেই মত কলেজে ফিরে গেলো। কিন্তু ওখানে গিয়েই আবার সেই পরীক্ষার পড়া। আর পরীক্ষাও চলে এসেছে সামনে। কিন্তু পরীক্ষার পরে ছুটিতে প্রকাশ বাড়ি ফিরলো না। কলেজের একজন অধ্যাপক কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছেন। তাঁর সাথেই কাশ্মীর রওনা হলো প্রকাশ। যখন পরীক্ষার ফল বেরোল আর জানতে পারলো প্রথম হয়েছে তখন বাড়ির কথা মনে পড়লো প্রকাশের। সাথে সাথে করুণাকে একটা চিঠি লিখলো। ও যে তাড়াতাড়ি ফিরবে সেটাও জানালো। মাকে খুশি করার জন্য জাতি-সেবা নিয়েও দু-চার কথা লিখে দিয়েছে—এবার তোমার আদেশ পালনের জন্য তৈরী। শিক্ষা বিষয়ে কাজকর্ম করবো বলেই ঠিক করেছি। এর জন্যেই তো এতসব পড়াশোনা। এখনো উপাধির মোহ থেকে নেতারা মুক্ত নয়। এই উপাধি পেয়ে বাস্তবে সেবাধর্মের ব্যাপারে আমি একটা বাধা সরালাম। আমাদের নেতারা উপাধি, ডিগ্রিকে যতোটা সম্মান করে, যোগ্যতা, উৎসাহ বা ভালোবাসাকে ততোটা

সম্মান দেখায় না। এখানে সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করবে আর মর্যাদাপূর্ণ কাজ করতে দেবে ; আগে হলে কিন্তু দিতো না।

আবার আশায় বুক বাঁধলো করুণা।

॥ চার ॥

কলেজ খুলতে না খুলতেই প্রকাশের কাছে রেজিস্ট্রারের এক চিঠি এলো। উনি প্রকাশের ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশোনা করার সরকারী বৃত্তি অনুমোদন করেছেন। চিঠি হাতে নিয়ে খুশিতে পাগল হয়ে গিয়ে সে মাকে বললো—মা, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়ার সরকারী বৃত্তি পেয়ে গেছি।

উদাস স্বরে করুণা জিজ্ঞেস করলো—এই কি তোমার ইচ্ছে ?

প্রকাশ—আমার ইচ্ছে ? এরকম সুযোগ পেয়ে কেউ ছাড়ে নাকি ?

করুণা—তুমি তো স্বয়ংসেবকে ভর্তি হতে যাচ্ছিলে ?

প্রকাশ—তুমি কি মনে কর স্বয়ংসেবক তৈরী হওয়া মানেই জাতি-সেবা ? ইংল্যাণ্ড থেকে এসেও তো আমি সেবা করতে পারি। আর মা, সত্যি বল তো, একজন ম্যাজিস্ট্রেট তার দেশকে যা উপকার করতে পারে এক হাজার স্বয়ংসেবক মিলেও কি তা করা সম্ভব ! আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসবো আর এও জানি আমি পাস করবোই।

আশ্চর্য হয়ে করুণা জিজ্ঞেস করলো—তাহলে তুমি ম্যাজিস্ট্রেটই হবে ?

প্রকাশ—সেবাপরায়ণ একজন ম্যাজিস্ট্রেট কংগ্রেসের এক হাজার সভাপতির চেয়েও বেশী উপকার করতে পারে। খবরের কাগজ হয়তো ওদের লম্বা-চওড়া স্তুতি করবে না, ওদের বক্তৃতা শুনে লোকে হয়তো হাততালি দেবে না, ওদের পেছনে জনতা হয়তো মিছিলে সামিল হবে না, বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও হয়েতো ওদের মানপত্র দেবে না, আসল সেবা তবু কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটরাই করলে করতে পারে।

করুণা আপত্তি জানালো—কিন্তু ঐ ম্যাজিস্ট্রেটই তো জাতির সেবকদের সাজা দেয়। ওদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দেয়।

প্রকাশ—ম্যাজিস্ট্রেটের ভেতর পরোপকারের ইচ্ছে থাকলে গুলি চালিয়েও যা করা যায় না তা ভালবেসে বুঝিয়ে শুনিয়ে করাতে পারে।

করুণা—আমি এসব মানি না। সরকার তার চাকরকে এ স্বাধীনতা দেয় না। সরকার একটা নীতি বেঁধে দেয় আর সরকারী চাকরদের সেটা মেনেই চলতে হয়। সরকারের প্রথম নীতি হলো দিন দিন আরও সংগঠিত, আরও দৃঢ় হও। আর এর জন্য জনতার স্বাধীনতার ইচ্ছেকে দমন করা জরুরী। আর কোন ম্যাজিস্ট্রেট এর বিপক্ষে কাজ করলে আর ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করতে হবে না। যে তোমার বাবাকে সামান্য কারণে তিন বছরের জন্য সাজা দিয়েছিলো সে তো হিন্দুস্থানী ম্যাজিস্ট্রেটই ছিলো। সেই সাজাই তোমার বাবার প্রাণ নিয়েছে এ কথাটা খেয়াল রেখো। সরকারী চাকরিতে যেয়ো না। তুমি মোটা খেয়ে মোটা পরে দেশের জন্য কিছু

করো সেটাই আমার কাম্য, এর বদলে হাকিম হয়ে বড়োলোকী চালে জীবন কাটাবে সেটা আমার সহ্য হবে না। মনে রেখো যেদিন তুমি ঐ হাকিমের চেয়ারটায় বসবে সেদিন থেকে তোমার মানসিকতাও হাকিমের মতোই হয়ে যাবে। তুমি তখন চাইবে অফিসার বলে তোমার জীবনে অনেক সুখ্যাতি আর উন্নতি হোক। গাঁয়ের একটা উপমা শোন। মেয়েরা যতদিন কুমারী থাকে বাপের বাড়িটাই তার নিজের ঘরদোর সবকিছু মনে করে। কিন্তু বিয়ের পর যখনই শ্বশুরবাড়ি যায় তখন ঐ বাপের বাড়িটাই অন্যের বাড়ি বলে মনে হয়। মা-বাপ, ভাই-বোন সব ওখানে থাকে তবু ঐ ঘর আপন নয়। এই তো দুনিয়ার নিয়ম।

বিরক্তির সঙ্গে প্রকাশ বললো—তাহলে তুমি চাও যে সারা জীবনভর চারধার থেকে ঠোকর খেতে খেতে আমি মরি?

কঠিন চোখে তাকিয়ে বললো করুণা—যদি ঠোকর খেয়েও স্বাধীন মন নিয়ে বেঁচে থাকা যায় তবে আমি বলবো ঠোকর খাওয়া ভালো।

প্রকাশ একইভাবে জিজ্ঞেস করলো—তাহলে তোমার ইচ্ছা তাই?

করুণাও কঠিন স্বরেই উত্তর দিলো—হ্যাঁ, তাই।

কোন উত্তর দিলো না প্রকাশ। উঠে পড়লো সেখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রারকে অসম্মতির কথা জানিয়ে চিঠি লিখে দিলো। কিন্তু ওর মনটাও কেমন বিগড়ে গেলো সেই সাথে। বিরক্ত আর আনমনা হয়ে ঘরে পড়ে থাকে সারাক্ষণ, না কারোর সাথে দেখা করে, না কখনো বাইরে বেরোয়। মুখ ভার করে ঘর-বার করে। এভাবেই কাটলো এক মাস। চেহারায় সেই চাকচিক্য আর নেই, না আছে সেই তেজ। সারাক্ষণ ব্যথায় ভারাক্রান্ত মুখ, হাসতে যেন ভুলে গেছে, মনে হয় ঐ চিঠিটার সাথে ও পাঠিয়ে দিয়েছে ওর সমস্ত চপলতা আর সজীবতা। করুণা ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে দুঃখ ভোলানোর নানা চেষ্টা করলো কিন্তু কোন লাভ হলো না তাতে।

শেষে একদিন আর না থাকতে পেরে প্রকাশকে বললো করুণা—তুমি যখন বিলেত যাবে বলে ঠিকই করেছো তখন যাও। আমি আর বারণ করবো না। তোমাকে যেতে দিইনি বলে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমি বারণ করেছিলাম এই ভেবে যে তোমাকে জাতি-সেবা করতে দেখলে তোমার বাবার আত্মা খুশী হতো। মরবার সময় সেকথাই উনি বলে গিয়েছিলেন।

ঝাঁঝের সঙ্গে প্রকাশ জবাব দিলো—আর কি করে যাবো! অসম্মতি জানিয়ে চিঠি দিয়ে দিয়েছি। আমার জন্য থোড়াই এ্যাদ্দিন বসে থাকবে। অন্য কাউকে ঠিক করে ফেলেছে। আর কি করা যাবে। তোমার যখন মর্জি—আমি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে মরি তখন তা-ই করবো।

সমস্ত গর্ব ধুলোয় মিশে গেলো করুণার। ও চেয়েছিলো ওকে আটকে রাখতে কিন্তু পারলো না। বললো—দ্যাখো, এখনো হয়তো কেউ যায়নি। লিখে দাও তুমি যাওয়ার জন্য তৈরী।

রেগে উঠলো প্রকাশ—আর কিছুই হবে না এখন। লোক হাসিয়ে কি লাভ। আমি ঠিক করে নিয়েছি তোমার ইচ্ছে মতোই চলবো।

করুণা—তুমি যদি ভালো মনে তা করতে তবে তো কথাই ছিলো না। এ তো এক ধরনের সত্যাগ্রহ করছো আমার বিরুদ্ধে। আমাকে তো তুমি এখন তোমার রাস্তার কাঁটা মনে করছো। মনের ইচ্ছে চেপে কথা রাখবে, কি লাভ তাতে! আমি ভেবেছিলাম তোমার মন নিজের থেকেই দেশসেবার জন্য তৈরী হয়েছে। না, তুমি আজই রেজিস্ট্রার সাহেবকে চিঠি লিখে দাও।

প্রকাশ—আর লিখতে পারবো না।

—এভাবে মনমরা হয়ে বসে থাকবে?

—কিছু করতে ভাল্লাগছে না।

আর কিছু বললো না করুণা। কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ দেখলো করুণা কোথাও বেরোচ্ছে। কিন্তু কিছু তো বলে গেলো না ওকে। করুণার পক্ষে বাইরে যাওয়া আসা অসাধারণ কোন ঘটনা নয়। কিন্তু সন্ধের পরেও যখন করুণা ফিরলো না তখন প্রকাশের চিন্তা শুরু হলো। কোথায় গেলো মা? প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

সারারাত দাওয়ায় বসে রইলো প্রকাশ। নানারকম ভয়-ভাবনা গেড়ে বসতে লাগলো মনে। এখন মনে পড়ছে যাওয়ার সময় কি ভীষণ উদাস ছিলো করুণা। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। কিন্তু এসব কথা তো যাওয়ার সময় মনে হয়নি প্রকাশের। তবে কি স্বার্থের জন্য ও অন্ধ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, এখন প্রকাশের মনে পড়ছে তার মার পরণেও ছিলো পরিষ্কার ধোওয়া কাপড়। সাথে ছাতাটাও ছিলো। তাহলে কি অনেক-অনেক দূরে গেছে মা? কাকে জিজ্ঞেস করবে? অনিষ্টের ভয়ে প্রকাশ কাঁদতে শুরু করলো।

বাইরে শ্রাবণের ভীষণ অন্ধকার রাত। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। বাইরের রূপ এখন ভয়াল। কিছুক্ষণ বাদে বাদে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে প্রকাশ আর মনে হচ্ছে করুণা ওই মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ঠিক করলো রাতটা একটু ফর্সা হতেই মার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে আর···

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিলো। দৌড়ে দরজা খুলে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে করুণা। ওঁর মুখ চোখ কি শুকনো, কি করুণ, যেন আজকেই ওর ভেতরকার সমস্ত প্রেম ভালোবাসা হারিয়ে গেছে, যেন সংসারে আজ থেকে ওর আর কেউ নেই, যেন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কিভাবে ওর নিজস্ব যাবতীয় জিনিস-ভর্তি নৌকোটা আস্তে আস্তে ডুবছে অথচ ওর কিছু করার নেই।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে প্রকাশ জিজ্ঞেস করলো—মা, কোথায় গিয়েছিলে? এতো দেরী হলো?

মাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো করুণা—একটা কাজে গিয়েছিলাম। দেরী হয়ে গেলো।

এই বলে প্রকাশের সামনে একটা বন্ধ লেফাফা ছুঁড়ে দিলো করুণা। উৎসুক হয়ে প্রকাশ ওটা তুলে নিলো। ওপরে ওর কলেজের ছাপ। তাড়াতাড়ি সে ওটা খুললো। পড়তে পড়তে ওর মুখচোখ ঝলসে উঠলো। দৌড়ে সে মাকে জিজ্ঞেস করলো—তুমি এটা পেলে মা ?

করুণা—তোমাদের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

—তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি ?

—আর কি করবো ?

—তুমি যখন বেরুলে তখন তো কোন গাড়ির সময় ছিলো না।

—মোটর ভাড়া করেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো প্রকাশ। তারপর কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো—তোমার যখন ইচ্ছে নয় তখন যেতে দিচ্ছো কেন ?

একটু বিরক্ত হলো করুণা—কারণ সেটাই তোমার ইচ্ছে। তোমার এই চেহারা আমি সহ্য করতে পারছি না। জীবনের কুড়িটা বছর তোমার শুভ কামনা করেছি আর এখন তোমার এই আকাঙ্ক্ষাকে খুন করি কি করে। তোমার যাত্রা শুভ হোক এই আমার কামনা।

আর কিছু বলতে পারলো না করুণা। গলা বুজে আসছে।

॥ পাঁচ ॥

সেদিন থেকেই যাওয়ার জন্য সব গোছগাছ শুরু করলো প্রকাশ। করুণার কাছে যা জমানো ছিলো সব খরচ হয়ে গেলো। কিছু ঋণও করতে হলো। নোতুন স্যুট বানাতে হলো, স্যুটকেস কিনতে হলো একটা। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রইলো প্রকাশ। কখনো নিজে কিছু কিনে আনে আবার কখনো চেয়ে আনে অন্যের কাছ থেকে।

এই এক সপ্তাহেই বেশ দুর্বল হয়ে গেছে করুণা। অনেক চুল পেকেছে, রোগা হয়েছে। সে সবে প্রকাশের কোন খেয়াল নেই। ওর চোখে এখন শুধু ইংল্যান্ডের ছবি ভাসে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর চোখে পর্দা টেনে দিয়েছে।

বিদায় নেবার দিন। বেশ কিছুদিন বাদ সূর্য উঠেছে। করুণা তার স্বামীর পুরোনো কাপড়-চোপড় রোদে দিচ্ছিলো। ওঁর মোটাসুতোর চাদর, খদ্দরের জামা পাজামা আর উড়নি এখনো জমা করা আছে বাক্সে। প্রতিবছরই রোদে দেয় ওগুলো, তারপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে তুলে রাখে। আজ আবার বের করেছে করুণা, কিন্তু রোদে দেবার জন্যে নয়, গরীবদের বিলি করার জন্য। ও আজ স্বামীর ওপর অসন্তুষ্ট। ওই লোটা, ঘড়ি যা আদিত্যের সদাসঙ্গী ছিলো ওগুলো আজ উঠোনে আছড়ে ফেললো। সেই ঝোলা যা আদিত্যর কাঁধে সবসময় ঝুলতো তা আজ আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেললো। গত বিশ বছর ধরে যার সামনে করুণা মাথা নোয়ায় সেই ছবিটা আজ বড় নির্দয়ভাবে মাটিতে আছড়ে ফেললো। স্বামীর

কোন স্মৃতিচিহ্ন ঘরে আর রাখতে চায় না ও। ওর অন্তরে শোক আর নিরাশার যে ঝড় বইছে স্বামী ছাড়া আর কার ওপর বা রাগ দেখিয়ে তা সামলাবে। কে আছে স্বামীর চেয়ে আপন ? কার কাছে ও নিজের ব্যথার কথা বলবে ? নিজের বুক চিরে আর কাকে দেখাতে পারে ? আজ আদিত্য থাকলে দাসত্বের বেড়ি গলায় পরে এভাবে বেরিয়ে যেতে পারতো প্রকাশ ? ওকে কে বোঝাবে আদিত্যরও এই অবস্থায় পস্তানো ছাড়া আর কিছু করার থাকতো না।

প্রকাশের বন্ধুবান্ধবরা ওকে বিদায় জানাতে আজ ভোজের আয়োজন করেছে। ওখান থেকে সন্ধের সময় এক বন্ধুর সাথে মোটরে করে ফিরলো। ঐ মোটরেই সমস্ত জিনিসপত্তর তুললো নিজের। তারপর ঘরে ঢুকে মাকে বললো—মা, যাচ্ছি। বোম্বাই পেঁছেই চিঠি লিখবো। মা, আমার দিব্যি, তুমি একদম কাঁদবে না। আর চিঠির জবাব সাথে সাথে দেবে।

কোন শবদেহ বের করার সময় নিকট আত্মীয়দের যেমন ধৈর্যের কোন রকম বাঁধন থাকে না, কান্নায় ভেঙে পড়ে, করুণার দশাও তাই হলো। বুকের ভেতরকার হাহাকার ওর দুর্বল শরীরের ভেতরকার প্রত্যেকটা অণু পরমাণু পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলো। মনে হচ্ছে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে কোন শব্দই বেরুলো না—না শোকের, না আশীর্বাদের। মার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো প্রকাশ, কাঁদতে কাঁদতে মার পা জড়িয়ে ধরলো। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। পাষাণ-মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো করুণা।

কখন যেন একসময় গোয়ালা এসে ওকে ডাকলো—বহুজী, ভাইয়া চলে গেছে ! কি কান্নাই কাঁদলো ছেলেটা !

করুণা সম্বিৎ ফিরে পেলো। ঘর ফাঁকা। মৃত্যুর করাল ছায়া হাত বাড়িয়েছে ঘরে। মনে হচ্ছে বুকের স্পন্দন থেমে গেছে।

হঠাৎ ওপরে তাকালো করুণা। দেখলো প্রকাশের অসাড় শরীরটা কোলে নিয়ে আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে আছড়ে পড়লো করুণা।

॥ ছয় ॥

যদিও করুণা বেঁচে আছে ; তবু এই সংসারের ওপর ওর আর কোনই আকর্ষণ নেই। যে ছোট সংসার কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নিজে গড়ে তুলেছিলো সেই স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। জীবনের আঁধার রাতেও প্রকাশকে দেখে ও ভরসা পেতো। ঐ একান্ত সম্পদের ওপর ও আশা ভরসা করতো। সেই স্মৃতি, সেই সম্পদও এখন লুট হয়ে গেছে। ওর আশ্রয় বলতে এখন আর কিছু নেই, তার প্রয়োজনও নেই। যে গরুগুলোকে ও দু'বেলা ঘাস-জাব খাওয়াতো আর গলায় হাত বুলিয়ে দিতো সেগুলো দড়িতে বাঁধা থাকতে থাকতে নিরাশ চোখে এখন দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাছুরগুলোকে আদর করে ডাকবারও এখন আর কেউ নেই। কার জন্য দুধ, দই করবে ? কে খাবে সেসব ?

কিন্তু এক সপ্তাহের ভেতরই আবার ওর জীবনের রঙ পালটালো। তার সেই ছোট্ট সংসারটা বাড়তে বাড়তে বিশ্বের সীমানায় গিয়ে ঠেকলো। নৌকোটা পাড়ের যেখানে নোঙর করা ছিলো সেখান থেকে ছুটে গেলো। আর ওটা এবার সাগরের অকূল পাথারে ভেসে বেড়াবে তারপর সেই উদ্দাম তরঙ্গের বুকে হয়তো হারিয়ে যাবে একদিন।

দরজায় বসে করুণা সারা গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেদের এখন দুধ খাওয়ায়। দুপুর অব্দি মাখন বার করে সেটাও এই ছেলেদের বিলিয়ে দেয়। খাবার বানিয়ে কুকুরগুলোকে খাওয়ায়। আর এটাই এখন ওর রোজকার নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। পাখী, কুকুর, বেড়াল এসবই এখন ওর আপন। সবার জন্যই ও খুলে দিয়েছে ওর প্রেমের দরজা। এই এক আঙুল জায়গায় যা প্রকাশের জন্যেও যথেষ্ট ছিলো না সেখানে এখন সারা সংসার জমা হয়েছে।

একদিন চিঠি এলো প্রকাশের। উঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলো করুণা। আবার কিছুক্ষণ বাদে এসে ওটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লো। তারপর পাখী-গুলোকে দানা খাওয়াতে শুরু করলো। কিন্তু নিঃসঙ্গ রাত্রে প্রকাশের চিঠি পড়বার জন্য ওর মন আকুল হয়ে উঠলো। ও ভাবতে থাকে, "প্রকাশ আমার কে? ওকে আমার কিপ্রয়োজন? হ্যাঁ, প্রকাশ কে?" মন উত্তর দিলো, "প্রকাশ তোর সর্বস্ব। ও তোর সেই অমর প্রেমের নিদর্শন যা থেকে তুই বঞ্চিত হয়েছিস। ও তোর প্রাণ, তোর জীবনের আলো, তোর বঞ্চিত কামনার মাধুর্য, তোর চোখের জলে ভেসে বেড়ানো হাঁস।" করুণা চিঠির টুকরোগুলো জড়ো করতে লাগলো যেন ওর টুকরো টুকরো প্রাণটাই এখন এক করছে। চিঠির সমস্ত টুকরোগুলো জমা করে করুণা প্রদীপের সামনে বসে ওগুলো জোড়া লাগাতে শুরু করলো। কোন হতভাগ্য হৃদয়ও বোধ হয় প্রেমের ছেঁড়া তার এতো সতর্কতায় জোড়া লাগায় না। হায় রে মমতা! ওগুলো জোড়া লাগাতে সারারাত কেটে গেলো অভাগিনীর। চিঠিটা দু'-পিঠেই লেখা সেজন্য জোড়া লাগাতে আরো মুশকিল হয়েছে। কোন শব্দ, কোন বাক্য শেষে গিয়ে বাদ পড়ে যাচ্ছে। আবার খুঁজতে লাগলো ওই টুকরোটা। সারারাত কেটে গেলো, তবুও চিঠির বেশী অংশটাই জোড়া লাগাতে পারেনি!

বেশ বেলা হয়েছে। এলাকার বাচ্চাগুলো দুধ আর মাখনের জন্যে জড়ো হয়েছে। কুকুর বেড়ালগুলো আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। আঙিনায় পাখিগুলো ট্যাঁ ট্যাঁ করে চ্যাঁচাতে শুরু করেছে, কোনটা উঠোনের গাছটায় এসে বসেছে, কোনোটা তুলসীতলায়, তবু মাথা তুলবার ফুরসত পেলো না করুণা।

দুপুর হলো। জায়গা ছেড়ে ওঠেনি করুণা। আশ্চর্য, ওর না পেয়েছে ক্ষিদে না পেয়েছে তেষ্টা। আবার ঘুরে সন্ধে এলো। কিন্তু ওই চিঠি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। চিঠির বিষয়বস্তু আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে—কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে প্রকাশের জাহাজ। প্রকাশের বুকের মাঝে অবিরত কি যেন বেজে চলেছে। কি, সেটা কি? কিন্তু সেটা উদ্ধার করতে পারে না করুণা। পিপাসায় ছটফট

করছে যে লোকটা, শিশিরের জলে কি তার তৃষ্ণা মেটে কখনো ? ছেলের লেখা থেকে প্রত্যেকটা অক্ষর নিজের বুকে গেঁথে নিতে চায় করুণা।

এভাবে তিন দিন কাটলো। সন্ধে হয়েছে। তিন দিন পরপর রাত জাগার পর ঘুমে যেন বুজে আসছে চোখ। করুণা দেখলো, একটা বিশাল ঘর। ঘরে চেয়ার টেবিল সাজানো। পেছনে উঁচু মঞ্চের ওপর একজন বসে। ভালোভাবে তাকালো করুণা, ও তো প্রকাশ।

সাথে সাথে এক কয়েদীকেও দেখলো কাঠগড়ায়। তার দু হাত-পায়েই বেড়ি, কোমর বেঁকে গেছে। চিনলো করুণা, হ্যাঁ ওইতো তার স্বামী—আদিত্য।

যেন ঘুম ভাঙলো করুণার। জল গড়াতে শুরু করলো চোখ দিয়ে। চিঠির টুকরোগুলো তুলে জ্বালিয়ে দিলো। ছাই হয়ে গেলো ওই টুকরোগুলো। ছাই তো নয়, এ যে ওর স্নেহের চিতা। ওর পুতুল খেলার শৈশব, সন্তপ্ত যৌবন, তৃষিত বৈধব্য সব পুড়ে খাক হয়ে গেলো একরত্তি ওই ছাইয়ে।

সকাল হলে গাঁয়ের লোকেরা দেখলো করুণার প্রাণ-পাখি খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে। প্রকাশের স্নেহের জন্য বুভুক্ষু ওই হৃদয়, স্বামীর ভালবাসায় ভগ্ন ওই হৃদয় সারাজীবনের স্মৃতি নিয়ে এখন বিশ্রামরত, আর ঠিক তখনই ইওরোপের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে প্রকাশের জাহাজ।

ভাষান্তর : **প্রদীপ গোস্বামী**

জীবনসার

আত্মজীবনী মূলক রচনা

আমার জীবন নিতান্তই সমতল মাঠ। এর মধ্যে কোথাও কোথাও ছোটখাটো খানাখন্দ হয়তো আছে; কিন্তু টিলা নেই, পাহাড় নেই, ঘন জঙ্গল নেই, গভীর উপত্যকা নেই, ভাঙা ঘরদোরও নেই। পাহাড়ে পর্বতে অভিযান চালিয়ে যারা আনন্দ পায় তারা এখানে হতাশ বোধ করবেন।

আমার জন্ম সম্বৎ ১৮৬৭ তে (সাল ১৮৮০-তে—অনুবাদক)। বাবা ডাক বিভাগের কেরানী ছিলেন। মা সবসময় অসুখ-বিসুখে ভুগতেন। এক বোনও ছিলো। আমার চেয়ে বয়সে বড়। সে সময় বাবা মাসে কুড়ি টাকা মাইনে পেতেন। চল্লিশ টাকায় পেঁছিবার আগেই মারা গেলেন তিনি। খুব বিবেচক লোক ছিলেন, জীবনের রাস্তায় চোখ কান খুলে চলতেন। কিন্তু ঠোকরটা খেলেন জীবনের শেষ পর্বে এসে। নিজে তো পড়লেনই, সাথে সাথে ডোবালেন আমাকেও। পনেরো বছর বয়েসেই আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। বিয়ের পরে এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। ঘরে বৌ ছিলো, সৎমা ছিলো, তাঁর দুটো ছেলে ছিলো, আর টাকা আমদানির ঘর ছিলো ফাঁকা। ঘরে যে সামান্য টাকা পয়সা ছিলো তা বাবার ছ'মাসের চিকিৎসায় আর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মে খরচ হয়ে গিয়েছিলো। আমার ইচ্ছে ছিলো বড় হয়ে এম.এ. পাস করবো, উকিল হবো। আজকের মতোই তখনো চাকরী পাওয়া বেশ কষ্টকর ছিলো। দৌড়ঝাঁপ করে হয়তো বা মাসিক দশ-বারো টাকায় কোথাও কাজ পাওয়া যেতো। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিলো আরও পড়াশোনা চালাবার। পায়ে যার শুধু লোহার নয়, অষ্টধাতুর শেকল বাঁধা সে কিনা চায় পাহাড়ে চড়তে!

আমার জুতো ছিলো না। ভালো পোশাক-আশাকও ছিলো না। জিনিস-পত্তরের দামও বেশ চড়া—আট আনায় দশ সের বার্লি পাওয়া যেতো। স্কুল ছুটি হতো বিকেল সাড়ে তিনটেয়। কাশীর কুইনস্ কলেজে পড়তাম। আমার ফি মকুব করে দিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাই। সামনেই পরীক্ষা তবু ছুটির পর বাস্বু-গেটের কাছে একটা ছেলেকে পড়াতে যেতাম। শীতের দিন। চারটেয় গিয়ে পেঁছিতাম। ছ'টায় ছুটি মিলতো। ওখান থেকে আমার গাঁ পাঁচ মাইলের ওপর। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটেও রাত আটটার আগে কোনদিন বাড়ি ফিরতে পারতামনা। আবার সকাল আটটাতেই বাড়ি থেকে বেরোতে হতো; নয়তো সময়মত স্কুল

পেঁছোনো যেতো না। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কুপীর সামনে পড়তে বসতাম আর কখন ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না। তবুও হিম্মতে বুক বেঁধেছিলাম।

ম্যাট্রিকুলেশনে কোনমতে সেকেণ্ড ডিভিশনে উতরে গেলাম। কিন্তু কুইনস্ কলেজে ভর্তি হওয়ার কোন আশা রইলো না। কারণ শুধু প্রথম ডিভিশনে পাস করা ছেলেদেরই ফি মকুব করা হতো সেখানে। অপ্রত্যাশিত ভাবে হিন্দু কলেজটা সে বছরই খুললো। ঠিক করলাম ওই কলেজেই পড়বো। প্রিন্সিপাল ছিলেন মিঃ রিচার্ডসন। তাঁর বাড়ি গেলাম। গিয়ে আশ্চর্য হলাম—পুরো হিন্দুস্থানী পোশাক পরে আছেন উনি। ধুতি আর কুর্তা পরে ফরাসের ওপর বসে কিছু লিখছিলেন। কিন্তু পোশাকের মতো মেজাজটা বদল করা বোধহয় এতো সহজ নয়। আমার বক্তব্য শুনে—অর্ধেকটাও বলা হয়নি তখনো—বলে উঠলেন যে কলেজের কথাবার্তা উনি বাড়িতে বলেন না। কিছু বলতে হলে কলেজে যেতে হবে। ঠিক আছে, দেখা করতে কলেজে গিয়েছিলাম। দেখা হয়েছিলো কিন্তু খুব হতাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা শুনতে হলো। ফি মকুব হবে না, কি করবো তখন? হয়তো প্রতিষ্ঠিত কোন লোকের সুপারিশে গেলে মকুবের কোন সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ওই দেহাতী যুবককে শহরে কে চিনতো?

প্রত্যেকদিন সুপারিশ যোগাড় করবার জন্য বাড়ি থেকে বেরোতাম আর বারো মাইল নিষ্ফলা ঘোরাফেরা করার পর ঘরে ফিরতাম সন্ধের পর। কে ছিলো যে বলবো আমার কথা? কেউ তো আমাকে নিয়ে ভাবতো না।

কয়েকদিন বাদে এরকম একজন মিলে গেলো। এক ঠাকুর, ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। ওঁর কাছে গিয়ে কাঁদলাম। আমার অবস্থা দেখে ওঁর করুণা হলো। সুপারিশ করে চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় আমার কি আনন্দই না হয়েছিলো। খুশীতে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তার পরের দিন প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করার কথা। কিন্তু ঘরে পেঁছেই জ্বর এসে গিয়েছিলো আমার। জ্বর ছাড়তে দু'সপ্তাহ লেগেছিলো। নিমের রস খেতে খেতে মুখটাও তিতো হয়ে গিয়েছিলো। একদিন দাওয়ায় বসে ছিলাম, হঠাৎ দেখি পুরোহিতজী এসেছেন। আমার এই দশা দেখে উনি সমস্ত কিছু মন দিয়ে শুনলেন। তারপর সাথে সাথে ক্ষেতে গিয়ে কোন গাছের একটা শেকড় তুলে এনে খুব ভালোভাবে ধুয়ে সাত দানা গোলমরিচের সাথে বেটে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। এক ঘণ্টার ভেতর জ্বর কমে গিয়েছিলো। পণ্ডিতজীকে আমি বার বার ঐ ওষুধের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু উনি বলেননি আমাকে। বলেছিলেন—নাম বললে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

এক মাস বাদে আবার মিঃ রিচার্ডসনের সাথে দেখা করে সুপারিশ করা চিঠিটা দিয়েছিলাম। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উনি বলেছিলেন—এতদিন কোথায় ছিলে?

'অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কি অসুখ?'

এই প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। যদি বলতাম জ্বর হয়েছিলো সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যেবাদী ঠাওরাতেন। আমার ধারণায় জ্বর হালকা অসুখ ছিলো, যার জন্য ওই লম্বা গরহাজির অনাবশ্যক। আমি ঠিক করলাম এমন একটা অসুখের নাম করবো যাতে ওই কারণেই ওঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়। সেই মুহূর্তে অন্য কোন অসুখের নাম মনেও করতে পারছিলাম না। ঠাকুর ইন্দ্র-নারায়ণ সিংহর সাথে যেদিন দেখা করেছিলাম সেদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে উনি বুকের ধুকপুকুনির চিকিৎসা করছেন। হঠাৎ ওই শব্দটাই মনে এসে গিয়ে-ছিলো।

বলেছিলাম—প্যালপিটেশন অব হার্ট স্যার!

সাহেব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং পরে বলেছিলেন—এখন তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ?

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আচ্ছা, আবেদন-পত্র ভর্তি করে নিয়ে এসো।'

ভেবেছিলাম, বেড়া বুঝি পার হলাম। ফর্ম নিয়ে ভর্তি করে জমা দিয়ে দিয়ে-ছিলাম। সাহেব সে সময় কোন ক্লাস নিচ্ছিলেন। বেলা তিনটেয় ফর্মটা ওই অব-স্থায় ফেরত পেয়েছিলাম। শুধু ওপরে লেখা—এর যোগ্যতা যাচাই করে নাও।

আবার নয়া ঝামেলা হাজির হলো। মন ভেঙে গেলো। ইংরেজী ছাড়া আর কোন বিষয়ে পাস করবো কিনা সে বিষয়ে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো, বীজগণিত আর জ্যামিতি দেখলেই আমার জ্বর আসতো। যা কিছু পড়েছিলাম সব তো তখন ভুলে গেছি। অন্য কোন উপায়-ই বা কি ছিলো? ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্লাসে গিয়ে ফর্মটা দেখালাম। প্রোফেসর সাহেব বাঙালী, ইংরেজী পড়াচ্ছিলেন। ওয়াশিংটন ইরবিংগ-এর 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল'। পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। দু-চার মিনিটের ভেতর বুঝতে পেরেছিলাম প্রোফেসরের বিষয়টা আমার আয়ত্তে। ঘন্টা বেজে যাবার পর সেদিনের পড়ানোর ওপর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে ফর্মে 'সন্তোষজনক' লিখে দিয়েছিলেন।

এর পরেরটা বীজগণিতের ক্লাস। এরও প্রোফেসার বাঙালী। নিজের ফর্ম দেখালাম। নতুন স্কুলে ছাত্র যারা আসে তাদের বেশীর ভাগেরই অন্য কোথাও জায়গা মেলেনি। এখানেও তাই হয়েছিলো। ক্লাসে অযোগ্য ছাত্রেরই সংখ্যা ছিলো বেশী। যারাই প্রথম আসে তাদেরই নিয়ে নেওয়া হতো। ক্ষিদের সময় শাক পাতা সবই সুস্বাদু। তারপর যখন পেট ভরে যায় তখন ছাত্রদের বেছে বেছে নেওয়া হয়। এই প্রোফেসর সাহেব অঙ্কের পরীক্ষা নিলেন। ফেল করলাম আমি। ফর্মে অঙ্কের জায়গায় লিখে দিয়েছিলেন 'অসন্তোষজনক'।

আমি এত হতাশ হলাম যে ফর্ম নিয়ে প্রিন্সিপালের সাথে আর দেখা করলাম

না। সোজা ঘরে চলে এলাম। অঙ্ক আমার কাছে গৌরীশংকরের চূড়া। কখনো তাতে উঠতে পারিনি আমি। ইন্টারমিডিয়েটে দুবার অঙ্কে ফেল করে পরীক্ষা দেওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দশ-বারো বছর বাদে অঙ্ক যখন ঐচ্ছিক হয়ে গেলো তখন অন্য আর একটা বিষয় নিয়ে সহজেই পাস করে গিয়েছিলাম। ওই সময় পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির ওই নিয়ম কতো যুবকের স্বপ্নকে খুন করেছে কে জানে! হতাশ হয়ে ঘরে তো ফিরে এসেছিলাম ঠিকই; কিন্তু পড়াশোনা করার ইচ্ছে তখনো প্রবল। ঘরে বসে থেকে কি হবে? কি করে অঙ্কটা একটু শিখে কলেজে ভর্তি হব সেটাই তখন সমস্যা। এর জন্য শহরে থাকা প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে এক-জন উকিলের ছেলেকে পড়ানোর কাজ জুটে গিয়েছিলো। পাঁচ টাকা বেতন। দু'টাকায় নিজের খরচটা কুলিয়ে তিন টাকা ঘরে পাঠিয়ে দিতাম। উকিল সাহেবের আস্তাবলের ওপর একটা ছোট কাঁচা ঘর ছিলো। সেখানে থাকার অনুমতি নিয়ে তেরপল বিছিয়ে আমার বিছানা হতো। বাজার থেকে একটা ছোট ল্যাম্প কিনে এনেছিলাম। শুরু হলো আমার শহরের জীবন। ঘরের বাসনপত্তর কিছু নিয়ে এলাম। একবেলা খিচুড়ি রেঁধে, খেয়ে-দেয়ে বাসনপত্তর মেজে লাইব্রেরী চলে যেতাম। অঙ্কটা উপলক্ষ মাত্র, যেতাম আসলে উপন্যাস পড়তে। পণ্ডিত রতননাথ দারের 'ফসানা-ই-আজাদ' (আজাদের রোমান্স—অ) আমার সে সময়েই পড়া। 'চন্দ্রকান্তা-সন্ততি' ও (চন্দ্রকান্তার বংশধর) পড়ে ফেলেছিলাম। লাইব্রেরীতে বঙ্কিমবাবুর উর্দুতে অনুবাদ যতগুলো উপন্যাস ছিলো পড়ে ফেললাম। যে উকিল সাহেবের ছেলেকে আমি পড়াতাম তার শালা আমার সাথে ম্যাট্রিকুলেশনে পড়তো। ওর সুপারিশেই কাজটা হয়েছে। আমার সাথে খুব দোস্তি ছিলো। যখনই প্রয়োজন হতো ওর কাছে টাকা ধার চাইতাম। মাইনে পাওয়ার পর শোধ করতাম। যেতো। এভাবে কখনো দু টাকা হাতে পেতাম, কখনো বা তিন। যে দিন মাইনের দু-তিন টাকা পেতাম সেদিন আর কোন সংযম থাকতো না আমার। বুভুক্ষুর মতো আমাকে হালুইকর-এর দোকানের দিকে টেনে নিয়ে যেতো। দু-তিন আনার খাবার খেয়ে তবে উঠতাম। সেদিনই ঘরে গিয়ে দু-আড়াই টাকা দিয়ে আসতাম। পরের দিন থেকেই আবার ধার নেওয়া শুরু হতো আমার কিন্তু কখনো কখনো ধার চাইতেও লজ্জা করতো আর তখন দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস।

এভাবেই চার-পাঁচ মাস কেটে গেলো। এর মধ্যে একটা কাপড়ের দোকানের মালিকের কাছ থেকে দু-আড়াই টাকার একটা কাপড় ধারে কিনেছিলাম। প্রত্যেক দিন ওর দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করতাম। তাই বিশ্বাস জন্মে গিয়ে-ছিলো আমার ওপর। মাসের পর মাস কেটে যাওয়ার পরও আমি যখন ওটা শোধ করতে পারলাম না তখন ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম। অনেকটা ঘুরে যেতাম। তিন বছর বাদে আমি ঐ টাকা শোধ করেছিলাম। সে সময় শহরের এক মাটি-কাটা মজুর আমাকে হিন্দী শেখাতো। উকিল সাহেবের বাড়ির পেছনেই ওর ঝুপড়ি ছিলো। সব সময় বলতো, 'জান লো ভাইয়া'। আমরাও তাকে

ওই নামেই ডাকতাম। একবার ওর কাছ থেকেও আট আনা পয়সা ধার করতে হয়েছিলো আমাকে। পাঁচ বছর বাদে আমার গাঁয়ের বাড়ি গিয়ে ঐ পয়সা উশুল করেছিলো লোকটা। তখনো পড়াশোনার ইচ্ছে আমার প্রবল; কিন্তু ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম আমি। মন চাইতো অন্য একটা চাকরি করি। কিন্তু কার কাছে চাকরি মিলতে পারে, কোথায় মিলতে পারে, সেসব জানতাম না।

সেদিনটা ছিলো শীতেরদিন। পকেট ফাঁকা। তার আগের দু'দিন এক-এক পয়সার মুড়ি চিবিয়ে কাটিয়েছি। কারণ হয় মহাজন ধার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে নয়তো আমিই লজ্জায় আর ধার চাই না। সন্ধেবাতি জ্বলে উঠেছে। একটা বইয়ের দোকানে 'দি কি টু চক্রবর্তী'স ম্যাথমেটিস' বইটা বেচতে গেছি। দু বছর আগে কিনেছিলাম। খুব যত্নের সাথেই রেখেছিলাম; কিন্তু চারধার থেকে ঠোক্কর খেতে খেতে হতাশ হয়ে সেদিন বেচব বলে ঠিক করেছি। বইটার দাম ছিলো দু' টাকা তবু এক টাকাতেই বেচে দেবো ঠিক করলাম। টাকাটা নিয়ে দোকান থেকে বেরোতে যাবো ঠিক সে সময় এক বিশাল গোঁফওয়ালা লোক, যে লোকটি দোকানে বসে ছিলো, জিজ্ঞেস করলো—কোথায় পড়ো তুমি?

বললাম—এখন কোথাও পড়ছি না তবে আশা করছি কোথাও ঢুকে যাবো।

'ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'চাকরি করার ইচ্ছে আছে?'

'চাকরি তো কোথাও পাচ্ছি না।'

ঐ ভদ্রলোক একটা ছোট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। একজন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন ছিলো তাঁর। মাইনে আঠারো টাকা। আমি রাজী হয়ে গেলাম। আঠারো টাকা তখন আমার হতাশাগ্রস্ত মনের উঁচু কল্পনার চেয়ে আরও অনেক উঁচু প্রাপ্তি। হেডমাস্টার মশাই-এর সাথে পরের দিন দেখা করবো বলে চলে এসেছিলাম। আমার তখন আনন্দে মাটিতে পা আর পড়ে না। ওটা ১৮৯৯ সালের কথা। সমস্ত রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তৈরী ছিলাম আর অঙ্কটা আমাকে বাধা না দিলে অনেক দূর এগিয়েও যেতাম। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মানসিকতা না বুঝতে পারাটা। ঐ সময় পর্যন্ত, এমনকি পরের দু বছরও ডাকাতের মতো ব্যবহার করেছিলো ওটা। ছোট বড় সবাইকেই এক আসনে বসিয়েছিলো ওরা।

।। দুই ।।

১৯০৭ সালে আমি গল্প লিখতে শুরু করি। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গল্প ইংরেজীতে পড়েছিলাম এবং সেগুলোর উর্দু অনুবাদ উর্দু পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিলো। উপন্যাস লেখা তো শুরু করেছিলাম সেই ১৯০১ সাল থেকেই। প্রথম উপন্যাস বেরুলো ১৯০২ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯০৪-এ। ১৯০৭-এর আগে

কোন গল্প আমি লিখিনি। আমার প্রথম গল্পের নাম ছিলো 'সংসার কা সবসে অনমোল রতন' (দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রত্ন)। ১৯০৭ সালে জমানা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। এরপর আরও চার-পাঁচটা গল্প লিখি। পাঁচটা গল্পের সংকলন 'সোজে বতন' (দেশের বিষাদ-গাথা) প্রকাশিত হলো ১৯০৮ সালে। সে সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছিলো এবং কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দলেরও সৃষ্টি হয়েছিলো। আমি তখন শিক্ষা বিভাগের সাব ডেপুটি ইনস্পেক্টর হিসেবে হামিরপুর জেলায় নিযুক্ত ছিলাম। বইটা প্রকাশিত হয়ে থাকার মাস কয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যায় আমি তাঁবুতে বসে আছি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এত্তেলা এলো, আমি যেন পত্রপাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করি। শীতকাল। ম্যাজেস্ট্রেট সাহেব সদরে ছিলেন। দেরি না করে গোরুর গাড়িতে বলদ জুড়ে রাতে রাতেই ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পেরিয়ে পরের দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সাহেবের সামনে পড়ে আছে 'সোজে বতন'-এর একটা কপি। আমি ফাঁপরে পড়লাম। তখন 'নবাব রায়' ছদ্মনামে লিখতাম। আমি অল্প অল্প শুনেছিলাম গোয়েন্দারা ঐ বইয়ের লেখককে খুঁজছে। বুঝলাম ওরা আমার খোঁজ পেয়েছে আর এর জবাবদিহি করার জন্যই সাহেব আমাকে তলব করেছেন।

সাহেব প্রশ্ন করলেন—এ বই তুমি লিখেছো?

আমি স্বীকার করলাম।

সাহেব প্রত্যেক গল্পের বিষয়বস্তু জিজ্ঞেস করলেন। শেষে রেগে উঠে বললেন —তোমার প্রত্যেকটা গল্প রাজদ্রোহে ভরা। তোমার ভাগ্য ভালো তুমি ইংরেজ রাজত্বে বাস করছো। মুঘল রাজত্ব হলে তোমার দু হাত কেটে ছেড়ে দিতো। তোমার গল্প একপেশে। তুমি ইংরেজ সরকারের অবমাননা করেছো। স্থির হয়েছে, 'সোজে বতন'-এর সমস্ত কপি সরকারের কাছে জমা দিয়ে দেবে আর সাহেবের অনুমতি ছাড়া আর কখনো কিছু লিখবে না। আমার মনে হলো, অল্পের ওপর দিয়েই গেলো। এক হাজার কপি ছেপেছিলাম। খুব কষ্ট করে ৩০০ কপি বিক্রি করেছি। শেষ ৭০০ কপি 'জমানা' কার্যালয় থেকে চেয়ে নিয়ে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

ভেবেছিলাম বিপদ বোধহয় কাটলো। কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা এতো সহজেই সন্তুষ্ট হন না। পরে জেনেছিলাম সাহেব এই ব্যাপারটা নিয়ে অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিস, দুজন ডেপুটি কালেকটর, আমার উর্ধ্বতন ডেপুটি ইনসপেকটর—সবাই মিলে আমার ভাগ্য ঠিক করছিলেন। একজন ডেপুটি কালেকটর আমার বই থেকে উদ্ধৃতি তুলে তুলে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন বইটা আগাগোড়া রাজদ্রোহে ভরা; এছাড়া আর কিছু নেই। আর ঐ রাজদ্রোহ সাধারণ নয়, সংক্রামক। পুলিসের দেবতা বললেন—'এরকম বিপজ্জনক লোককে এক্ষুণি ধরে এনে সাজা দেওয়া উচিত।' ডেপুটি ইনসপেকটর সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এই ঘটনা যাতে বেশিদূর না গড়ায় সেই আশঙ্কায়

তিনি প্রস্তাব রাখলেন যে, বন্ধুর মতো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার গভীরতা জেনে নিয়ে উনি কমিটিতে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন। ও'র উদ্দেশ্য ছিলো আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে উনি রিপোর্ট লিখে দেবেন যে লেখক শুধু কলমেই উগ্রতা দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে বাস্তবে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। কমিটি সেই প্রস্তাব মেনে নিলো। তবে পুলিসের দেবতা তখনও ফুসছিলেন।

হঠাৎ কালেকটর সাহেব ডেপুটি ইনসপেকটরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি আশা করছেন ও নিজের থেকেই ওর মনের কথা খুলে বলবে?

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে।'

'আপনি বন্ধু সেজে ও'র কাছ থেকে কথা বের করবেন? কিন্তু সেটা তো গুপ্তচর বৃত্তি। আমি ওটা পছন্দ করি না।'

নিজের বুদ্ধিমত্তা ভুলে ডেপুটি ইনসপেকটর তোতলাতে লাগলেন—আমি তো হুজুরের হুকুম···। সাহেব মাঝখানেই শুরু করলেন,—না এটা আমার হুকুম নয়। আমি এধরনের হুকুম দিতে চাই না। বইটায় যদি লেখকের রাজদ্রোহিতা প্রমাণিত হয় তবে আদালতে মোকদ্দমা চালান, নয়তো ধমক-ধামক দিয়ে ছেড়ে দিন। 'মুখে রাম, বগলে ছুরি' আমার পছন্দ নয়।

পরে যখন ডেপুটি ইনসপেকটর নিজেই একদিন আমাকে ঘটনাটা বলছিলেন তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি কি সত্যি সত্যিই এই গুপ্তচরবৃত্তি করতেন?

হেসে বলেছিলেন—অসম্ভব! লাখ টাকা দিলেও করতাম না। ব্যাপারটা আদালতে উঠুক আমি শুধু সেটাই বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। আর তা বন্ধও হয়েছিলো। মোকদ্দমা আদালতে গেলে নির্ঘাৎ সাজা হতো। আপনার হয়ে লড়ার মতো কাউকে পেতেন না। কালেকটর সাহেব নিতান্ত ভদ্রলোক।

আমি স্বীকার করলাম—হ্যাঁ, ভয়ানক ভদ্রলোক।